

কোয়ান্টাম

এখন প্রয়োজন নৈতিক পুনর্জাগরণ

করার লক্ষ্যে চালিত ভোগবাদী পণ্য
আগ্রাসনের হাত থেকে পুরো সমাজ,
বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষায় জাতীয়
নৈতিক পুনর্জাগরণই পালন করবে
কার্যকরী ভূমিকা।
প্রিয় সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী,
গত ২৫ বছর আত্মপ্রত্যয় নির্মাণে
আপনার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।
হিংসার বিপরীতে অহিংসা ও সমমর্মিতার
বিকাশে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন।
একইভাবে আগামী সিকি শতাব্দীতেও
নৈতিক পুনর্জাগরণ এবং আত্ম-আসক্ত
সেলফি জনজাগরণকে সমাজপ্রেমী প্রজন্ম
রূপান্তরে আপনারাই রাখবেন অগ্রণী
ভূমিকা। প্রশান্ত প্রত্যয় নিয়ে বলবেন, ১৮
বছর বয়সের আগে স্মার্টফোন নয়;
মোবাইলে অপ্রয়োজনীয় কথা নয়; সময়,
মেধা ও অর্থের অপচয় নয়; বন্ধুত্বের
মুখোশে অশ্লীলতা ও পরকীয়া নয়।
দৃঢ়তার সাথে বলবেন, আমরা স্বপ্ন
দেখি হিংসা-সন্ত্রাস-জুয়া-মাদক ও
শোষণমুক্ত সমর্মী মানবিক মহাসমাজের,
যেখানে প্রত্যেকের অন্তর থেকে ধ্বনিত
হবে-আমার সোনার বাংলা আমি তোমায়
ভালবাসি। পরম করুণাময় আমাদের
সহায় হোন।

গুণীজন দৃষ্টিতে কোয়ান্টাম



ড. এম শমশের আলী



আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ



ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

‘নীরব কাজই শেষপর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়। মানবকল্যাণে কোয়ান্টামের কর্মপ্রয়াস দেখে আমি অভিভূত! নীরব কাজই কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় শক্তি।’
সৈয়দ আবুল মকসুদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক কলামিস্ট লেখক গবেষক

‘ব্যক্তিমানুষের উপকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মানুষকে সামষ্টিক কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতের বাংলাদেশ একদিন অবশ্যই এ কাজের মূল্যায়ন করবে।’
আনোয়ারা সৈয়দ হক, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও মনোচিকিৎসক



ড. কামাল হোসেন



এম. আমীর-উল ইসলাম

‘কোয়ান্টাম যে ইতিবাচকতার কথা বলে, তা অনুসরণ করলে আমাদের জীবন ও সমাজ অনেক স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে। এর পাশাপাশি সত্য জানা ও উপলব্ধি আমাদেরকে পরিণত করবে এক মহান জাতিতে।’
বরেন্দ্র ইতিহাসবিদ ও সুপারনিউম্যারার প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘আমি আবার কোয়ান্টামে আসব শুধু এই ভালো কথাগুলো শোনার জন্যে। কোর্সের কথাগুলো যদি দেশের সব অঞ্চলের সব মানুষকে শোনানো যেত, সচেতন করা যেত, খুব ভালো হতো।’
আফজাল হোসেন, খ্যাতিমান অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

‘লালনের গানে আছে মানবপ্রেমের কথা, ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গি, আছে আত্মশুদ্ধির প্রেরণা—কোয়ান্টামে এসেও আমি এই চিরায়ত সত্য আর আলোকিত জীবন-দর্শনের প্রতিধ্বনি খুঁজে পেলাম।’
প্রখ্যাত লালন সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন

‘কোয়ান্টাম অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে একজন মানুষের মধ্যে সং-চিন্তাকে প্রোথিত করে এবং আত্ম উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। সবাইকে নিয়ে একটি বৃহত্তর কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়াই কোয়ান্টামের মূল উদ্দেশ্য।’
সুজিত মোস্তফা, বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী



সৈয়দ আবুল মকসুদ



কামাল লোহানী

‘অন্তরের ধ্বনি শুনতে হলে চাই নীরবতা, আত্মনিমগ্নতা ও ব্রেনে আলফা ওয়েভ। এজন্যেই মেডিটেশন গুরুত্বপূর্ণ। ধ্যানের নীরবতায় আমরা সত্যিই ভেতরের ডাক শুনতে পাই।’
ড. এম শমশের আলী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী গবেষক ও লেখক

‘আমাদের প্রত্যেকের মনের একটা শক্তি আছে। সে শক্তির জাগরণ ঘটানো প্রয়োজন। মেডিটেশন মানুষের মধ্যে এই জাগরণ ঘটায়।’
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

‘এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সেই উদ্যোগ ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে চলেছে।’
অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ

‘আমরা যদি সজ্ঞবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমাদের সুস্থতা প্রশান্তি কর্মব্যস্ততা ও সুখী জীবন—এ চারটি বিষয় অর্জন করা খুব সহজ। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের জাতিত্ব করার চেষ্টা করছি।’
জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী

‘জাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে চাই মানবিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজ-সচেতন মানুষ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তাদের কাজের মধ্য দিয়ে সেই সমাজ-সচেতন মানুষই তৈরি করেছে।’
ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম

‘কোয়ান্টামের এ প্রশিক্ষণটিতে সবারই অংশ নেয়া উচিত। এর মধ্য দিয়ে প্রত্যেকেই আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ এবং নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন একেকজন মানুষ হয়ে ওঠার শক্তি অর্জন করবেন।’
বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান, খ্যাতিমান আইনজ্ঞ ও মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব ড. কামাল হোসেন

‘কোয়ান্টাম কোর্সে গুরুজীর শব্দচয়ন ও তার যে প্রকাশশক্তি, এটা সত্যি অসাধারণ। কথা বলে মানুষকে যে কতখানি অনুপ্রাণিত করা যায় এবং দেহের সমস্ত রোগবালাই প্রায় সারিয়ে দেয়া যায়, এটা অসামান্য বিষয়।’
মুস্তাফা মনোয়ার, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশে প্যাপেট শিল্পের পথিকৃৎ

‘মানুষকে কর্মময় জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ করে কোয়ান্টাম। যারা জীবনকে সুন্দর দেখতে চান, জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করতে চান, তারা কোয়ান্টাম থেকে জীবনযাপনের বিজ্ঞান শিখতে পারেন। আমি মনে করি, আমাদের সন্তানদের জন্যে এ কোর্স অবশ্য কর্তব্য।’
মুস্তাফা জামান আব্বাসী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

‘যে-কোনো পরিস্থিতিতে মনের সাহস রাখাই কোয়ান্টামের মূল সূত্র। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর সার্বজনীন আবেদন। সকল ধর্মের সকল মানুষের জন্যে গ্রহণযোগ্য এ কোর্স।’
জাতীয় নাট্যব্যক্তিত্ব ফেরদৌসী মজুমদার

‘আমাদের নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা দরকার—যারা সমাজের উন্নতি নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিন্তা করবে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সমাজের মানুষের মধ্যে এ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, যা দেশ ও জাতির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
বরেন্দ্র শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়



সুজিত মোস্তফা



মুস্তাফা জামান আব্বাসী



আফজাল হোসেন



ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন



মুস্তাফা মনোয়ার



ফেরদৌসী মজুমদার



আনোয়ারা সৈয়দ হক



ফরিদা পারভীন



ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর টেবিল টেনিস দ্বৈতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন দুই কোয়ান্টা। উল্লেখ্য, জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৭ সালে পুরস্কৃত করা হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলকে।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কোয়ান্টাদের একাংশ। ২০১৭-তে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে মোট ১৪ জন। তাদের প্রত্যেকেই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাতালিকায় ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

অনাহার অর্ধাহারে যাদের দিন কাটত, সুযোগের অভাবে যাদের স্বপ্নের সীমানা ছিল চাঁদের গাড়ির চালক হওয়া, আজ সেই শিশুরা স্বপ্ন দেখে নাসার বিজ্ঞানী হওয়ার, বিশ্বসেরা সার্জন কিংবা প্রযুক্তিবিদ হওয়ার।

কোয়ান্টাম নয়, তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মেধাতালিকায় ভর্তি হচ্ছে দেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। খো খো, জিমন্যাস্টিকস, হ্যান্ডবল, আর্চারি, অ্যাথলেটিক্স, কাবাডি, ভলিবল, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলায় নৈপুণ্যের জোরে দেশসেরা হওয়ার গৌরব অর্জনের পাশাপাশি তারা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও দেশের পতাকা সমুন্নত করছে।

সুনির্দিষ্ট মনছবি, অবিচল বিশ্বাস, নিরলস কাজ ও নিয়মিত মেডিটেশন যে-কাউকে পৌছে দিতে পারে সাফল্যের সোপানে-কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ তারই প্রমাণ।

এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুস্থ সাংস্কৃতিক ও উদারনৈতিক পরিবেশে এখন বেড়ে উঠছে ২২টি জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ১৭০০ শিশু।



মেধার কোনো জাত নেই গোত্র নেই-এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দুর্গম পাহাড়ে ২০০০ সালে মাত্র সাতটি শিশু নিয়ে শুরু হয়েছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের যাত্রা। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭০০-তে। চালু হয়েছে কলেজ শাখা। ২০১৪ সাল থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে মেয়েশিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



তৃতীয় জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতা ২০১৭-তে ৫৩টি পদকের মধ্যে ৩২টি পেয়ে বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল।



২৬ মার্চ ২০১৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশের কুচকাওয়াজে টানা তৃতীয়বার প্রথম হওয়ার বিরল সাফল্য অর্জন করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ। শুধু তা-ই নয়, আনসার-ভিডিপির পেশাগত বাদক দলের বাইরে একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যান্ড বাজানোর সুযোগ লাভ করেছে সুসজ্জিত ও সুপ্রশিক্ষিত কোয়ান্টাদের বাদক দল।

বিশিষ্ট চিকিৎসকরা বলছেন মেডিটেশনের কথা

কোয়ান্টামের শিক্ষা সবার জন্যেই প্রয়োজন

জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক

সুস্থ থাকতে চাইলে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই। আর পরিপূর্ণ সুখী হতে হলে আত্মাকেও সুস্থ রাখতে হবে। আত্মার সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন ধর্মের মূল শিক্ষার অনুশীলন, নিয়মিত প্রার্থনা ও মেডিটেশন। এটি রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে চমৎকার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ জন্যেই কোয়ান্টামের শিক্ষা বয়স-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে সব মানুষের জন্যেই প্রয়োজন।

[৩৭৫ তম ব্যাচের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে একথা বলেন
বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ,
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব
বাংলাদেশ-এর মহাসচিব]



অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ

মেডিটেশন করলে শরীর শিথিল হয়। মনে প্রশান্তি আসে। টেনশন দূর হয়। হার্টবিট ও রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। তাই মেডিটেশন করুন, সুস্থ থাকুন।

[বিভাগীয় প্রধান, প্যালিয়েটিভ মেডিসিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। ২২৭ ব্যাচ]



অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম

সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজি নিয়ে বাস্তবভিত্তিক তথ্য ও প্রক্রিয়া এখানে দেখলাম। কোয়ান্টাম হিলিংয়ের মাধ্যমে রোগীরা আরো বেশি উপকৃত হবে।

[প্রখ্যাত ভাইরোলজিস্ট ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। ২৭৯ ব্যাচ]



অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা

শৈশব, কৈশোর ও বয়স্কিকালে শরীর-মনে কিছু পরিবর্তন ঘটে। তখন যদি ওদের কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তবে জীবনটা অনেক সুন্দর হতে পারে। মেডিটেশন শেখানোর মাধ্যমে সেই কাজটি সুন্দরভাবে করা সম্ভব।

[বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ৩২৮ ব্যাচ]

অধ্যাপক ডা. এম ইউ কবীর চৌধুরী

দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীরা মেডিটেশনের মাধ্যমে স্ট্রেসমুক্ত ও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন। যেসব রোগীরা স্ট্রেসজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন তাদেরকে আমি বলি, কোয়ান্টামে যান, মেডিটেশন করুন, আপনি ভালো থাকবেন।

[প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ও অধ্যক্ষ, এম এইচ শমিরতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ৩৪১ ব্যাচ]



অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মো. আবু তালেব

ডিস্ক প্রোল্যাক্সের কারণে আমি কোমরে সবসময় ব্যথা বোধ করতাম। কোর্সের তৃতীয়দিন থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি। আলোচনাগুলো ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত চমৎকার। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোর্সে অংশ নিয়েছি।

[প্রখ্যাত সার্জন ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রংপুর মেডিকেল কলেজ। ৩৯৫ ব্যাচ]

অধ্যাপক ডা. আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী

আমি আমার রোগীদের বলি, দেহটা আপনার, ভালো থাকার প্রাথমিক দায়িত্বটাও আপনার। মানুষ এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটাই খুঁজে পায় মেডিটেশন শিখতে এসে। দেহ-মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা মেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

[বিভাগীয় প্রধান, হৃদরোগ বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ৩০০ ব্যাচ]



ডা. আফরোজা বেগম

আমরা ডাক্তাররা পেশাগত কারণেই খুব ব্যস্ত জীবনযাপন করি। মেডিটেশনের মাধ্যমে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টটা আমাদের প্রত্যেকেরই শেখা উচিত। এতে রোগীদের সেবা দেয়াটা আমাদের জন্যে আরো সহজ হবে বলে আমি মনে করি।

[সহযোগী অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৬৭ ব্যাচ]

অধ্যাপক ডা. মনীষা ব্যানার্জী

সুদীর্ঘ একাডেমিক ক্যারিয়ারে অজানা অনেক বিষয় জেনেছি মেডিটেশন প্রোগ্রামে এসে। মেডিটেশনের মাধ্যমে মানুষ নিজের যত্ন নেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। মেডিটেশন চর্চায় সুস্থ, কর্মব্যস্ত ও দীর্ঘজীবন লাভ করা সম্ভব।

[বিভাগীয় প্রধান, নবজাতক বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। ৩৯৭ ব্যাচ]



অধ্যাপক ডা. মো. নওশাদ আলী

মেডিকেল সায়েন্স ও মেডিটেশনের যোগসূত্র কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে যেভাবে এসেছে, তা আমার কাছে সত্যিই খুব বিস্ময়কর লেগেছে। আমি শুধু এটাই বলব যে, মেডিটেশন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

[বিভাগীয় প্রধান, শিশু সার্জারি, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ। ৪০০ ব্যাচ]

অধ্যাপক ডা. জহির উদ্দিন আহমাদ

শুধু ওষুধে সব রোগ ভালো হয় না। সুস্থতার জন্যে মেডিকেশন ও মেডিটেশন দুটোই প্রয়োজন। মেডিটেশন বিশ্বাস ও নিরাময় শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই আমি রোগীদের মেডিটেশন শেখার পরামর্শ দেই।

[মানসিক ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, ইউনাইটেড হাসপাতাল। ৩৬৬ ব্যাচ]



কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ॥ সুস্থ হয়েছেন লাখো মানুষ



৫০ বছর ধরে মাইগ্রেন ও ৩৬ বছর ধরে অনিদ্রা রোগে ভুগছিলাম আমি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে ও মেডিটেশন চর্চা করে আমি মাইগ্রেন ও অনিদ্রা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

খান মো. নুরুল ইসলাম

[চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল। ৪০০ ব্যাচ]



স্পাজমোডিক ডিসফোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার কথা বলতে খুব কষ্ট হতো। এ কোর্সে নিজেকে নিরাময় করতে শিখলাম। মেডিটেশন করে আমার গলার কষ্টটা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।

সুমনা হাসান

[চেয়ারপারসন, স্টুডিও ২০০০। ৪৩৭ ব্যাচ]



আমার ছিল ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও মেরুদণ্ডে ব্যথা। আট বছর ধরে ঘুমের ওষুধ খেয়েও ভালোমতো ঘুম হতো না। কোর্স করে আমি তৃপ্তি নিয়ে ঘুমাতে পারছি। অন্যান্য অসুখও সেরে গেছে।

সায়েলা ইয়াসমিন

[গৃহিণী। ৪৩১ ব্যাচ]



পাঁচ বছর ধরে আমার প্রচণ্ড এসিডিটির সমস্যা ছিল। পকেটে সবসময় ওষুধ রাখতে হতো। মেডিটেশন করে আমার এসিডিটির সমস্যা দূর হয়েছে। আমি এখন সুস্থ আছি, ভালো আছি।

বিবেক বিশ্বাস

[প্রভাষক, যশোর সরকারি সিটি কলেজ। ৪২৪ ব্যাচ]



আমার কোমর এবং হিপ জয়েন্টে ১০ বার অপারেশন হয়েছে। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারতাম না। নিরাময়ের মেডিটেশন করে আমার সুস্থতার বিশ্বাস অনেক বেড়েছে। কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকেই ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারছি।

মো. সোহরাব

[কার্ঠমন্ত্রী। ৪১৪ ব্যাচ]



দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমি একটা রোগে ভুগছিলাম। আমার সবসময় মনে হতো নাকে ও মুখে ময়লা জমে আছে। আমি ক্রমাগত থুথু ফেলতাম। কোর্সে মেডিটেশন করে এ রোগ থেকে মুক্ত হয়েছি।

রুবিনা মনির

[ব্যবসায়ী। ৪০০ ব্যাচ]



গত আট বছর ধরে আমি শ্বাসকষ্টে ভুগেছি। দেশ-বিদেশে নানা ধরনের চিকিৎসাতেও সুস্থ হই নি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে মেডিটেশন শিখে এবং নিয়মিত দমচর্চা করে আমি এখন বেশ সুস্থ।

মো. হারুন আর রশিদ

[ডেপুটি ম্যানেজার, পিপলস পোল্ট্রি হ্যাচারি লি.। ৪৩৩ ব্যাচ]



দীর্ঘ আট বছর ধরে আমি হাঁচির সমস্যায় ভুগেছি। হাঁচির কারণে আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ত। মেডিটেশন চর্চা করে আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

রহিমা বেগম

[শিক্ষক, পুটিবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। ৪১৯ ব্যাচ]

এসেছে সাফল্য শিক্ষায়, ক্যারিয়ারে ও পরিবারে

লক্ষ্যে অবিচল থাকার শক্তি দিয়েছে মেডিটেশন



১৯৯৬ সালে ক্লাস সিল্পে পড়ার সময় ৪২ ব্যাচে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি। কোর্সে মনছবির মেডিটেশনে সিদ্ধান্ত নিই, আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়ব। পরবর্তীতে

দেশের বাইরে এ বিষয়ে পড়ালেখার সুযোগ পাই।

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের এ দীর্ঘ সাফল্যযাত্রায় যা আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে তা হলো, মনছবি-আমি কী করতে চাই। প্রতি মুহূর্তে আমি আমার লক্ষ্যের জন্যে পরিশ্রম করেছি। আর এ শক্তি আমাকে দিয়েছে মেডিটেশন।

যেদিন আমি সফল হচ্ছি সেদিন কাজে বাঁপিয়ে পড়া অনেক সহজ, কিন্তু যখন একটি ব্যর্থতা আসে তখনো একই উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু করা ততটাই কঠিন। মেডিটেশন সেখানেই আমাদেরকে শক্তি দেয়, উদ্যম যোগায়।

[জানুয়ারি ২০১৬-তে বাংলাদেশী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. রুবাব খানের নেতৃত্বে নাসার একদল গবেষক মহাকাশে নতুন পাঁচটি সুপারস্টার আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে একাধিক সুপারস্টার আবিষ্কার এই প্রথম]



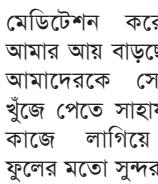
আমি মনে করতাম, রাগ পৌরুষের লক্ষণ। রাগ না থাকলে পরিবারের সদস্যরা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা আমাকে মানবে না। কোর্স করে আমার এ ধারণা পাল্টে গেছে। উপলব্ধি করলাম, রাগ না করে প্রশান্ত থেকেই বরং সম্মান বেশি পাওয়া যায়।

[কে. এম. হামিদুল হক, ব্যবসায়ী। ৪৩১ ব্যাচ]



টিভি সিরিয়াল দেখার আসক্তি ছিল আমার। কোনো পর্ব মিস হলে আমি অস্থির হয়ে যেতাম। কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে উপলব্ধি করেছি, এসব সিরিয়ালের কারণে আমাদের জীবনে নানা অশান্তি সৃষ্টি হয়। তাই কোর্স থেকে বাসায় গিয়ে প্রথমদিনই টিভি সিরিয়াল দেখা বন্ধ করলাম।

[অর্ণনা সাহা, গৃহিণী। ৪২৩ ব্যাচ]



মেডিটেশন করে ব্যবসায় আমার আয় বাড়ছে। এ কোর্স আমাদেরকে সেই শক্তিটা খুঁজে পেতে সাহায্য করে, যা কাজে লাগিয়ে জীবনকে ফুলের মতো সুন্দর করা যায়।

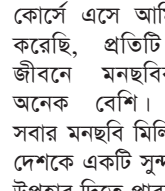
[জারু রায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হবিগঞ্জ। ৪১৮ ব্যাচ]



হতাশা-বিশৃঙ্খলতা কাটানোর জন্যে তরুণদের অনেকেই মাদকাসক্ত হচ্ছে, ক্ষতিকর কাজে জড়িয়ে পড়ছে। আমরা এগুলো থেকে বের হওয়ার পথও খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু এ সমস্যাগুলো সমাধানের পথ

আমাকে দেখিয়েছে মেডিটেশন।

[নাফিসা তাসনিম, শিক্ষার্থী, ভিকারুননিসা নুন কলেজ। ৪১৪ ব্যাচ]



কোর্সে এসে আমি উপলব্ধি করেছি, প্রতিটি মানুষের জীবনে মনছবির গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের সবার মনছবি মিলিয়ে আমরা দেশকে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারব।

[বাবলু চাকমা, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, কাপেং ফাউন্ডেশন। ৪৩১ ব্যাচ]

কোর্সে এসে আমি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। আগে বড় কোনো স্বপ্ন আমার ছিল না। চারপাশের মানুষের নানা ধরনের নেতিবাচক কথায় হীনম্মন্যতায় ভুগতাম। কিন্তু কোর্সে এসে উপলব্ধি করলাম, প্রতিটি মানুষই অত্যন্ত মূল্যবান!

[নাজমুন নাহার, গৃহিণী। ৪২৩ ব্যাচ]



প্রশ্ন : আমি তো অনেক কিছু জানি। অনেক কিছু চাই। কিন্তু জীবনটা সুন্দর হচ্ছে না কেন?

উত্তর : আপনি অনেক কিছুই জানতে পারেন, কিন্তু জীবনকে সুন্দর করার জন্যে শুধু কিছু তথ্যই যথেষ্ট নয়। কারণ সেটা কখনো জীবনকে সুন্দর করতে পারবে না, যদি সে তথ্যকে আপনার জীবনে বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া আপনি না জানেন। তথ্যটাকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া আপনাকে জানতে হবে। আর এ প্রক্রিয়ার নাম হলো মেডিটেশন।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, এ প্রক্রিয়াটাই আমরা গত ২৫ বছর ধরে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে সহজ ভাষায় ছড়িয়ে দিচ্ছি। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছি। মেডিটেশনের পথ ধরে লক্ষ মানুষের জীবন বদলেও গেছে। বদলের কথা বললেই শুধু হয় না, কীভাবে বদলাব, তা-ও জানতে হবে। ভালো কথা পড়া ও জানার পাশাপাশি এটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করার জন্যে মেডিটেশন চর্চা করতে হবে।

প্রশ্ন : আমার কোনো সমস্যা বা রোগ নেই, আমি ভালোই আছি। আমি কেন মেডিটেশন করব?

উত্তর : শুধু সমস্যা থাকলেই মেডিটেশন করতে হয়—এটা তো মহা ভুল ধারণা। মেডিটেশন বরং সফল মানুষেরাই বেশি চর্চা করেন। ইদানীং বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রনায়ক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, উদ্যোক্তা, প্রশাসক, এমনকি পেন্টাগনের জেনারেলরাও মেডিটেশন করছেন। কেন করছেন? প্রশান্তির জন্যে। মস্তিষ্কে আরো বেশি ব্যবহার করার জন্যে।

আমরা সেই ১৯৯৩ সালে বলেছি, মেডিটেশন হচ্ছে বিজ্ঞান। এটা কোনো ভোজবাজি বা অলৌকিক কিছু নয়। কারণ অলৌকিকত্ব এবং বিজ্ঞানের মধ্যে তফাত হচ্ছে অলৌকিক কিছুকে রিপোর্ট করা যায় না। মেডিটেশনকে আমরা বিজ্ঞান বললাম ১৯৯৩ সালে, আর ২০০৩ সালে টাইম ম্যাগাজিন প্রচ্ছদ নিবন্ধ করল The Science of meditation অর্থাৎ মেডিটেশনের বিজ্ঞান।

এ নিবন্ধে বলা হয়েছে, ‘এক কোটি আমেরিকান এখন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করেন। নব্বই দশকের তুলনায় এ সংখ্যা দ্বিগুণ। এ যুগে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে দলে দলে আমেরিকানরা এখন ঝুঁকছেন মেডিটেশনের দিকে। যার প্রমাণ মেডিটেশনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে এখন বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতি। দিন দিন মেডিটেশনের জনপ্রিয়তা এত বাড়ছে যে, মেডিটেশনে অবিশ্বাসীরাই এখন সেখানে সংখ্যালঘু। মেডিটেশনের এই বিস্তৃতির কারণ হলো, রহস্যের আবরণ থেকে বেরিয়ে মেডিটেশনের প্রক্রিয়া এখন অনেক সহজ ও ফলপ্রসূ। সেইসাথে রয়েছে মেডিটেশনের ওপর পরিচালিত অসংখ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিবাচক ফল।’

মূলধারার জনগণের পাশাপাশি এ দলে নাম লিখিয়েছেন বিখ্যাতরাও। এদের মধ্যে আছেন ফোর্ড মটরসের প্রধান ধনকুবের বিল ফোর্ড, সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর দম্পতি, সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এবং হলিউডের নামী-দামী সব শোবিজ তারকা। তাদের তো অর্থ, খ্যাতি, ক্ষমতা কোনো-কিছুরই অভাব নেই। তারপরও কেন মেডিটেশন করেন? প্রশান্তির জন্যে। এই ব্রেনটাকে আরো সুন্দর ও আরো ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্যে। আরো সফল হওয়ার জন্যে।

পিছিয়ে নেই আমাদের দেশের সফল ব্যক্তিত্বও। গত আড়াই দশকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ

কোয়ান্টাম মেথড ৯ আপনার প্রশ্নের উত্তর

লাখো মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি কোয়ান্টাম সম্পর্কে এসেছে অগণিত প্রশ্ন। এমন হাজারো প্রশ্নের জবাবের সংকলনই হচ্ছে ‘কোয়ান্টাম ৯ হাজারো প্রশ্নের জবাব ১ ও ২’। এ বই দুটি পড়ে আপনি উপলব্ধি করবেন জীবনের আসল সত্য। দ্বিধা সংশয় ভেঙ্গে যাবে বাস্তবতা ও বিদ্যার আলোয়। লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন—আমি বিশ্বাস করি, আমি পারি! এখানে তুলে ধরা হলো এমনই কয়েকটি প্রশ্নোত্তর :

নিয়েছেন আমাদের দেশের বরণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, ধর্মবেত্তা, কবি, লেখক, শিল্পীসহ সফল ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও বিভিন্ন অঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম বলে, মেডিটেশন মনকে প্রশান্ত করে। আমি কোরআন-হাদীসের আলোকে জানতে পারলাম একমাত্র নামাজই মনকে প্রশান্ত করতে পারে। এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : মনকে প্রশান্ত করার মতো নামাজ যাতে আপনি পড়তে পারেন এজন্যেই মেডিটেশন দরকার। শুধু ওঠা-বসা, রুকু-সেজদা দিলে নামাজ হয় না। নামাজের সংখ্যা তো কম নয়, কিন্তু যেভাবে আমরা নামাজ পড়ি তাতে যদি প্রশান্তি পাওয়া যেত, তাহলে দেশে এত অশান্তি থাকতো না।

নামাজ ঠিকভাবে পড়ার জন্যে প্রয়োজন মনোযোগ। আর মেডিটেশন তা-ই করে। মনকে বর্তমানে নিয়ে আসে। যখন আপনি মনকে বর্তমানে নিয়ে আসতে পারবেন, মনোযোগকে একত্র করতে পারবেন, আল্লাহকে অনুভব করতে পারবেন, তখনই সেই নামাজ আপনি পড়তে পারবেন—যে নামাজ মানুষকে প্রশান্ত করতে পারে। তখন আপনি বলতে পারবেন—নামাজই যথেষ্ট। কিন্তু ঐ স্তরে যেতে হলে মেডিটেশন প্রয়োজন।

এজন্যেই রসুলুল্লাহ (স) মেডিটেশন করেছেন। কিন্তু তিনি তা সবার জন্যে অবশ্য কর্তব্য করেন নি। নবীজী (স) কখনো চান নি, তিনি যত কঠোর সাধনা করেছেন, তার অনুসারীদের ওপর তা চাপিয়ে দিতে। অনেক কিছু তিনি নিজে করেছেন কিন্তু আমাদের জন্যে বলেছেন—তোমরা করলেও করতে পারো।

এ প্রসঙ্গে একাধিক ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, নবীজী (স) যেভাবে ইবাদত করতেন, রোজা রাখতেন এবং মেডিটেশন করতেন—তিনি তাঁর অনুসারীদের ওপর সে কঠোরতাকে চাপিয়ে দিতে চান নি। তিনি তাঁর অনুগামীদের ব্যাপারে অনেক নমনীয় ছিলেন।

প্রশ্ন : মুক্ত বিশ্বাস ও মেডিটেশন যদি সবকিছু এত সহজে বদলে দেয়, তাহলে অভাবগ্রস্তরা, রোগ-শোকে ভরা ক্রান্তরা কেন এ পথকে গ্রহণ করে না?

উত্তর : কারণ খুব সহজ। তারা বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায়। বিশ্বাস করে দুর্ভাগ্যে। বিশ্বাস করে অলীক কল্পনায়। বিশ্বাস করে প্রতারক, মুর্থ,

শয়তানকে। ভালো কিছুকে তারা সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। ইতিবাচক ভালো জিনিসকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কল্যাণকর ভালো জিনিস দেখলেই তাদের মনে সন্দেহ জাগে। এত ভালো হয় কীভাবে? এত সহজ!

ধর্মের ব্যাপারে এদের প্রশ্ন আছে। অধর্মের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। সত্যের ব্যাপারে এদের প্রশ্ন আছে। কিন্তু প্রচলিত অবিদ্যার ব্যাপারে এদের কোনো প্রশ্ন নেই। ঈশ্বরের ব্যাপারে এদের মনে প্রশ্ন আছে। শয়তানের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই।

একজন নাস্তিককে জিজ্ঞেস করুন। দেখবেন সে ঈশ্বর সম্পর্কে এক হাজারটা প্রশ্ন করছে। তাকে জিজ্ঞেস করুন, শয়তান সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন আছে? দেখবেন তার মুখে কোনো কথা নেই।

দুর্দশাগ্রস্তরা কেন দুর্দশামুক্ত হতে পারে না? কারণ এরা নেতিবাচক কথায় বিশ্বাস করে বেশি। নেতিবাচক কথায় প্রভাবিত হয়ে যায় সহজে।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। কোর্সের শেষদিন সবাই চলে যাওয়ার পরও এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। সুযোগ বুঝে কাছে এসে দুহাত জড়িয়ে ধরলেন। কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। একটু আবেগান্বিত হয়ে পড়েছেন। চোখে মুখে একধরনের কৃতজ্ঞতা। একটু স্থির হয়ে বললেন, আমার এত বছরের সমস্যা যে এত সহজে সমাধান হয়ে যেতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তার কথায় জানলাম, ভদ্রলোক শান্তিনগর এলাকায় থাকেন ২০ বছর ধরে। আমাদের অফিসের সামনের রাস্তা দিয়েই আসা-যাওয়া করেন প্রতিদিন। জিজ্ঞেস করলাম, এত বছর পরে কেন কোর্সে এলেন? আরো আগে এলে তো অনেক আগেই আপনি ভালো থাকতে পারতেন।

একটু ইতস্তত করার পর বললেন, দেখুন নানারকম কথা শুনেছি চারপাশ থেকে। একেকজন একেকরকম কথা বলেছেন। মাঝে মাঝে কৌতূহল যে একেবারে হয় নি তা-ও না। একবার ভেবেছিলাম নিজে একটু খোঁজখবর নেব, কিন্তু পরে নাপিতের কথা শুনে আর সাহস হয় নি।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম তার দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, মেডিটেশনের সাথে নাপিতের সম্পর্ক কী? তিনি বললেন, দেখুন মহল্লার নাপিত। বহু বছর ধরে চুল কাটাই তার কাছে। একদিন চুল কাটাতে গিয়ে কথায় কথায় বললাম, দেখি একবার কোয়ান্টামে যাব। সে হা হা করে উঠল—স্যার! শুনছি এখানে গেলে সব সন্ন্যাসী হইয়া যায়। ঈমান আমল সব নষ্ট হইয়া যায়। একেবারে বেদাতি কাজ। নাপিতের কথা শুনে মনে মনে বললাম—এমনিই কষ্টের শেষ নেই। আছে একটা ঈমান। তা-ও যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে আর থাকবে কী?

একটু হাসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এখন কী মনে হচ্ছে, ঈমান আছে না নাই? ভদ্রলোক বললেন, আর লজ্জা দিইন না। কোর্সে এসে শিখলাম, শোকরগোজার কীভাবে হতে হয়। গত দুইদিন নামাজে যে তৃপ্তি পেয়েছি তা সারা জীবনেও পাই নি।

এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। চারপাশে এ ধরনের ঘটনা অনেক। আসলে দুর্দশার বৃত্তে বন্দিরা দ্রাস্ত বিশ্বাস, নেতিবাচক কথা, সন্দেহ-সংশয় দ্বারাই প্রভাবিত হয় বেশি। এরা ধর্মাসক্তদের কথায়, চালবাজদের কথায়, শোষকদের কথায়, মুর্থদের কথায়, প্রতারকদের কথায়, দারোয়ানের কথায়, মুদি দোকানির কথায়, নাপিতের কথায় আরো সংশয়ী হয়ে ওঠে। নিজে অনুসন্ধান করে খোঁজখবর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্যম হারিয়ে ফেলে। তাই অনেক সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও এদের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়।

কোয়ান্টাম ইয়োগা ॥ তিন যুগে উপকৃত লাখো মানুষ

আধুনিক মানুষের চর্চার উপযোগী যোগব্যায়ামের সবচেয়ে সহজ ও ফলপ্রসূ সংস্করণ-কোয়ান্টাম ইয়োগা। তিন যুগ ধরে উপকৃত হয়েছেন লাখো মানুষ। বর্তমানে ঢাকাসহ সারা দেশে সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুদিনব্যাপী কোয়ান্টাম ইয়োগার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।



পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে
কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে অংশ নেয়া
১,১০৬ জন নবনিযুক্ত নারী কনস্টেবল।
২২ ও ২৩ নভেম্বর ২০১৭



শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ব্যায়ামরত শিক্ষার্থীদের
একাংশ। ২১ ও ২২ এপ্রিল ২০১৭



১৪-১৫ অক্টোবর, ২০১৬ ও ১৩-১৪ জানুয়ারি, ২০১৭ ঢাকায় বিসিএস প্রশাসন
একাডেমিতে দুদিনব্যাপী কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমের দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন
১৬২ জন পুরুষ ও ৬১ জন মহিলাসহ মোট ২২৩ জন বিসিএস ক্যাডার।



নির্বাচন প্রশিক্ষণ
ভবনে
(আগারগাঁও)
অনুষ্ঠিত
কোয়ান্টাম
ইয়োগা কার্যক্রমে
অংশগ্রহণকারী
জেলা ও
উপজেলা
পর্যায়ের
কর্মকর্তাদের
একাংশ।



বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সভারে কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়
২-৩ ডিসেম্বর, ২০১৬। ২২৪ জন পুরুষ ও ১০৪ জন মহিলাসহ এ কার্যক্রমে অংশ নেন নবনিযুক্ত মোট
৩২৮ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

যোগব্যায়ামের সর্বাধুনিক বই

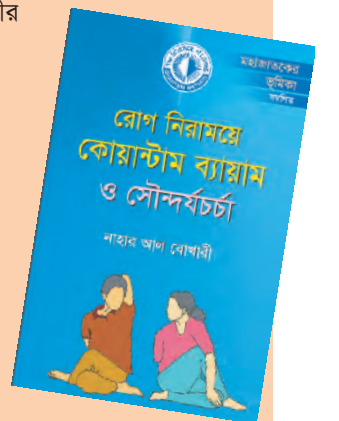
বাংলাদেশে মহিলাদের যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণের পুরোধা
ব্যক্তিত্ব মাদাম নাহার আল বোখারী
দীর্ঘ দুই যুগের অভিজ্ঞতা ও
বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণার
আলোকে যোগব্যায়ামকে
উপস্থাপন করা হয়েছে এ বইতে।

সুস্থ, সুন্দর ও সুখী জীবন
গড়তে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের
যে-কোনো সেন্টার শাখা সেল
থেকে আপনিও সংগ্রহ করতে
পারেন এ বই।

ফ্রি ডাউনলোড করতে পারেন

এই ঠিকানা থেকে :

publication.quantummethord.org.bd



বাংলাদেশের কোনো একপ্রান্তে নিভৃত গ্রামের হাইস্কুল। প্রতিদিন সকালে অ্যাসেম্বলিতে সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে পাঠ করে—
আমি এক অনন্য মানুষ।
আমরা এক মহান জাতি।...
জাতিধর্মবর্ণগোত্র নির্বিশেষে
মানুষের কল্যাণ করব। এভাবে দিনের পর দিন তারা উচ্চারণ করে কোয়ান্টাম প্রত্যয়ন। জীবনে প্রথম হওয়ার মন্ত্র অঙ্কুরিত হয় তাদের কোমল মনের উর্বর জমিনে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি মেধাবী এক তরুণ চিকিৎসকের। মূত্রথলিতে পাথর হওয়ায় পিঠে তীব্র ব্যথা তার। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ প্রায়। অপারেশন করে পাথর সরানো হলো, কিন্তু পিঠের ব্যথা আর মনের গভীরে অজানা ভয়ঙ্কর—কোনোটাই দূর হলো না।

একদিন এক বন্ধু দিয়ে গেল তিন ধরনের একটি বই। সুস্থতার আশায় সেই তরুণ চিকিৎসক বইটি



অনেকে হয়তো কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসার সুযোগও পান নি। অদেখা অচেনা এসব মানুষ কেবল বইটি পড়েই ফিরে পেয়েছেন শৃঙ্খলমুক্তির পথ, জেগে উঠেছেন মুক্ত বিশ্বাসের শক্তিতে। নন-ফিকশন এই বইটি ক্রমশ হয়ে উঠেছে জীবনের বই।

লাখো জীবন বদলের অনুঘটক

পড়ে মনছবির প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে লাগলেন নিয়মিত। একপর্যায়ে সেরে উঠলেন পুরোপুরি।

আছে এমন অজস্র ঘটনা। দুই যুগ ধরে এদেশের লক্ষাধিক মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে একটি বই—সাফল্যের চাবিকাঠি ॥ কোয়ান্টাম মেথড।

পাঠকদের অনেকেই বইটির লেখক গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সচেতন অস্তিত্বের উপস্থিতি সম্পর্কে হয়তো জানেনই না।

কোয়ান্টাম মেথড বইটির অনন্যতা এখানেই।

১৯৯৩ সালে প্রথম প্রকাশের পর বইটি দ্রুত অর্জন করে তুমুল পাঠকপ্রিয়তা। প্রাচ্যের প্রাচীন সাধকদের চিরায়ত জ্ঞান আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্মিলনে এটি একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজন পূরণে এক কালজয়ী গ্রন্থ। বহুবার পড়ার পরও মনে হয় নব নব উপলব্ধির এক অফুরান উৎস। পাঠক প্রতিবারই অনুপ্রাণিত হন সব প্রতিকূলতা জয় করে সামনে এগোতে।

আত্মনির্মাণের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে নিজের মেধা ও সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করতে চান এমন প্রতিটি সচেতন মানুষের নিত্যসঙ্গী কোয়ান্টাম মেথড বই।

নিয়মিত একাধ্র অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যে-কেউ আয়ত্ত করতে পারেন টেনশনমুক্ত জীবন, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য। তাই নিজে পড়ুন। উপহার দিন আপনার প্রিয়জনকে।

ফ্রি ডাউনলোড :

publication.quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম প্রকাশনা



সুখী ও সফল জীবন গড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সবার জন্যে সহজলভ্য করেছে কোয়ান্টাম প্রকাশনা। আত্মনির্মাণ, রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা, জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন, হাজারো প্রশ্নের জবাব ১ ও ২, রুদ্ররোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ, সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন, ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন, ভাঙো দুর্দশার চক্র—এ বইগুলো ছাড়াও রয়েছে কোয়ান্টাম কণিকা। আকারের ক্ষুদ্রতায় আর বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায় এক অভিনব প্রকাশনা কোয়ান্টাম কণিকা।

মেডিটেশন ও অটোসাজেশন চর্চার সুবিধার্থে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক অডিও। যে-কেউ নিয়মিত অনুশীলন করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাভ করবেন ইতিবাচকতা ও প্রত্যয়। বিশ্ববাসীর কাছে প্রশান্তির বাণী পৌঁছে দিতে ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি অডিও। ফাউন্ডেশনের যে-কোনো সেন্টার-শাখা-সেল থেকে সংগ্রহ করা যাবে এ প্রকাশনাগুলো।

ফ্রি ডাউনলোড :

publication.quantummethod.org.bd

quantummethod.org.bd

আত্ম-আসক্ত তরুণ প্রজন্মকে বায়বীয় জগতের মোহ থেকে মুক্ত করে জীবনের সার্থকতায় অনুপ্রাণিত করতে, প্রশান্তির সন্ধান দিতেই কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটের পথচলা। ইংরেজি ও বাংলায় যোগ-মেডিটেশনের ওপর এটি অন্যতম সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট। মেগা এই সাইটে আছে এখন মোট ১৪টি সাইট এবং ১১টি ওয়েব অ্যাপ।

ইয়োগা সাইট

২৫ পূর্তির প্রাক্কালে ডিসেম্বর, ২০১৭-তে কোয়ান্টাম ওয়েবের ইয়োগা সাইটটিকে ঢেলে সাজানো হয়। এ সাইটের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ইয়োগা সাজেশন। রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ইয়োগা এবং হয়ে উঠুন সুস্থ প্রাণবন্ত নামে দুটি ফিচারের মাধ্যমে রোগ ও অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজন বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞরা যে বিশেষ ইয়োগার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তার তালিকা ও ইয়োগা বিবরণ রয়েছে।

মোবাইল অ্যাপ

আল কোরআন মর্মবাণী অ্যাপ প্রকাশের মাধ্যমে এবছরই আইফোন অ্যাপের যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম। এতে আছে বাংলা ও আরবি টেক্সট ও অডিও সুবিধা। জানুয়ারি ২০১৮-তে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ইয়োগা সাজেশন আইফোন অ্যাপ। প্রকাশিত হয়েছে মেডিটেশন অ্যাপের পরিমার্জিত সংস্করণ।



কোরাম

নিজস্ব আর্কিটেকচারে বেটাকোরামের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৭-এর এপ্রিলেই। এরপর আরো কিছু ফিচার সংযোজনসহ বর্তমান সার্ভিসগুলোকেই আরো দক্ষ ও ব্যবহার বান্ধব করার কাজ চলে বছরের বাকি সময়ে। কোয়ান্টামের অনলাইন এ ফোরামটি এখন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

অটোসাজেশন ও প্রশ্নোত্তর অ্যাপ

এ বছর কোয়ান্টাম ওয়েবের অটোসাজেশন অ্যাপটিকেও ঢেলে সাজানো হয়। সার্চ সুবিধা ছাড়াও প্রতিটি অটোসাজেশনের সাথে এর বাংলা অডিওগুলোও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফলে সার্চ করা, পড়া বা শোনা সহ ব্যবহারের সবগুলো সুবিধাই এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

ফিলিংস ও ভিডিও অ্যাপ

এ ওয়েব অ্যাপটিতে এখন ক্যাটাগরি সংযুক্ত করায় আগের চেয়ে ব্যবহার বান্ধব। নতুন বেশ কিছু ভিডিও এসেছে ভিডিও অ্যাপে। আর উইশ অ্যাপও আগের মতোই আছে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বালা-মুসিবত, সমস্যা ও রোগমুক্তির যে-কোনো প্রার্থনায় কোয়ান্টাম সদস্যরা ছাড়াও এটি ব্যবহার করছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জানুয়ারি ২০১৮ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥

Phone : 9341441, 48319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd



কোয়ান্টাম বুলেটিন

বিশেষ সংখ্যা

ভার্চুয়াল ভাইরাস ॥ নীরব ঘাতক নিজে বাঁচুন, পরিবারকে বাঁচান

ফেসবুক
টুইটার
ম্যাপচ্যাট
ইনস্টাগ্রাম
সেলফি
ইউটিউব
ভার্চুয়াল গেম
স্মার্ট টিভি
স্মার্টফোন
ইন্টারনেট
আসক্তি

সাবধান!

ভার্চুয়াল
ভাইরাস!!

ফেসবুক টুইটার ম্যাপচ্যাট ইনস্টাগ্রাম সেলফি ইউটিউব
ভার্চুয়াল গেম, স্মার্ট টিভি, স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট আসক্তি



নিজে বাঁচুন
সন্তানকে বাঁচান

পিলে চমকানো সব বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাঙ্গের ভিত্তিতে
বিশ্বজুড়ে গবেষণা করলে, এসব ভার্চুয়াল ভাইরাস
মানবসংস্কৃতির চেয়েও মারাত্মক—যার মস্তিষ্ক পরিণতি
শুধু ব্যক্তিকে নয়, ধরে ধরে দিতে পারে পরিবার,
সমাজ এমনকি একটি জাতিকেও।
তাই আসুন, সময় থাকতে সচেতন হই। ভার্চুয়াল
ভাইরাসের মরণ-আগ্রাসন থেকে নিজে বাঁচি। বাঁচাই
সন্তানদের। সচেতন হই আত্মীয়-বন্ধু-জ্ঞাতবশীদেও
বাঁচাতে। বাঁচাই প্রিয় দেশবাসীকে।

quantummethod.org.bd

ভার্চুয়াল ভাইরাসের ভয়াবহতা সম্বন্ধে
দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে
কোয়ান্টাম প্রকাশিত বিশেষ ফোল্ডার

সচেতন হোন এখনই, আজ থেকেই।
ভার্চুয়াল ভাইরাসের ব্ল্যাক হোল
থেকে বেরিয়ে আসতে যত দ্রুত
উদ্যোগী হবেন তত ভালো থাকবেন
আপনি। ভালো থাকবে আপনার
পরিবার। এ মহামারী থেকে তাই
নিজে বাঁচুন। বাঁচান আপনার
সন্তানকে।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে
আজ যেখানে যত অস্থিরতা হিংস্রতা
নেতিবাচকতা, সমাজবিজ্ঞানী ও
মনোবিদদের গবেষণা-অনুসন্ধান
দেখা গেছে, এসবের একটি বড়
কারণ এই ভার্চুয়াল ভাইরাস। যে
মড়কে আজ পৃথিবীব্যাপী একটু
একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিমানুষের
নৈতিকতা, পারিবারিক বন্ধন ও
বিশ্বস্ততা, সামাজিক সম্প্রীতি ও
সমমর্মিতার মতো মানবিক উৎকর্ষের
চিহ্নগুলো।

বিশ্বজুড়ে খ্যাতনামা
বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে
পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-
প্রতিবেদনগুলো বলছে, স্মার্টফোন-
ইন্টারনেটের লাগামহীন ব্যবহার আর
গেম-ইউটিউব-সামাজিক যোগাযোগ
সাইটে আসক্তি জীবনঘাতী মাদকে
আসক্তির মতোই ভয়াবহ। যাকে
গবেষকরা অভিহিত করেছেন
'ডিজিটাল কোকেন' হিসেবে! তাদের
মতে, মাদকাসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে
নির্দিষ্ট মাদকের চাহিদা সৃষ্টি হলে যে
রাসায়নিক নিঃসরণ হয়, ঠিক একই
ঘটনা ঘটে এসব প্রযুক্তিপণ্যে আসক্ত
ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও। আর এ

আসক্তির শিকার আজ ধনী-গরিব
নির্বিশেষে লক্ষ কোটি শিশু-কিশোর-
তরুণসহ প্রায় সব বয়সী মানুষ।

শুধু তা-ই নয়, দেশে দেশে
এখন জটিল মনোদৈহিক রোগ-
ব্যাদির প্রধানতম কারণ হিসেবেও
এই ভার্চুয়াল ভাইরাসকেই দায়ী
করেছেন বিশেষজ্ঞরা। যা শুধু ব্যক্তির
জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বিষহ করে
তুলছে না, হুমকির মুখে ফেলেছে
মানব সভ্যতার চিরায়ত
মূল্যবোধগুলো। সামাজিক
যোগাযোগ নামধারী অবক্ষয়ের
নিঃশব্দ ঘুণপোকা আজ ক্রমাগত
ধ্বংস করে দিচ্ছে মানুষে মানুষে
সম্পর্কের শাস্ত্র ভিত্তি।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন ভার্চুয়াল
গেম ও সাইটে আসক্তি আর সেলফি
হুজুগ আজকের তরুণদের করে
তুলছে আত্মকেন্দ্রিক, বিষণ্ণ,
পরিবার-বিচ্ছিন্ন ও হতাশাক্রান্ত।
এদের সুস্থতা ও রোগমুক্তির জন্যে
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন
রীতিমতো চালু করতে হচ্ছে
স্মার্টফোন রিহাব সেন্টার!

তাই আসুন, নিজে সচেতন হই।
সচেতন করে তুলি আত্মীয়-বন্ধু-
প্রতিবেশী-সহকর্মীদের। ভার্চুয়াল
ভাইরাসের মরণ-আগ্রাসন থেকে
বাঁচাই সন্তান ও পরিবারকে। বাঁচাই
প্রিয় দেশবাসীকে। আর এ
সচেতনতার পথ ধরেই সূচিত হোক
আমাদের নৈতিক পুনর্জাগরণ।
মানবিকতার অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিক
প্রিয় বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞদের
দিক-নির্দেশনা
অনুসরণ করুন

- পরিবারকে সময় দিন।
পরিবারের জন্যে বরাদ্দ সময়ে
টিভি-কম্পিউটার-স্মার্টফোনসহ
সব ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস
থেকে দূরে থাকুন। সন্তান,
মা-বাবা, ভাইবোন, ও
আত্মীয়দের সাথে বাস্তব
যোগাযোগ ও একাত্মতা বাড়ান।
- আপনার স্মার্টফোন থেকে
ফেসবুক-টুইটারসহ সামাজিক
যোগাযোগ মাধ্যমের যাবতীয়
অ্যাপস আজই ডিলিট করে দিন।
পেশাগত/ শিক্ষাগত প্রয়োজনে
এসব ব্যবহার করতে হলেও তা
করুন শুধু কম্পিউটার/ ল্যাপটপে,
দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে।
- শিক্ষার্থীদের ওপর মোবাইল
ফোনের বিরূপ প্রভাব পর্যবেক্ষণ
করে ফ্রান্স সরকার স্কুলে মোবাইল
ফোন নিষিদ্ধ করেছে। যথাযথ
উদ্যোগ নিন আপনিও।
- নিজের ও সমাজের কল্যাণে
সৎসঙ্গে সক্রিয় থাকুন। সমমনা
মানুষদের সাথে গড়ে তুলুন
প্রত্যক্ষ সামাজিক যোগাযোগ।
- দৈনন্দিন জীবনে মেডিটেশন
ও কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চার
পাশাপাশি সুস্থ জীবন-অভ্যাস
গড়ে তুলুন। এতে ঘটবে
আপনার আত্মশক্তির জাগরণ-
ফলে সব ধরনের আসক্তিকে 'না'
বলতে পারবেন আপনি।

বাল্যবিবাহের ন্যায় বয়স ১৮'র আগে

স্মার্টফোনও নিষিদ্ধ হোক

quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম প্রকাশিত সচেতনতামূলক স্টিকার, দেশজুড়ে সংগ্রহ করছেন সর্বস্তরের মানুষ

QUANTUM the SCIENCE of LIVING

ফেসবুক-ইন্টারনেট আসক্তি সত্যিকারের দুর্ভাবনার বিষয়

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

একটা দৃশ্য কল্পনা করা যাক।

আপনি একজন বাবা কিংবা মা, আপনার ছেলেমেয়েরা বড় হয় নি, তারা স্কুল-কলেজে পড়ে। একদিন আপনি বাসায় এসেছেন, এসে দেখলেন আপনার ছেলে বা মেয়েটি টেবিলে পা তুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা সিগারেট টানছে। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী করছিস বাবা (কিংবা মা)?’

আপনার ছেলে কিংবা মেয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, ‘সিগারেট খাচ্ছি আমি (কিংবা আবু)।’

তারপর টেবিল থেকে পা নামিয়ে বলল, ‘খাওয়ার পর একটা সিগারেটে টান না দিলে ভালোই লাগে না।’

কথা শেষ করে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে তার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করল।

আপনি বললেন, ‘ঠিক আছে বাবা (কিংবা মা) সিগারেটটা শেষ করে হোমওয়ার্কগুলো করে ফেল।’

কথা শেষ করে আপনি ভেতরে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন : ‘আমার ছেলেটি (বা মেয়েটি) কত লম্বী। বাইরে কোনো ঝুট-ঝামেলার মাঝে যায় না। ঘরের মাঝে থাকে, মাঝে মাঝে সিগারেট খায়!’

আমি জানি, আপনারা যারা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ের বাবা তারা আমার এই কাল্পনিক দৃশ্যটির বর্ণনা শুনে যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন। বলছেন, একজন বাবা কিংবা মা তার ছেলে বা মেয়ের এরকম একটা আচরণকে কখনো এত সহজভাবে নিতে পারে না।

অবশ্যই নিতে পারে না এবং কখনো নেয় না।

সিগারেট হচ্ছে নেশা। এরকম আরো অনেক নেশা আছে, আমরা দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো দেখে অভ্যস্ত নই। তাই কাল্পনিক দৃশ্যটিতে অন্য নেশাগুলোর কথা না বলে সিগারেটের উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে।

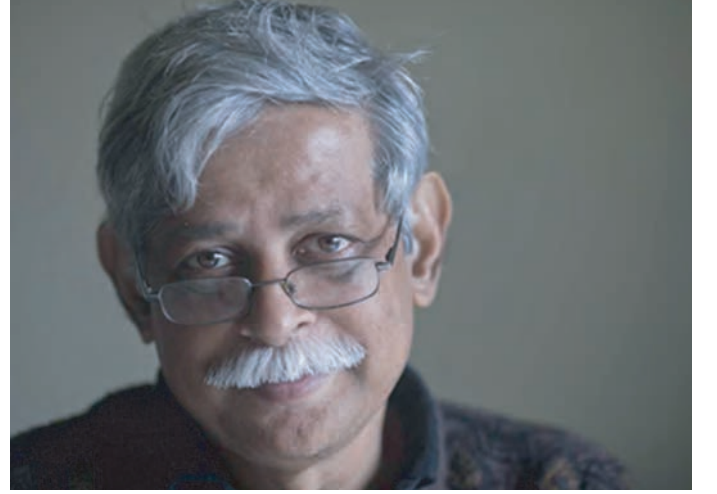
আমাদের সন্তান কোনো একটা নেশায় আসক্ত হয়েছে জানতে পারলে আমরা সেটা মেনে নিতে পারব না। আমরা দুশ্চিন্তিত হবো, বিচলিত হবো এবং সন্তানকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে পাগল হয়ে যাব। যদি এই বিষয়টা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে বসে থাকতে দেই?

যে বিষয়টি এতদিন একটা সন্দেহ বা আশঙ্কা ছিল, এখন সেই বিষয়টি গবেষণা জার্নালে বের হতে শুরু করেছে। কোকেন-আসক্ত একজন মাদকাসক্ত মানুষকে যদি মাদক খেতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে যে কেমিক্যালগুলো বের হয়ে তাকে অস্থির করে তোলে, ফেসবুকে আসক্ত একজন মানুষকে যদি ফেসবুক করতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে সেই একই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি ছেলমানুষী বিনোদন নয়, বিষয়টি মাদকে আসক্তির মতো গুরুতর একটি ঘটনা।

কারো কারো কাছে নিশ্চয়ই মনে হতে পারে, আমার পুরো বক্তব্যটা বুঝি একধরনের বাড়াবাড়ি। বিষয়টি মোটেও এমন কিছু গুরুতর নয়। কিন্তু আমি মোটামুটি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি-বিষয়টা যথেষ্ট গুরুতর।

মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সেটা যথেষ্ট রহস্যময়। একজন ছেলে বা মেয়ে যখন বড় হচ্ছে সেই সময়টাতে সে কীভাবে তার মস্তিষ্ক ব্যবহার করেছে, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে তার মস্তিষ্কের গঠনটি কেমন হবে। তাই একজন বড় মানুষের ফেসবুক আসক্তি দেখে আমি যতটুকু বিচলত হই তার থেকে অনেক বেশি বিচলিত হই, যদি সেটি হয় কমবয়সী একটি ছেলে বা মেয়ের আসক্তি।

আজ থেকে ১০ বছর পরে হয়তো আমরা জানতে পারব শৈশব-কৈশোরে মাঠে-ঘাটে ছোট্টাছুটি করে



খেলাধুলা না করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ছোট একটা জ্বিনের সামনে বসে থাকার কারণে আমাদের কী ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমাদের কিছু করার থাকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে একটুখানি কমনসেন্স হয়তো আমাদের অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

যারা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করছেন আমি তাদের এতটুকু খাটো করে দেখছি না। কিন্তু এই প্রযুক্তি যাদের ব্যবহার করছে, আমার দুশ্চিন্তা তাদের নিয়ে!

সবাই হয়তো জানে না, যারা এই প্রযুক্তি গড়ে তুলছে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছলে-বলে-কৌশলে কোনো একজনকে তাদের ওয়েবসাইটে কিংবা পোর্টালে নিয়ে আসা এবং যত বেশি সম্ভব তাদের সেখানে আটকে রাখা। যারা আমার কথা বিশ্বাস করেন না তাদের বলব-‘বিবিসি’র মতো কোনো সম্ভাব্য একটা নিউজ মিডিয়ার সাইটে যেতে। আশেপাশে তাকান, আপনি কী দেখবেন?

সারা পৃথিবীতে কত গুরুতর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে ওসবের চিহ্ন নেই। একেবারে না দিলেই নয় সে-রকম একটি-দুটি ঘটনার পাশাপাশি শুধু রংরং চটুল খবর। তার যে-কোনো একটাতে ক্লিক করে দেখেন আপনাকে নিজে থেকে তারা একটার পর একটা ভিডিও দেখাতে শুরু করবে, আপনার মনের জোর যদি যথেষ্ট বেশি না থাকে কিছু বোঝার আগেই আপনি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ভিডিও দেখে দেখে ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করে ফেলবেন।

আপনি কোন ধরনের ওয়েবসাইটে গিয়েছেন সেটি বিশ্লেষণ করে আপনাকে লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা সেই ধরনের জায়গায় ঠেলে দেবে! শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করেছেন বলে এই সাইবার জগৎ কিন্তু আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানে।

‘লাইক’ দেওয়া নিয়ে কিছুদিন আগে আমি একটা সত্যি ঘটনা শুনেছি। একটা বাচ্চা মেয়ে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলে কিছু একটা পোস্ট করে দিয়ে অপেক্ষা করে আছে সেখানে কেউ ‘লাইক’ দেবে। যখন দেখতে পেল কেউ তাকে খেয়াল করে ‘লাইক’ দিচ্ছে না, তখন সে নিজেই আর একটা অ্যাকাউন্ট খুলে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেকে ‘লাইক’ দিতে থাকল!

বিষয়টা একটা কৌতূহলের বিষয় কিন্তু তারপরও এটা শুনে আমি কেন জানি একটু আহত অনুভব করেছি। আমার মনে হয়েছে কেন আমার দেশের একটি ছোট্ট মেয়ে জীবনের প্রতি এরকম একটা দীনহীন মনোভাব নিয়ে কাঙালের মতো বড় হবে? কে ঠিক করে দিয়েছে জীবনকে অর্থপূর্ণ হতে হলে ফেসবুকে ‘লাইক’ পেতে হবে?

কেউ স্বীকার করুক আর না-ই করুক ইন্টারনেট আসক্তি কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে যদি বলা হয়, ফেসবুক আসক্তি একটি সত্যিকারের দুর্ভাবনার বিষয়। আমি তাই সবাইকে মনে করিয়ে দেই, অনলাইন জীবনের পাশাপাশি যে রক্তমাংসের বাস্তব জীবনটি আছে সেটি যেন আমরা ভুলে না যাই।

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন উজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম
২৪ মার্চ ২০১৭

ভার্চুয়াল বিপদ ॥ সত্য জানুন

ক্লাসের স্মার্ট ছেলেটি, অফিসের করিৎকর্মী সহকর্মী, প্রতিবেশী ভাবি-কার নেই ফেসবুক আইডি! সবার হাতে হাতে স্মার্টফোন! অতএব আমারও চাই। ব্যস, এভাবেই শুরু হয়ে গেল একঝাঁক ফেসবুক বন্ধু নিয়ে ভার্চুয়াল জীবন।

কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত তথ্য-উপাত্তগুলো বলছে, ফেসবুক চালাতে চালাতে কখন যে আপনি আসক্ত হয়ে যাবেন, টেরই পাবেন না। হুঁশ ফিরবে যখন, ততক্ষণে শরীর-মন আর পরিবারে অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। ফিরে পাবেন না আপনার ক্ষয়ে যাওয়া সময়-মেধা-অর্থ।

তথাকথিত সামাজিক যোগাযোগের বিধ্বংসী মাধ্যমগুলো তৈরির উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনি যেন এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন দিবারাত্র। আর এদিকে ভারী হতে থাকবে তাদের পকেট। আসুন, জেনে নিই বিশ্বব্যাপী নানা গবেষণায় উঠে আসা তথ্যগুলো :

বায়বীয় জগতে নিঃসঙ্গ প্রজন্ম

ফেসবুক ও ইউটিউবসহ ১১টি ভার্চুয়াল যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানীরা। এতে অংশ নেন ১৯ থেকে ৩২ বছর বয়সী ১,৭৮৭ জন, যারা দিনে দুই ঘণ্টার বেশি সময় এসব বায়বীয় মাধ্যমে ব্যয় করে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল একাকিত্ব। গবেষণায় আরো উঠে এসেছে, ভার্চুয়াল জগতে যারা যত বেশি সময় কাটায়, তাদের নিঃসঙ্গতা তত বেশি। তারা তত বেশি সমাজ-বিচ্ছিন্ন।

(দ্য টেলিগ্রাফ, ৬ মার্চ ২০১৭)

ফেসবুক আসক্তি = মাদকাসক্তি

ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি মাদকাসক্তির মতোই ক্ষতিকর। *জার্নাল সাইকোলজিক্যাল রিপোর্ট: ডিজঅ্যাবিলিটি এন্ড ট্রমা*-তে প্রকাশিত ফলাফলে

দেখা গেছে, ফেসবুক ব্যবহার করার দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে এমন মানুষদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নের সাথে মিলে গেছে মাদকদ্রব্য ও জুয়ায় আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের প্যাটার্ন।

ছবিতে লাইক পাওয়ার আগ্রহ মস্তিষ্কে নিঃসরণ করে ডোপামিন নামক হরমোন। ড্রাগ গ্রহণের সময় বা জুয়ায় জিতলে মস্তিষ্কে এই একই হরমোন নিঃসরণ হয়ে থাকে। (দ্য সান, ৬ জুলাই ২০১৬)

স্মার্টফোন ও ভিডিও গেম ॥

মেধাশূন্য ও আত্মসীমায় উঠছে তরুণেরা

ভিডিও গেম খেলার সময় ব্যক্তির মনে হয়, গেমের জগতটাই বাস্তব, এখানকার সবকিছু সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে। গেমের আসক্ত ব্যক্তি বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ বোঝা না-সে সাজানো নাটকের অংশমাত্র। এ কথাগুলো বলেছেন, আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট ডগলাস জেনটাইল।

আতকে ওঠার মতো একটি ঘটনা ঘটে ২০১০ সালে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক দম্পতি অনলাইন গেমের আসক্ত হয়ে সারাদিন সাইবার ক্যাফেতে পড়ে থাকত। একপর্যায়ে গেমের মধ্যে কাল্পনিক একটি শিশুকে নিয়ে তারা এতই মনোযোগী ছিল যে, বাস্তবে নিজেদের তিন মাস বয়সী সন্তানকে দিনে খাবার দিত মাত্র একবার। অনাহারে-অযত্নে শেষপর্যন্ত মারা যায় ছোট শিশুটি। (সিএনএন, ৫ মার্চ ২০১০)

জার্মানির মিউনিখে ১৮ বছরের এক তরুণ অতর্কিত হামলা চালিয়ে নয় জনকে নিহত ও ১৬ জনকে আহত করে। তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় সে ছিল সহিংস গেমের আসক্ত। দীর্ঘ গবেষণায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, সহিংস গেমগুলো কিশোরদের প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হিংস্র করে তুলছে। (টাইম ম্যাগাজিন, ১৭ আগস্ট ২০১৫)

শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে

শিশু-কিশোর সন্তানদের সামলাতে এখন ঘরে ঘরে মা-বাবার নাজেহাল অবস্থা। সন্তান আর তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। থাকবে কীভাবে? সন্তানকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে মা-বাবারই কিনে দেয়া স্মার্টফোন আর ভিডিও গেম!

২০১৬ সালের ইউনিসেফ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে প্রতি তিন জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু।

এ-ছাড়াও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমেরিকায় স্কুল থেকে বারে যাওয়া, পরিবার-বিচ্ছিন্ন হওয়া, সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারা তরুণদের এ সমস্যাগুলোর নেপথ্যে আছে ইন্টারনেট আসক্তি। (ওয়াশিংটন পোস্ট, ২০ মে ২০১৬)

বিষণুতায় আক্রান্ত কিশোর ॥

পরিণতি হতে পারে আত্মহত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের তথ্য হলো, ২০১০ থেকেই ১৩-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের বিষণুতায় ভোগা ও আত্মহত্যা-প্রবণতা বেড়ে গেছে। কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই হার তুলনামূলক বেশি। পরবর্তী পাঁচ বছরে যা আরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৫ ভাগে। আর বিষণুতায় ভোগার হার বেড়েছে ৩৩ ভাগ। গবেষকদের মতে, এজন্যে দায়ী স্মার্টফোন ও

প্রযুক্তিপণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহার।

যেসব কিশোর-কিশোরী স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিভাইসে দিনে পাঁচ ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করছে, তাদের ৪৮ ভাগ অন্তত একবার হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে। (হিন্দুস্তান টাইমস, ১৫ নভেম্বর ২০১৭)

সাইবার বুলিং ॥ নৃশংসতার নতুন ফাঁদ

অনলাইনে অশালীন কথা ও ছবি, অকথ্য গালিগালাজ, এমনকি হত্যার হুমকির নামই সাইবার বুলিং। আমাদের দেশেও ঘটছে এ ধরনের ঘটনা।

ঢাকার উত্তরায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৈরি হওয়া পাঁচটি গ্রুপের খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। পারস্পরিক বিবাদ প্রথমে ফেসবুকে অশোভন ভাষায় হুমকি দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা রূপ নেয় বাস্তব নৃশংসতায়। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি একটি গ্যাং-এর কিশোররা খুন করে তাদেরই সহপাঠীকে।

গুরুতর মানসিক রোগ ‘সেলফিটিস’

ঘন ঘন সেলফি তোলা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্যে ব্যাকুল হওয়ার নামই সেলফিটিস। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণত যারা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং অনুকরণপ্রিয় (ট্রেন্ডি), তারাই মূলত সেলফি রোগে আক্রান্ত। (দ্য টেলিগ্রাফ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭)

দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে

মনোদৈহিক স্বাস্থ্য-সমস্যা

দ্য স্পাইনাল জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘক্ষণ ঝুঁকে ফেসবুক ব্যবহারে ঘাড়ের ক্রমাগত চাপ পড়ে। এ চাপের পরিমাণ একজন ব্যক্তির মাথার ওজনের প্রায় ছয়গুণ। ফলে ফেসবুক আসক্তরা আক্রান্ত হচ্ছে ‘টেক্সট নেক’ নামক ঘাড়ব্যথায়।

আবার আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষণুতায় আক্রান্ত হওয়া, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কারণও হচ্ছে দীর্ঘসময় ইলেকট্রনিক ডিভাইসের স্ক্রিনের দিকে এভাবে ঝুঁকে থাকা। (নিউইয়র্ক টাইমস, ২৫ জানুয়ারি ২০১৮)

আসক্ত হয়ে পড়ছেন না তো!

একজন গড়পড়তা ব্যবহারকারীও দিনে অন্তত দেড়শ বার স্মার্টফোনের মেসেজ বা নোটিফিকেশন চেক করেন। শুধু তা-ই নয়, প্রয়োজন ছাড়াই স্মার্টফোনের স্ক্রিন অন-অফ করেন বা ওয়ালপেপার দেখেন দিনে অন্তত দু-হাজার বার।

(দ্য গার্ডিয়ান, ১১ নভেম্বর ২০১৭)

গবেষকদের ভাষ্য হলো, যারা অ্যালকোহলিক তারাও যুক্তি দেন-‘আমার তো কোনো সমস্যা হয় না, বরং কিছুটা পান করলেই আমি বেশ চনমনে থাকি আর আমি মাতালও হই না।’ কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার ঠিকই হয়, যা-ই বলুক তারা।

সচেতন হওয়ার দায়িত্ব আপনার

প্রিয় পাঠক, ভার্চুয়াল জগতের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সত্যটা তো জানলেন। এবার সচেতন হওয়ার পালা। এ দায়িত্ব একান্তই আপনার।



ফেসবুক নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিশেষত আমাদের তরুণরা এখন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। এটি একটি রোগ। আজ আমাদের পরিবারগুলো হয়ে পড়েছে এই বিচ্ছিন্নতাবোধের সবচেয়ে নির্মম শিকার।



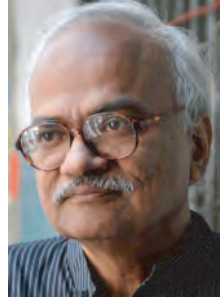
ফলে সমাজের সর্বত্রই কারো সাথে কারো সত্যিকার যোগাযোগটা আর হচ্ছে না। একটা সময় ছিল, যখন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো ছিল মানুষে মানুষে মিলনের কার্যকর ক্ষেত্র। যেমন : গ্রন্থাগারে যাওয়া, গান-আবৃত্তি-নাটকে সবাই মিলে অংশ নেয়া, একসাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসবের প্রায় কিছুই এখন নেই। সিনেমাও এখন লোকে আর হলে গিয়ে দেখে না, যার যার ঘরে বসে দেখে।

এর প্রতিকারের জন্যে চাই সামাজিক যোগাযোগ। ফেসবুকের যোগাযোগ নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ। আমি একা ঘরে বসে লিখছি, গাইছি, সিনেমা দেখছি—এ ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, মহল্লায় সবখানেই সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এভাবেই পুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে আমরা একটি চাপা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারব বলে আমি মনে করি। কারণ বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাঁচতে পারব না। শেষপর্যন্ত এ ব্যবস্থার বদল আমাদের করতেই হবে।

[শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

উপদেশ নয়, শিশু চায় দৃষ্টান্ত আবুল মোমেন

শিশুদের নিয়ে ৪১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—সরাসরি উপদেশ দিলে শিশু কিছু শেখে না। শিশু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ, সে চায় দৃষ্টান্ত। সে সবকিছু দেখে দেখে শেখে। শিশু যে-রকম বড়দের জুতা পরে, শাড়ি পরে, স্বভাবটাও সে বড়দের কাছ থেকেই আয়ত্ত করে।



মা-বাবা ঝগড়া করবেন আর আশা করবেন সন্তান শান্তশিষ্ট হবে, যৌক্তিক আচরণ করবে, এটা হবে না। দৃষ্টান্ত দিতে হবে তার সামনে, যেন সে বুঝতে পারে কোনটা সত্য, কোনটা গ্রহণযোগ্য। আর দেখতে হবে, বয়স-উপযোগী শিক্ষাটা ওর হচ্ছে কিনা। তাকে লার্নিং অব লাইফ দিতে হবে। এ শিক্ষা আমাদের দেশে স্কুল দেয় না, তাই এ কাজ করতে হবে বাবা-মা-পরিবারকে।

সবাই জিপিএ ফাইভের ফাঁদে পড়ে গেলে শিশুরা সামগ্রিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত হবে। তখন অঙ্কে ইংরেজিতে সে দুর্দান্ত রেজাল্ট করবে কিন্তু তার মানবিক বোধগুলো বিকশিত হবে না। দেখা যাবে, সে নানারকম ভুলভ্রান্তি করছে। কারণ তার মূল্যবোধের জায়গাটা ফাঁকা।

ইদানীং একটা প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে যাদের অধিকাংশই সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে পারে না। তারা মনে করে মিথ্যা দিয়েও সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। এ বিষয়টাই সবচেয়ে ভয়ংকর। এভাবে সমাজ বেশি দূর যেতে পারে না।

[কবি, লেখক ও কলামিস্ট। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্রগ্রামে শিশু সাদাকায়নে প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, কিন্তু সচেতনতা বাড়ে নি

অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক

আগে জীবনে ফেসবুক ছিল না, তবে শান্তি ছিল। এখন ফেসবুক না দেখে আমরা দুদণ্ড শান্তিতে বসতে পারি না—কে কী লিখল, কে কার বদনাম করল, তার উত্তর না দিলে রাতে আমাদের ঘুম পর্যন্ত আসতে চায় না!



অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন কী হচ্ছে? যেই কারো সাথে কিছু হলো—কাছের কিংবা দূরের, পরিচিত বা সামাজিকভাবে চেনা—অমনি সে তার নামে একটা নেতিমন্তব্য করে দিল ফেসবুকে। মুহূর্তেই সেটি জেনে গেল আরো অনেক মানুষ। বহুদিনের সম্পর্ক, এক মন্তব্যেই শেষ!

এভাবে নিজেদের শান্তি নষ্ট করছি আমরা। সমাজে বৈরিতা বাড়ছে, প্রতারণা বাড়ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে। আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, কিন্তু সচেতনতা বাড়ে নি। ফলে এক ধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানবিক গুণগুলো।

[মনোচিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম

আমি তখন বিলেতে পড়াশোনা করি। একদিন গুনলাম, সেই দেশের পারমাণবিক কেন্দ্রে যারা কাজ করে প্রতিদিন কর্মস্থলে ঢোকার সময় মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়



তাদের। কারণ কোনো কারণে হঠাৎ যদি সে ভুল করে একটা টিপ দিয়ে বসে, সারা পৃথিবী মুহূর্তেই শেষ! কিন্তু এভাবে পরীক্ষা করে কয়দিন? সারাদিন যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে করতে যে মানুষ একেবারে যন্ত্রের বশীভূত হয়ে গেছে, তাকে তো যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান যুগে মানুষ মহাকাশে যাচ্ছে, তার জীবনযাত্রার মান ও শক্তি-সম্পদ অকল্পনীয়ভাবে বেড়েছে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে। কিন্তু ধন-জ্ঞান-জন, এ-ই কি সব? পাল্লা দিয়ে যে বাড়ছে নৃশংসতা লোভ ঘৃণা যুদ্ধ ও গণহত্যা! কমছে মমত্ববোধ ও সম্প্রীতি। তাই এ কালে আমাদের অর্জন অনেক—এটা সত্যি, কিন্তু বিসর্জনও কম নয়।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনভূমির অধ্যাপক ও লেখক। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যে আসক্তির কারণে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা কমে যাচ্ছে

অধ্যাপক ডা. আবদ হোসেন মোল্লা



ইদানীং শিশুদের অনেকেই বয়স হওয়ার পরও কথা বলছে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মা-বাবা অফিসে চলে যান আর কাজের লোকের সাথে বাচ্চাটা সারাদিন টিভি দেখে। কিছু কিছু মা-বাবা মোবাইলে কম্পিউটারে কার্টুন দেখিয়ে, ভিডিও দেখিয়ে বাচ্চাকে খাবার খাওয়ান। এভাবে তারা নিজের অজান্তেই সন্তানকে আসক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

এখনকার বাচ্চারা অনেক রাত করে ঘুমাতে যায়, অনেক বেলা করে ওঠে। রাত জেগে টিভি দেখাটা সে শিখছে বাবা-মার কাছ থেকে। কম ঘুমের ফলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা কমে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বসে শিশুরা সবসময় গুধু স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকছে। এতে বাড়ছে মেদস্থলতা, চোখেরও ক্ষতি হচ্ছে। বছর দেড়েক আগে একটি জাতীয় দৈনিকে লিড নিউজ ছিল—ঢাকা

শহরে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি শিশুর চোখে এখন চশমা লাগে। এ-ছাড়া রেডিয়েশনের প্রভাব তো আছেই। অনেকে ঠিকমতো কানেও শোনে না। লেখাপড়াতেও তাদের মনোযোগ কমে যাচ্ছে দিন দিন।

বাচ্চাদের ধ্যানজ্ঞান এখন স্মার্টফোন। এতে করে সামাজিক আদব-কায়দা, অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান, কিছুই সে শিখছে না। প্রযুক্তিপণ্য-আসক্ত এ শিশুরা যেন জড় পদার্থ হয়ে যাচ্ছে। এই যে স্বাস্থ্যগত এবং সামাজিক সমস্যা—এর পেছনে এই ভার্চুয়াল ভাইরাসের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আমি মনে করি, অভিভাবকদের এখনই সচেতন হতে হবে। নিজেকে ও পরিবারকে শৃঙ্খলার ভেতরে আনতে হবে। স্মার্টফোন-সহ এ ধরনের জিনিসগুলোর ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]



ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো

আসাদুজ্জামান নূর

আমার বাড়ির কাছেই একটা স্কুল আছে। রোজ সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, অনিচ্ছুক বাচ্চাগুলোকে মায়েরা টানতে টানতে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন। অত সকালে তো কারো স্কুলে যেতে ইচ্ছা করে না, আবার পিঠে বইয়ের ব্যাগটাও এত ভারী যে, বাচ্চারা সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। স্কুলটা একটা তিনতলা বাড়ি-ওখানে না আছে কোনো মাঠ, না আছে কোনো খেলাধুলার ব্যবস্থা।

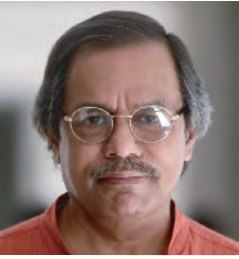
ক্লাস-হোমওয়ার্ক-কার্টুন, এখন এই হলো একটা শিশুর জীবন। ওর জীবনে নদী ফুল আকাশ পাখি কিছুই নেই। মা-বাবার সঙ্গেও যে তার খুব একটা কথাবার্তা হয়, তা-ও না। মা-বাবা কেন, আজকাল তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই কথা হয় না। সবাই টিভি-সিরিয়াল আর খেলার চ্যানেল দেখায় ব্যস্ত। এভাবে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো।

কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে কেবল ক্লাসের বই পড়ালে হবে না, তার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ তার হৃদয়ে যে আবেগ আছে তা ভুল পথে পরিচালিত হলে মানুষের জন্ম না হয়ে অমানুষের জন্ম হতে পারে! কিন্তু আমরা তো দানবের সমাজ গড়তে চাই না। আমরা একটি মানবিক সমাজ গড়তে চাই।

[কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন বরণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর]

গ্যাং কালচার শেখায় গেমস

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম



বর্তমান পরিস্থিতির দায় প্রথমত পরিবারের, দ্বিতীয়ত শিক্ষাব্যবস্থার। পরিবারগুলোর চিন্তা এখন বৈষয়িক উন্নতি কেন্দ্রিক। এতে করে দুর্নীতির বিশাল বিস্তার ঘটেছে এবং

পরিবারগুলো নৈতিক অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে। এর একটা প্রভাব শিশু-কিশোরদের ওপর পড়ছে। সনদনির্ভর লেখাপড়া শিশুদের বিনোদন বা অবসর দিতে পারে না। তারা গেমস খেলে বা ফেসবুক ব্যবহার করে। গেমস গ্যাং কালচার শেখায়, খেলার মাঠে দলের যে ধারণা তৈরি হয় তা শেখায় না।

[৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ 'নৃশংসতার চর্চা বাস্তবে, ভার্চুয়াল জগতে' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক প্রথম আলোতে। সম্প্রতি ঢাকার উত্তরায় কিশোরদের গ্যাং কালচার-এর দৌরাড্রা এবং নৃশংসতার প্রসঙ্গে একথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম]

১৬ বছর বয়সের আগে মোবাইল ফোন ব্যবহার নয়

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত



মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার শুধু বিপজ্জনক নয়, এর চেয়েও বেশি কিছু। মোবাইলে ১৫ মিনিট কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বাড়ে, শিশুদের

ক্ষেত্রে আরো বেশি। তাই ১৬ বছর বয়সের নিচে কোনোভাবেই মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়।

দেশে এখন থাইরয়েড ক্যান্সার, প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ ও বন্ধ্যাত্ব আগের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এর সম্ভাব্য প্রধান কারণ লোকালয়ে অনিরাপদ উচ্চতায় মোবাইল ফোনের টাওয়ার স্থাপন এবং মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

[বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রখ্যাত নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

যখন কোনো মোবাইল ফোন অপারেটর বলে, যত কথা তত শাস্ত্রয়-আমরা ভেবে দেখি না কীরে শাস্ত্রয়। মধ্যরাত্রে কম পয়সায় কথা বলা যাবে, এজন্যে মানুষ মধ্যরাত্রে পর্যন্ত



জেগে থাকছে। এই হলো আমাদের সমাজের চিত্র। আমরা তো আগেও টেলিফোন ব্যবহার করতাম, কিন্তু তা ছিল প্রয়োজন। আর এখন হাজার কোটি টাকা শুধু কথা বলে অপচয় করা হচ্ছে। অথচ উন্নত অনেক দেশেই কিন্তু এরকম গণহারে মানুষ মোবাইল ব্যবহার করে না। মোবাইল ফোন খুবই বিপজ্জনক। বাচ্চারা এটা নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, কানে আবার হেডফোন দিয়ে রাখে, আশেপাশে কী হচ্ছে সে কিছু শোনেও না। ড্রাইভাররা গাড়ি চালাচ্ছে আর ফোনে কথা বলছে। দুর্ঘটনার পরিমাণও বাড়ছে।

আমার মনে হয়, বর্তমানে মোবাইলসহ অন্যান্য গ্যাজেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। স্মার্টফোন আর এ ধরনের ডিভাইসগুলোর কারণে ক্রমেই চিন্তাভাবনা করার সামর্থ্য আমরা হারিয়ে ফেলছি।

২০-২৫ বছর আগে ফার্মাস লাস্ট থিওরেম নামে একটা থিওরেম সাত বছর চেষ্টা করে সমাধান করলেন ব্রিটিশ গণিতবিদ এন্ড্রু ওয়াইলস। একটা সমস্যা নিয়ে সাত বছর! এটা হলো মনোযোগ। এরকম মনোযোগ না হলে কেউ কোনো কাজে সফল হতে পারে না। যে-কোনো সমস্যার সমাধানও নির্ভর করে, আমি ওই কাজ নিয়ে কতটা লেগে থাকতে পারি, তার ওপর।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলতেন, It's not that I'm so smart. It's just that, I stay with problems longer. আসলে এটাই সাফল্যের চাবিকাঠি। আজকাল ছাত্রছাত্রীরা কোনো কিছুতেই এরকম লেগে থাকতে পারে না।

আমরা যদি দৌড়াডৌড়ি না করি, তাহলে পায়ের মাংসপেশি সবল হবে না। আমরা যদি হাত ব্যবহার না করি, তাহলে হাতের পেশি সবল হবে না। তেমনি আমরা যদি চিন্তা না করি, তাহলে মস্তিষ্কও সবল হবে না। আমরা যদি এখন মোবাইলে খেলাধুলা করতে ব্যস্ত থাকি, ফোন করায় ব্যস্ত থাকি, তাহলে চিন্তাশক্তি কখনো বিকশিত হবে না।

বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, দেখা করা, অনুভূতির আদান-প্রদান, সবকিছুই এখন মোবাইলে আর ইন্টারনেটে। এগুলো অর্থেরও অপচয়। এ যুগে তরুণদের একটি বড় অংশের মধ্যেই নৈতিক মূল্যবোধও গড়ে উঠছে না।

তাই স্মার্টফোনসহ যে-কোনো প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত বাচ্চাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে হবে অথবা এগুলো ব্যবহার করা থেকে।

[শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

আধুনিক গ্যাজেট ব্যবহার শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের অন্তরায়

অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার



নবজাতকের মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ঘটে। আর এভাবেই তার মস্তিষ্ক বিকশিত হয়। যোগাযোগের সুবিধার্থে শিশুর মস্তিষ্কে প্রতি সেকেন্ডে তৈরি হয় প্রায় ৭০০টি সিন্যাপস। এ পুরো প্রক্রিয়াটির ফলাফল ভালো না মন্দ হবে, তা নির্ভর করে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ওপর।

তাই শিশুর সঠিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজন পরিবেশের যথাযথ উদ্দীপনা ও সাড়া দেয়ার সুযোগ। যেমন : শিশু যখন কিছু নিয়ে প্রশ্ন করে বা কৌতূহলী হয় তখন পরিবারের সদস্যরা সেটির সাথে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু টিভি, মোবাইল ফোন, ট্যাব শিশুকে একতরফা কিছু উদ্দীপনা দিতে থাকে—যেখানে শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখানোর বা ভাবের আদান-প্রদানের কোনো সুযোগ

নেই। এটি তার মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায়। এতে শিশুর মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও নবজাতক ইউনিটের প্রধান, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট আসক্তির পথ ধরে ব্যক্তিগীবনে, পারস্পরিক সম্পর্কে ও সমাজে ধৈর্যে আসছে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তবতা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, অভিজ্ঞতা যেমনই হোক চারপাশের অনেকেই আজ কমবেশি ভুক্তভোগী। এমনই কয়েকটি টুকরো দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হলো। সম্ভব কারণেই সবার নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হলো না।

ঘটনা ১

সেদিন ছিল এসএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। এক পরিচিতের সাথে দেখা হতেই জানতে চাইলাম, ছেলের পরীক্ষা কেমন হচ্ছে? উনি প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন, ছেলে পরীক্ষা দিতে চায় না। এক প্রকার জোর করেই ছেলেকে পরীক্ষার হলে নিয়ে এসেছেন তিনি। ১০টায় পরীক্ষা শুরু, কিন্তু ৯টার সময়ও সে বিছানা ছাড়তে চাচ্ছিল না। সারারাত ছেলে ইন্টারনেট নিয়ে মেতে ছিল। কিছুই তো সে পড়ে নি, কী লিখবে?

জানতে পারলাম, জেএসসি পরীক্ষার সময় ছেলে আবদার করেছিল, গোন্ডেন এ প্লাস পেলে তাকে স্মার্টফোন, গিটার আর বাঁশ কিনে দিতে হবে। এটাই কাল হয়েছে। এরপর স্মার্টফোন ছাড়া আর কিছুতেই সে আত্মবোধ করে না। কোনোকিছুতে তার মনোযোগ নেই। ছেলেটির মা বুঝতেই পারছেন না, কীভাবে কী হয়ে গেল।

ঘটনা ২

প্রবাসী এক ইঞ্জিনিয়ার ভীষণ ব্যস্ত তার অফিসের কাজে। তার স্ত্রী ব্যস্ত সংসারের কাজে। একমাত্র সন্তানকে সামলানো স্ত্রীর পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই সহজ সমাধান হিসেবে দূরন্ত সন্তানকে কম্পিউটার গেম-এ বসিয়ে দিয়ে দুজনেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

একসময় দেখা গেল, তিন বছরের বাচ্চা কম্পিউটারের গেম ও পাজল বাটপট মেলাতে পারে। কিন্তু আচরণগতভাবে সে স্বাভাবিক নয়। সে খুবই অস্থির এবং কারো দিকে সরাসরি তাকায় না, কোনো প্রশ্নের উত্তরও দেয় না।

কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা আর স্মার্টফোনে গেম খেলা ছাড়া তার অন্য কোনোদিকে মনোযোগ নেই। সমবয়সী শিশুদের সাথেও সে মিশতে পারে না। এখন ডাক্তারদের আশঙ্কা-শিশুটি অটিজমে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

ঘটনা ৩

মেয়েটির বাবা মারা গেছে। আত্মীয়স্বজন সবাই মিলে তার বিয়ে ঠিক করল। হুবহু বর বিয়ের আগেই তাকে উপহার দিল একটি স্মার্টফোন। ধীরে ধীরে মেয়েটি ফোন-আসক্ত হয়ে পড়ল। সে সারাদিন শুধু ফোনে কথা বলে। বিয়ের দিনও দেখা গেল, কনে সেজেগুজে ফোনে কথা বলছে। কিন্তু বরের কানে ফোন নেই। স্বশ্রববাড়িতে গিয়েও সারাদিন সে ফোন নিয়ে পড়ে থাকে। একসময় শুরু হয় অশান্তি।

পরবর্তীতে জানা যায়, সৌদিপ্রবাসী অন্য একটি ছেলের সাথে তার যোগাযোগ। মেয়েটিও সেখানে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একপর্যায়ে মেয়ের পরিবার প্রবাসী ছেলেটির সাথে যোগাযোগ করে এবং দূরে সরে যেতে বলে। এরপর ছেলেটি মেয়ের ছবি ও আজবাজে কথা ফেসবুকে দিয়ে দেয়। বর্তমানে তার বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা হচ্ছে। এখন মেয়েটি শুধু কান্নাকাটি করে।

ঘটনা ৪

বর্তমানে শুধু তরুণরা নয়, অনেক বয়স্ক মানুষও ইন্টারনেটে আসক্ত। অভিভাবকেরা যেখানে তাদের সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত, সেখানে আমি চিন্তিত

এডভোকেট সুব্রত বর্দন, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে আমার পরিবার। আমাদের একমাত্র মেয়ে অপূর্বা বর্দন স্বর্ণা। মেয়ের বয়স যখন ১০, তখন আমাদের ছেলেটার জন্ম। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটি অনেক মেধাবী। সে খুব সুন্দর গান গাইত। ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত সম্মিলিত মেধা তালিকায় বরাবরই সে প্রথম হয়েছে। পিএসসি-তে বৃত্তি পেয়েছিল। ক্লাস সেভেন থেকে তার মাঝে আমরা কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি। সে আগের চেয়ে চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিল। রেজাল্টও ভালো হচ্ছিল না।

এ সময় মায়ের নতুন এন্ড্রয়েড ফোনটা সে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। প্রথমদিকে পড়াশোনার কাজেই সে এটা ব্যবহার করত। কিন্তু আস্তে আস্তে মোবাইল ব্যবহারের প্রবণতা বাড়তে থাকে। বাসায় যতক্ষণ থাকত সারাক্ষণ মায়ের স্মার্টফোনটি নিয়েই সময় কাটাত। এভাবেই চলছিল।

হঠাৎ একদিন সকালে আমরা মেয়েকে আবিষ্কার করি সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায়। অথচ রাতেও মেয়ের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। তার আচরণে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে নি। সে বলল, রাত জেগে সে পরীক্ষার পড়া তৈরি করবে। আর পরদিনই এ ঘটনা। আমার ভুল হয়েছে, মেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার ভেবে তার গতিবিধি আমি খতিয়ে দেখি নি। ইন্টারনেটে সে কী করছে বা কাদের সাথে যোগাযোগ করছে, জানতে চেয়েছি কখনো কখনো। কিন্তু মেয়ের বোঝানোতে আমি প্রভাবিত হয়েছি। বুঝতে পারি নি, এই স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট আসক্তিই তাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে।

সন্তান হারানো একজন পিতা হিসেবে আমি বলতে চাই, কোনো মা-বাবা সন্তানকে রাত জাগতে দেবেন না। রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহার খুব ক্ষতসাম্মক হয়। ১৮ বছরের নিচে সন্তানকে স্মার্টফোন ব্যবহার করতে দেবেন না। খেলায় রাখুন, সন্তান অনলাইন গেম খেলছে কিনা। এসব গেমের টার্গেটই হয় টিনএজাররা। সন্তানের দিকে আরো সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে।

বর্তমানে শুধু শহরে না গ্রামেও স্মার্টফোনের ছড়াছড়ি। পরিবারের সদস্যরা বিদেশে গিয়ে প্রথমেই আত্মীয়স্বজনদের জন্যে একটা এন্ড্রয়েড সেট পাঠায়। সেই সেটটা কিন্তু আর অভিভাবকের হাতে থাকে না, টিনএজ সন্তানের হাতে চলে যায়। আমি চাই অভিভাবকরা সবাই সচেতন হোক।

এই সমস্যাগুলো সমাধানে এগিয়ে আসা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। স্কুলের আইসিটি শিক্ষকও যেন কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের এই ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে আপডেটেড থাকেন। অভিভাবক-শিক্ষার্থী সবাইকে নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনায় যাওয়া উচিত। সেইসাথে মেডিটেশন করা উচিত। তাহলে আমাদের সন্তানদের মনোবল দৃঢ় হবে, তাদের আত্মজাগরণ ঘটবে। তারা সহজে কারো দ্বারা প্রভাবিত হবে না। আমি মনে করি, আতঙ্ক নয় গণসচেতনতা প্রয়োজন। আমার স্বর্ণার মতো হাজারো স্বর্ণা যেন বেঁচে থাকে, আমি সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

[হলিক্রস স্কুলের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী অপূর্বা বর্দন স্বর্ণা-র আত্মহত্যার খবর সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয় ৫ অক্টোবর ২০১৭। তার পরিবারের ধারণা ইন্টারনেট ও অনলাইন গেম আসক্তির শিকার হয়েই সে এই পথ বেছে নিয়েছে]

আমার মাকে নিয়ে। তার বয়স ৫৭। তিনি ফেসবুকে আসক্ত। তার সাথে তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কয়েকজন বন্ধুও আসক্ত। তারা ফেসবুকে ছবি দেয়া, লাইক, কमेंটে মেতে থাকেন।

আমার মায়ের দুটো স্মার্টফোন। একটি নিজের, আরেকটি অফিসের। একটির চার্জ ফুরালে আরেকটি ধরেন। এভাবেই চলছে। এসব নিয়ে সময় নষ্ট তো করছেনই, সাথে আছে কোন ছবি ফেসবুকে দেবেন সেটা ঠিক করা ও এডিট করা। এজন্যে বেড়ে গেছে তার ছবি তোলার নেশা।

মা দিনশেষে বাড়ি ফিরে ফোনে লম্বা সময় কাটান। ফলে তার সাথে আমার কথাও হয় না। পাশে বসে আমি কথা বললেও তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন না। তিনি যে আসক্ত এটা তিনি বোঝেন না, স্বীকারও করেন না।

ঘটনা ৫

আমার একজন বন্ধু খুব প্রতিভাবান। কিন্তু ক্লাসের পড়াশোনায় তার অবস্থান পেছনের দিকে এবং এর প্রধান কারণ ইন্টারনেট আসক্তি।

সে প্রজেক্টের কাজ ও জটিল পড়া বোঝার জন্যে প্রতিনিয়ত ইউটিউবের সাহায্য নেয়। কিন্তু কাজের টিউটোরিয়াল দেখার চেয়ে, অকাজের ভিডিও দেখা হয়ে যায় বেশি। রিকমেন্ডেড ভিডিও দেখতে দেখতে কখন যে সময় শেষ হয়ে যায়, সে টেরই পায় না।

সেইসাথে ফেসবুকে পুরো সময় লগ ইন থাকে। এভাবে পাঁচ মিনিট-এর বিরতি কখনোই এক-দুই ঘন্টার আগে শেষ হয় না।

ঘটনা ৬

ছেলেটি মাত্র সাত বছর বয়সে মা-বাবার সাথে আমেরিকায় পাড়ি জমায়। সে ভালোভাবেই হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন শেষ করে। গণিত প্রতিযোগিতা ম্যাথ ম্যানিয়া-তে সে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত হয়।

ইলেভেন গ্রেডে পড়ার সময় সে ঝুঁকে পড়ে ভিডিও গেমের দিকে। টুয়েলভ গ্রেড শেষ করে সে কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি নিতে ছয়-সাত মাস ঘরে বসে ছিল। এ সময় অনলাইন ও ভিডিও গেমের পুরোপুরি আসক্ত হয়ে পড়ে সে। তার ওজন বেড়ে ৭০ কেজি থেকে ১২৫ কেজি হয়ে যায়। সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় এবং তার অ্যাজমা বেড়ে যায়। এমনকি মাথার সব চুলও পড়ে যায়।

এ শারীরিক অবস্থার জন্যে সহপাঠীরা তাকে উত্থাপিত করত এবং ঘটনা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। এরপর সে কলেজ ছেড়ে দিল। বর্তমানে তার ওজন ১৮০ কেজি। সে রাতদিন কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চার-পাঁচ জন মিলে গ্রুপ করে অনলাইন গেমের অংশ নেয়। সে কারো সাথে মেশে না, তার রয়েছে ভার্সুয়াল ফ্রেন্ডস।

ওদের পৌষমাস আমাদের সর্বনাশ

ন'মাসের শিশু স্মার্টফোনের স্ক্রিন জ্বল করা শিখে গেছে। ইউটিউবে ভিডিও না দেখে সে খেতেই চায় না। এ নিয়ে মা-বাবা অজ্ঞানে আটখানা। 'শিশু আইনস্টাইনের' কর্মকাণ্ড শুনে অন্য অভিভাবকরাও তৎপর হয়ে ওঠেন নিজেদের সন্তানদের 'স্মার্ট' বানাতে। মজার বিষয় হলো, এদের অধিকাংশ ঘুণাঙ্করেও জানতে পারেন না যে, স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও ইউটিউব-জাতীয় কোম্পানির শীর্ষ নির্বাহীরা প্রযুক্তিপণ্য-ইন্টারনেট থেকে তাদের সন্তানদের শত হাত দূরে রাখেন।



প্রযুক্তি-মাফিয়াদের কুশলী প্যারেন্টিং

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনকুবের বিল গেটসের কথাই ধরা যাক। তার প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট সারা পৃথিবীর কম্পিউটার জগৎ দোঁদগু প্রতাপে শাসন করছে। অথচ তার সন্তানরা দিনে সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিটের বেশি কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ পায় না। কেবল তা-ই নয়, গেটস সন্তানদের বয়স ১৪ হবার আগে স্মার্টফোন তো দূরের কথা, মোবাইল ফোনই কিনে দেন নি।

আছে গল্প বাকি আরো। আইফোন ও আইপ্যাডের নতুন মডেল বাজারে আসার আগেই অনলাইনে লাখ লাখ পিস আগাম বিক্রি হয়ে যায়। নিজের কিডনি বেচে এক তরুণ আইপ্যাড কিনেছে এমন নজিরও আছে। যে গ্যাজেট নিয়ে এত মাতামাতি, তার নির্মাতা অ্যাপলের কর্তৃপক্ষ স্টিভ জবস কখনো তার সন্তানদের আইপ্যাড ব্যবহার করতে দেন নি।

ফেসবুকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ পালিহাপিতিয়া সাত বছর ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর গুরুদায়িত্বে থাকলেও নিজে ফেসবুক ব্যবহার করেন না। তিনি এ-ও বলেছেন, "My kids are not allowed to use that shit." ফেসবুক পোস্ট/ ছবিতে 'লাইক' পাওয়ার জন্যে মানুষ কত উদ্ভট কাণ্ডই না করে। এই লাইকের উদ্ভাবক জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজের ফোন থেকে সযত্নে লাইক বাটনটি সরিয়ে দিয়েছেন।

শুধু তা-ই নয়। ফেসবুক-টুইটারের শীর্ষ নির্বাহীরা কেউই আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো এই অ্যাপগুলো ব্যবহার করেন না। কালেভদ্রে স্ট্যাটাস দেন বা টুইট করেন। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ তো আরো এক ডিগ্রি বাড়। তার ফেসবুক একাউন্ট দেখভালের দায়িত্বে আছে ১২ জন সহকারী। অর্থাৎ সিলিকন ভ্যালির হর্তাকর্তারা ও তাদের সন্তানরা প্রযুক্তিপণ্য-সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপস থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন।

তাহলে তারা কি এমন কিছু জানেন যা আমজনতা জানে না?

মগজ আপনার, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের লাগাম তাদের হাতে

ঠিক তা-ই। এসব প্রযুক্তি-মাফিয়ারা খুব ভালো করেই জানেন, স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তিকর। মাদকের চেয়েও ভয়ংকর সে আসক্তি। গুলেলর সাবেক কর্মী ব্রিস্টান হ্যারিস এক সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রচলিত ধারণা হলো-প্রযুক্তি নিরপেক্ষ; এর প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে প্রভাব ভালো না মন্দ হবে। এই ধারণা মোটেও সত্যি না। টেক কোম্পানিগুলো তাদের বাতলে দেয়া উপায়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্যে মানুষকে প্রভাবিত করে। যাতে তারা দীর্ঘক্ষণ স্মার্টফোন/ অ্যাপে সময় কাটায়। সেই সুযোগে কোম্পানিগুলো অচেনা পয়সা কামাতে পারে।

মানুষকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেশাগ্রস্তের মতো বুঁদ করে রাখার চক্রান্তকে বলা হচ্ছে 'ব্রেইন হ্যাকিং'। খুলির ভেতরে মগজ আপনার হলে হবে কী, নিয়ন্ত্রণের লাগাম চলে গেছে টেক কোম্পানিগুলোর হাতে। মানুষের মানসিক সুস্থতা ও সামাজিক জীবন তখনই হয়ে যেতে পারে তা জানা সত্ত্বেও টেক এক্সিকিউটিভরা পিছপা হন নি। নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা বরং এসব আসক্তিকর প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষকে আরো উৎসাহিত করেছেন। এ স্বীকারোক্তি দিয়েছেন স্বয়ং ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট শন পার্কার।

প্রযুক্তি-মাফিয়ার সন্তানরা পড়ে স্মার্টফোন-কম্পিউটারহীন স্কুলে

শৈশবেই কম্পিউটার ও স্মার্টফোন জাতীয় যন্ত্র ব্যবহারে শিশু অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার সৃজনশীলতা, মনোযোগের সময়সীমা ও অপরের সাথে ভাব আদান-প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। পেশাগত কাজের সুবাদে গুলগ অ্যাপল ইয়াহু-র

এক্সিকিউটিভরা এটা সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন। তাদের কয়েকজন স্বীকার করেছেন, তেল ও জলের মতো লেখাপড়া ও কম্পিউটারও মিশ খায় না। তাই সন্তানদের তারা এমন স্কুলে পাঠান যেখানে কম্পিউটার স্মার্টফোন ট্যাব এগুলোর ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ।

টেক এক্সিকিউটিভদের দ্বিমুখী এ আচরণ সম্পর্কে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যাডাম অ্যান্টার বলেন, এসব টেক কোম্পানির কর্মকর্তারা জনসমক্ষে ঢাকঢোল পিটিয়ে তাদের পণ্যের গুণকীর্তন করেন। অন্যদিকে তাদের সন্তানদের পাঠান এমন স্কুলে যেখানে এসব প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহারের সুযোগই নেই।

আসক্তির চূড়ান্ত ৷ ক্লাসরুমে এসএমএস চালাচালি

২০১৫ সালে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিশ্বব্যাপী একটি গবেষণা পরিচালনা করে। তাতে দেখা গেছে, ক্লাসরুমে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট আগের চেয়ে ভালো হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং শিক্ষার মান যেসব দেশে উন্নত (বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো) তারা ক্লাসরুমে প্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক।

এত সতর্কতা অবলম্বনের উপযুক্ত কারণও আছে বটে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশে শিক্ষা-সংশ্লিষ্টরা একটি সমস্যা নিয়ে বেশ চিন্তিত। তা হলো-ক্লাসরুমে বসেও ছাত্রছাত্রীরা মোবাইল ফোনে মেসেজ চালাচালি করছে। টিফিনের বিরতিতে খেলাধুলার প্রতি তাদের আগ্রহ নেই। আসক্তের মতোই তারা ডুবে থাকছে ভার্চুয়াল জগতে। এ সমস্যার বিহিত করতে না পেরে ফ্রান্সের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৮ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে স্কুলে মোবাইল ফোন আনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

টেক এক্সিকিউটিভদের সন্তানরা অবসরে যা করে

কোটি কোটি শিশু-কিশোর-তরুণের মস্তিষ্কের বারোটা বাজালেও এসব প্রযুক্তির উদ্ভাবকরা ঠিকই আগলে রাখেন নিজ সন্তানদের। স্টিভ জবস প্রতিদিন সন্ধ্যায় সন্তানদের নিয়ে একসাথে খেতে বসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের বই ও ইতিহাস সম্পর্কে তাদের সাথে আলোচনা করতেন। ইউটিউবের সিইও সুসান ওজকিকি সন্তানদের খেলাধুলা ও বই পড়ায় উৎসাহিত করেন। টুইটারের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইও ইভান উইলিয়ামসের দুই শিশুপুত্র আইপ্যাডের জন্যে বহু আবদার করলেও তিনি সোজা নাকচ করে দেন। আইপ্যাডের বদলে ওদের তিনি কিনে দিয়েছেন কয়েকশ বই।

দাসত্বের শেকল অথবা মুক্তির পথ ৷ কোনটা বেছে নেবেন?

অলক্ষ্যে বসে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ শত শত কোটি মানুষের প্রতিদিনের চিন্তাভাবনা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ছক সাজাচ্ছে। মানবসভ্যতা কখনোই এমন ভয়াবহ যড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয় নি। প্রিয় পাঠক, সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব এখন আপনার। ভার্চুয়াল জগতের দাস হয়ে হতাশ বিষণ্ণ পরিবার-বিচ্ছিন্ন জীবন কাটাবেন নাকি আপনার মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তির ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে লাভ করবেন-সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন?

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, ২৩ জানুয়ারি ও ২৬ জানুয়ারি ২০১৮
দ্য টাইমস, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮; বিবিসি, ১২ ডিসেম্বর ২০১৭

যুক্তরাষ্ট্রের শিশু বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস। ২০১৬ সালে তারা শিশুদের সুরক্ষায় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়েছে, সব বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার সীমিত করা উচিত। কারণ শিশুরাই এসব স্ক্রিনের সবচেয়ে বড় শিকার।

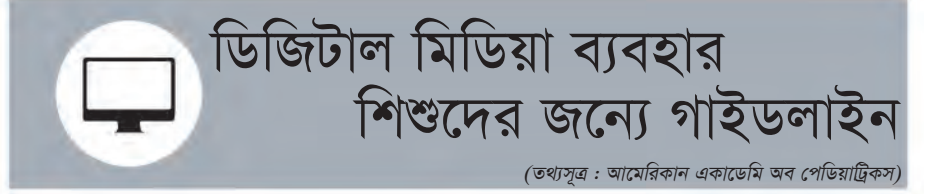
শিশুর বয়স ১৮ মাস বা এর কম হলে—

সব ধরনের ডিজিটাল মিডিয়া থেকেই তাকে দূরে রাখতে হবে। শিশুর মস্তিষ্কের সূচ্য বিকাশ ও মা-বাবার সাথে মমতাপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত করতে হলে ‘স্ক্রিন টাইম’ নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। মা ও পরিবারের অন্যদের সাথে যত সরাসরি ও মুখোমুখি ভাব-বিনিময় ঘটবে, শিশুর মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশে তা তত বেশি উপকারী হবে।

ফোন-টিভি-কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে সরাসরি না তাকালেও শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কীভাবে? সন্তানকে খাওয়ানোর সময় মা নিজে হয়তো টিভি দেখছেন। তখন টিভির শব্দ ও আলো শিশুর স্নায়ুকে উত্তেজিত করতে পারে, যা শিশুর ঘুম ও মনোযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হলো, ফোন-টিভি-কম্পিউটার মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে। মা-বাবা সন্তানকে সময় না দিয়ে টিভি/ফোনের প্রতি বেশি মনোযোগী হলে তাদের ক্রমাগত অবহেলা সন্তানের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

ফলে ভবিষ্যতে সেই শিশুর আচরণে মানসিক অসুস্থতার নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এ নীতিমালার মূল প্রণেতা ড. ইয়োলাভা রিড তাই



বয়স ১৮ মাস বা এর কম	বয়স দেড় থেকে দু'বছর	বয়স তিন থেকে পাঁচ বছর	ছয় বছরের বেশি
কোনো প্রকার স্ক্রিন নয়	শুধু শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম। দেখার সময় অবশ্যই তার সাথে থাকুন।	দিনে সর্বোচ্চ একঘণ্টা। দেখার সময় মা-বাবা সাথে থাকুন।	ব্যবহার সীমিত করুন। স্ক্রিন যেন ঘুম ও খেলাধুলাকে ব্যাহত না করে।

বলেন, টিভিকে বেবি-সিটার বানাবেন না। সন্তানের সাথে গল্প করুন অথবা তাকে বই পড়ে শোনান।

শিশুর বয়স দুই থেকে পাঁচ বছর হলে—

এই বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে টিভি/কম্পিউটার ব্যবহার দিনে মাত্র একঘণ্টার জন্যে সীমিত করুন। আপনিও তার সাথে বসে দেখুন। তবে কী ধরনের অনুষ্ঠান তাকে দেখাচ্ছেন সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হোন।

কারণ বিজ্ঞাপন বা অ্যানিমেশন বোঝার মতো মানসিক সক্ষমতা দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সী

শিশুদের নেই। বড় শিশুরা পারলেও এই বয়সী শিশুরা কার্টুনের কাল্পনিক জগৎ ও বাস্তব জগতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

শিশুর বয়স ছয় বছরের বেশি হলে—

আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস স্বীকার করে নিয়েছে যে, শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশে ডিজিটাল মিডিয়া কখনোই খেলাধুলা, পরিবারের সদস্যদের সাথে মেলামেশার বিকল্প হতে পারে না।



**প্রযুক্তিদক্ষ হোন
ভার্চুয়াল ভাইরাস
থেকে বাঁচুন!**

সন্তানের বন্ধু হোন, তাকে পরিবারের অংশ করে নিন

সন্তানকে বকাঝকা নয়, উদ্বুদ্ধ করুন। তাকে ঘরের কাজে সম্পৃক্ত করুন। সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করুন। আসক্ত হওয়ার মতো অবসর সময় যেন সন্তানের না থাকে। ভাইবোনের সাথে শেয়ার করতে শেখান তাকে। আপনিই হোন তার প্রথম ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।

আপনার সন্তানের রোল মডেল আপনিই

কথা নয়, সন্তান অনুসরণ করে আপনার আচরণ। আপনি ভার্চুয়াল ভাইরাসে আসক্ত হলে সন্তানকে এ থেকে বিরত রাখা কষ্টকর হবে। তাই আগে নিজে ফেসবুক বর্জন করুন, সন্তানকেও এ থেকে দূরে রাখুন।

১৮'র আগে স্মার্টফোন নয়

সন্তানের আবদার মেটাতে বা স্ট্যাটাস বজায় রাখতে গিয়ে ১৮ বছর হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন কিনে দেবেন না। ঘরে শিশুরা থাকলে স্মার্ট টিভিকে না বলুন। কারণ কৌতূহলের বশে সে সহজেই ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

রাত জাগার অভ্যাস ত্যাগ করুন

প্রয়োজন ছাড়া রাত্রি জাগরণ ভার্চুয়াল ভাইরাসে আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। এ থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাত ১১টার পর মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার-জাতীয় সকল গ্যাজেট বন্ধ রাখুন। সন্তান সারাক্ষণই রুমের দরজা বন্ধ করে রাখছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

পরিবারে নৈতিকতা ও ধর্মের শাস্ত্র শিক্ষা মেনে চলুন

নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী অনুধাবনে ও অনুশীলনে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন। নিজেও অনুশীলন করুন।

মেডিটেশনকে পারিবারিক রেওয়াজে পরিণত করুন

যেসব সঙ্গ আসক্তির কানাগলিতে ঠেলে দেয়, তাদের পরিত্যাগ করুন। পরিবারের সবাই মিলে প্রতি বৃহস্পতিবার পারিবারিক মেডিটেশন করুন। সপরিবারে ফাউন্ডেশনের সাদাকায়ন, আলোকায়ন ও আলোকিত পরিবার কার্যক্রমে অংশ নিন।

এগিয়ে আসুন সৃষ্টির সেবায়

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কাজ হতাশা-বিষণ্ণতা-একাকিত্বের অনুভূতি হ্রাস করে। বাড়ায় আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা। তাই সাধ্যমতো নিবেদিত হোন সৃষ্টির সেবায়, মানুষের কল্যাণে।



কোয়ান্টাম বুলেটিন

মার্চ ২০১৮

ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক আলোচনায় গুরুজী

আপনার সন্তানকে বাঁচাতে পারেন আপনিই

আপনার সন্তান আপনার ভবিষ্যৎ। আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সঠিক জীবনদৃষ্টির পথ ধরে বেড়ে উঠলে সে-ই একদিন আলোকিত করতে পারে জাতিকে। তার কর্মে-স্বপ্নে দেশকে সে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে অনন্য উচ্চতায়। কিন্তু আপনার এ সন্তানই যদি হয়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-চক্রান্তের শিকার, নিত্যানতুন প্রযুক্তিপণ্যের নিয়ন্ত্রণহীন ও অপরিণামদর্শী ব্যবহারের ফলে ক্রমশ লক্ষ্যহীন, কর্মবিমুখ, আত্মহত্যাপ্রবণ-তবে তা নিশ্চিতই হয়ে দাঁড়ায় গুরুতর দুশ্চিন্তার কারণ।

তাই অমিত সম্ভাবনাময় আমাদের সন্তানদের আজ বাঁচাতে হবে প্রযুক্তিপণ্য-আসক্তির সর্বনাশা ছোবল থেকে। আর এ উদ্যোগের সূচনা করতে হবে নিজের পরিবার থেকেই। কারণ আপনার সন্তানকে বাঁচাতে পারেন আপনিই।

সমগ্রতি কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, ফেসবুকসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল-ভিডিও-অনলাইন গেম ও স্মার্টফোন-ইন্টারনেট আসক্তি আজ

রূপ নিয়েছে ক্রমবর্ধমান এক বৈশ্বিক মহামারীতে। এ সর্বশাসী মড়ক আজ একদিকে যেমন হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে ব্যক্তিমানুষের মনোদৈহিক সুস্থতা, তেমনি দিন দিন বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক স্বস্তি।

পৃথিবীজুড়ে প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণাগারে পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রতিবেদন মতে, এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবনই করা হয়েছে এমনভাবে-যাতে যে-কোনো বয়সী মানুষ, বিশেষত শিশু-কিশোর-তরুণরা সহজেই এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। জীবনের লক্ষ্য ভুলে যাতে নিশ্চিত মেতে থাকে অর্থহীন স্থূল বিনোদনে। এসব কথা স্বীকার করেছেন খোদ এসব প্রযুক্তি-উদ্ভাবকরাই।

কিন্তু হলে কী হবে? কখনো আধুনিকতার নামে, কখনো-বা নিছক স্ট্যাটাস বজায় রাখতে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বাড়ছেই। সচেতনতার অভাবে অভিভাবকরাই এসব আসক্তিকর উপাদান তুলে দিচ্ছেন সন্তানের হাতে। এভাবেই প্রয়োজনের মাত্রা ছাপিয়ে বাড়ছে প্রযুক্তিপণ্যের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার।

আর এই অপব্যবহারের পরিণতি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি খোলা

চোখেই। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা মেলে তুচ্ছ সব কারণে সহিংসতা, নারী-শিশু নির্যাতন, পারিবারিক অশান্তি আর সামাজিক অস্থিরতার মর্মঘাতী বিবরণ। সেইসাথে এসব প্রযুক্তিপণ্যে আসক্ত কিশোর-তরুণদের একটি অংশ ইতোমধ্যেই হয়ে পড়েছে বিষণ্ণতা-অবসাদের আক্রমণে লক্ষ্যহীন, নিক্রিয় ও দিগভ্রান্ত। আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতা আজ ক্রমান্বয়ে আক্রান্ত করে চলেছে গোটা পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ ও পরিবারকে। সবমিলিয়ে বলা যায়, মানবসভ্যতা অতীতে কখনোই এমন বিপন্ন হয়ে ওঠে নি।

তাই জীবনক্ষয়ী এ ভার্চুয়াল ভাইরাসের পরিণাম ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে এখন সর্বাত্মক প্রয়োজন আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সচেতনতা। প্রথমত, নিজে এ আসক্তি থেকে মুক্ত থাকুন। দ্বিতীয়ত, সন্তানকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিটি পরিবারে গড়ে তুলুন সংহত প্রতিরোধ।

অবশ্য আশার কথা, সমাজের মানুষ এ ব্যাপারে দিন দিন সতর্ক হয়ে উঠছেন। এর পাশাপাশি তারা সচেতন করে তুলছেন চারপাশের মানুষকেও। আর এক্ষেত্রে গুরু থেকেই অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন

করে আসছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। ২০০৯ সাল থেকেই ফেসবুকসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তির ব্যাপারে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করছে কোয়ান্টাম।

এরই ধারাবাহিকতায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা এ বছরের শুরু থেকেই সজ্জবদ্ধভাবে কাজ করছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিস, পার্ক-শপিং সেন্টারসহ জনবহুল স্থানে তারা বিতরণ করছেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সম্বলিত বিশেষ স্টিকার, ফোল্ডার ও বুলেটিন। পরিচিতদের মাঝে শেয়ার করছেন সচেতনতামূলক ভিডিও ক্লিপ ও ডকুমেন্টারি, যা ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।

কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে-নতুন সহস্রাব্দে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো মেধা, যোগ্যতা ও কর্মস্পৃহা সবই রয়েছে আমাদের। প্রয়োজন শুধু প্রচলিত স্রোতে হারিয়ে না গিয়ে লক্ষ্যে অবিচল থাকা। আর এজন্যে চাই সব ধরনের আসক্তিমুক্ত ও ইতিবাচক সমমর্মী তরুণ প্রজন্ম। তাই আপনিও সচেতন হোন ভার্চুয়াল ভাইরাসের আশ্রাসন থেকে। বাঁচুক আমাদের সন্তান, আমাদের পরিবার। বাঁচুক প্রিয় মাতৃভূমি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৪৪৩ ব্যাচ ৥ উত্তরা

৩০, ৩১ মার্চ, ১ ও ২ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার
উত্তরা, ঢাকা

৪৪৪ ব্যাচ ৥ কুষ্টিয়া

৬, ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : দিশা টাওয়ার
উপজেলা মোড়, কুষ্টিয়া

৪৪৫ ব্যাচ ৥ ঢাকা

১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

৪৪৬ ব্যাচ ৥ সিলেট

২০, ২১, ২২ ও ২৩ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : আমানউল্লাহ কনভেনশন সেন্টার
আরামবাগ, সিলেট

উপদেশ নয়, শিশু চায় দৃষ্টান্ত

আবুল মোমেন

বিশিষ্ট কবি, লেখক ও কলামিস্ট আবুল মোমেন।
১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে
আমন্ত্রিত হন তিনি। তার বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ
এখানে তুলে ধরা হলো।

আমাদের দেশে শিশুরা আজ সবচেয়ে বঞ্চিত। সেটা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। বঞ্চিত এই অর্থে যে, আমরা ধরেই নিয়েছি ভালো জামা-কাপড়, ভালো খাবার এগুলোই হচ্ছে শিশুর চাহিদা। এর বাইরে আমরা বেশি কিছু ভাবি না।

কিন্তু বাইরে হয়তো রোদ উঠেছে, শিশুর ইচ্ছে করবে মাঠে গিয়ে দৌড়াতে, গাছে উঠতে। তার লাফ দিতে ইচ্ছা হয়, পুকুরে সাঁতার কাটার ইচ্ছা হয়। শৈশবে এমন ক্ষুধার কোনো শেষ নেই। তার যেমন আছে চিৎপিঁ মাছ খাওয়ার ক্ষুধা, তেমনি রয়েছে মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা। বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করার ইচ্ছা তার আরো বেশি। কিন্তু সেগুলো অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে।

আমরা সাধারণভাবে যে ধরনের ঘরবাড়িতে থাকছি, এই ফ্ল্যাটবাড়িগুলো হচ্ছে খাঁচার মতো। দরজাটা লাগিয়ে দিলে পুরো দুনিয়া থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এটা শিশুর মনে বন্দিভূতের বিরাট একটা চাপ সৃষ্টি করে।

আমি সৌভাগ্যবান যে, প্রাক-প্রাথমিক থেকে এমএ ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছি। একবার ক্লাস ফোরের বাচ্চাদের সাথে আমরা একটা মুক্ত আলোচনা করলাম যে, মানুষ আসলে ইনডোর প্রাণী না আউটডোর প্রাণী। সেখানে অনেক তর্ক-বিতর্ক করল শিশুরা। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, মানুষ আসলে আউটডোর প্রাণী। ভুল করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা অনেক আগে বলেছিলেন যে, শিশুকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। এমনভাবে ছাড়া উচিত যাতে তার গায়ে ধুলোবালি লাগে, বৃষ্টি জলে সে যেন একটু ভেজে।

শিশু আলাদা থাকতে চায় না। সে চায় মানুষের সংস্পর্শ। আপনি যদি তাকে সবার থেকে আলাদা করে রাখেন যে সাফ-সুতরা থাকবে, পরিষ্কার থাকবে তাহলে শিশুর যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, এটা থেকে সে বঞ্চিত থাকবে। বন্ধুদের সাথে সে গলাগলি করবে, বুলাবুলি করবে, ধাক্কাধাক্কি করবে, ফুটবল খেলবে। এ স্বাধীনতাদিই তাকে দিতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুর তিন ধরনের বিকাশ প্রয়োজন হয়। একটা হচ্ছে শারীরিক, একটা মানসিক, আরেকটা হচ্ছে আবেগিক বিকাশ। শরীরেরটা আমরা দেখতে পাই যে খাওয়াদাওয়া করছে, আকারেও বাড়ছে। আবার শিশুকে মানসিকভাবে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মনে করেছি যে, লেখাপড়া করলেই সব হয়ে যাবে। ফলে এখন আরেকটি জিনিসের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। তা হলো, অনেক অনেক পরীক্ষা। এখন আর কেউ শিক্ষার্থী নেই, সকলেই পরীক্ষার্থী। আমি মনে করি, এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খুব ক্ষতি হচ্ছে।

কারণ প্রাথমিক থেকে অষ্টম-নবম শ্রেণি পর্যন্ত জীবনটা হচ্ছে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার সময়। সে চতুর্দিক থেকে সংগ্রহ করবে। তার কাছে তো আমি তখন ফল চাইতে পারি না।

অথচ এখন অভিভাবকরা ক্লাস ওয়ান থেকেই সন্তানকে জিপিএ ফাইভের জন্যে তৈরি করছেন। এর ফলটা দাঁড়িয়েছে স্কুলের চেয়ে কোচিং সেন্টারের মূল্য বেড়ে গেছে। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে এখন দাম বেশি গাইড বইয়ের। শিক্ষকের চেয়ে হাউজ টিউটরের দাম বেশি। শিক্ষার চেয়ে বেশি দাম পরীক্ষার। উল্টো যাত্রা হয়ে গেল সব।

আপনি যখন জীবনে প্রবেশ করবেন, তখন কি কেউ জানতে চাইবে-আপনি গণিতে কত নম্বর পেয়েছেন? ইংরেজিতে কত নম্বর পেয়েছেন? এটা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। জীবনের আসল চাহিদা হচ্ছে আপনার বিবেচনা বোধ কেমন-আপনি কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? আপনার মাঝে বিচক্ষণতা, সেবাপরায়ণতা, মানবিকতা,

বন্ধুপ্রীতি আছে কিনা। জীবনে চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন কিনা। আপনি কঠিন সময়ে ভেঙে পড়েন, নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন?

জীবন আপনাকে এসব চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে আর স্কুল বলছে, শুধু পরীক্ষায় পাশ করো। লেখাপড়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর সাথে সাথে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো আরো গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের নিয়ে কাজের ৪১ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি-সরাসরি উপদেশ দিলে শিশু কখনো কিছু শেখে না। শিশু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ, শিশু চায় দৃষ্টান্ত। সে কোনোকিছু সরাসরি শিখে না। সবকিছু দেখে দেখে শেখে। সে খুব ভালো অনুকরণ করতে পারে। শিশু যে-রকম বড়দের জুতা পরে, শাড়ি পরে, স্বভাবটাও সে বড়দের কাছ থেকে আয়ত্ত করে।

মা-বাবা ঝগড়া করবেন আর আশা করবেন সন্তান শান্তশিষ্ট হবে, খুব যৌক্তিক আচরণ করবে, এটা হবে না। এমন দৃষ্টান্ত দিতে হবে তার সামনে, যেন সে বুঝতে পারে কোনটা সত্য, কোনটা বেশি গ্রহণযোগ্য।

এখন মুশকিল হয়েছে, সন্তানদের দেয়ার মতো সময় আমাদের নেই। ইংরেজিতে আমরা বলি 'কোয়ালিটি টাইম'। আপনি যখন ক্লাস্তশান্ত হয়ে ঘরে ফিরছেন, তখন সে কিছু একটা বললে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। বলছেন, চুপ করো। সন্তান কাছে এলেই তাকে থামিয়ে দিচ্ছেন, তার সাথে বসটা মূলতবি করছেন। আমি শুধু অভিভাবকদের বলব-শিশুর জন্যে আপনার সময়টা বাড়ান। ওদের পাঁচ রকম পাখি দেখান, গাছ দেখান, ফুল চেনান। এটিই শিক্ষা।

একবার পড়ালেখা শিখলে বই সে একাই পড়তে পারবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বয়স উপযোগী অন্যান্য শিক্ষাটা ওর হচ্ছে কিনা। তাকে লার্নিং অব লাইফ দিতে হবে। এ শিক্ষা আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ দেয় না, তাই এ কাজ করতে হবে বাবা-মা-অভিভাবকদেরকেই।

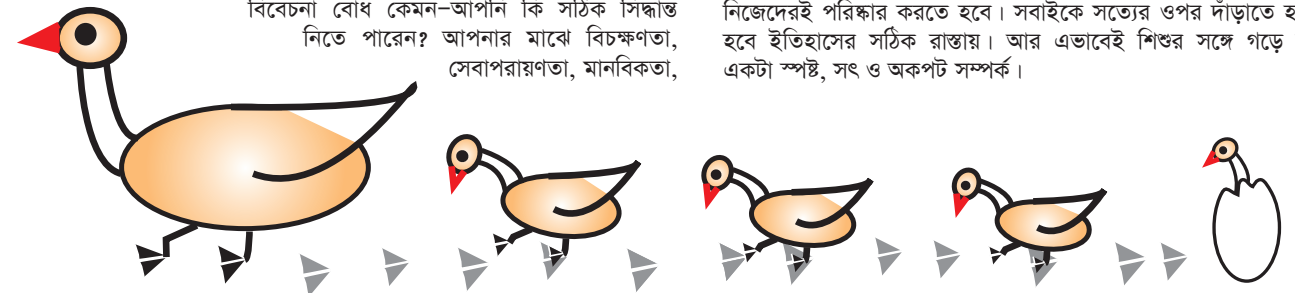
আপনিও যদি জিপিএ ফাইভের ফাঁদে পড়ে যান, তাহলে আপনার সন্তান সামগ্রিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত হবে। তার হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেধার বিকাশ হলো, অক্সে-ইংরেজিতে সে দুর্দান্ত নম্বর পেলে কিন্তু তার মানবিক বোধগুলো বিকশিত হবে না। তখনই দেখা যায়, সে নানারকম ভুলভ্রান্তি করে। কারণ তার মূল্যবোধের জায়গাটা তো ফাঁকা!

আমি অনেকদিন থেকে এ কথাটাই বলছি-একটা প্রজন্ম তৈরি হয়েছে যারা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে পারে না। সত্য যদি ১০০ হয়, মিথ্যা তো শূন্য। অথচ সে ভাবে, মিথ্যা ৮০। মিথ্যা দিয়েও সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। এ বিষয়টাই সবচেয়ে ভয়ংকর। এভাবে সমাজ বেশি দূর যেতে পারবে না।

সমাজের এই যে সংকট, এটা কিন্তু ছোট ছোট জায়গা থেকেই মেরামত হতে হবে। অর্থাৎ আপনি আপনার পরিবারের মধ্যে যদি সত্য আর মূল্যবোধের চর্চাটা শুরু করেন, তাহলে সেটা একসময় চারপাশকে প্রভাবিত করবে।

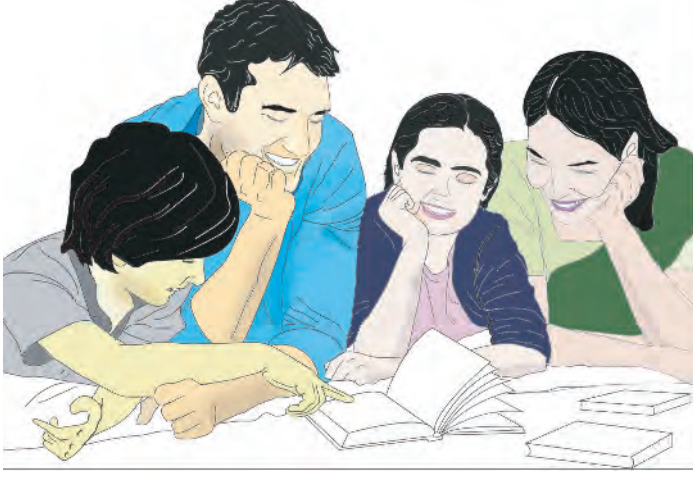
আমি হতাশ হই না। কারণ সত্যতা, কল্যাণ বা যা-কিছু ভালো, সেটার জোর এত বেশি যে, কোনো ব্যাধি বা অকল্যাণ এর সামনে টিকতে পারবে না। তবে এর জন্যে ভালো বিষয়গুলো নিয়মিত চর্চার মধ্যে আনতে হবে। একবার যদি এটা চর্চার আওতায় আনা যায় যে, বাড়িতে আমরা কিছুতেই কপটতা করব না, তাহলে শিশু সেভাবেই বেড়ে উঠবে। চারপাশে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল আমাদের নিজেদেরই পরিষ্কার করতে হবে। সবাইকে সত্যের ওপর দাঁড়াতে হবে, দাঁড়াতে হবে ইতিহাসের সঠিক রাস্তায়। আর এভাবেই শিশুর সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে একটা স্পষ্ট, সৎ ও অকপট সম্পর্ক।

অনুলিখিত



একত্র মনোযোগ ও সূতীক্ষ্ম স্মৃতিশক্তির জন্যে—

সন্তানকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন



জানাচ্ছেন, যখন কেউ বই পড়ে, তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষম একটি যোগাযোগ গড়ে ওঠে, যা তার স্মৃতিশক্তিকে সূতীক্ষ্ম করে। আমেরিকান একাডেমি অব নিউরোলজি-র জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বই পড়ার সময় মস্তিষ্ক অন্যদের তুলনায় বার্ষিক অধিকতর সজীব ও সচল থাকে।

পড়ার অভ্যাস কেবল স্মৃতিশক্তিকেই প্রভাবিত করে না। এমোরি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, জীবনঘনিষ্ঠ গল্পগাথা পড়লে নিউরোনের

সংযোগায়ন বাড়ে। সেইসাথে বাড়ে সমমর্মিতাবোধ ও আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, যা মানসিক চাপ কমায়। এর ফলে একজন মানুষ দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য লাভ করেন।

সন্তান হবে মনোযোগী শিক্ষার্থী

সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তিপণ্যের অনাকাঙ্ক্ষিত দৌরাণ্যে মানুষের মনোযোগ-সময়সীমা অতীতের তুলনায় মারাত্মকভাবে কমছে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে কোমলমতি শিশুরা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো অধ্যাপক সুসান গ্রিনফিল্ড এই সমস্যার দাওয়াই হিসেবে

শৈশবে গোপাল ভাঁড়, নাসিরুদ্দীন হোজ্জার গল্প কিংবা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি পড়েন নি এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আজকালকার শিশুরা অবশ্য এসব পড়ে না। টিভি বা ইউটিউবে চিরায়ত গল্পের অ্যানিমেশন ভার্সন দেখে তারা। কিন্তু বই পড়ার চেয়ে এটা ভালো হচ্ছে কি?

নিউরোসায়েন্টিস্টরা বলছেন, একদমই না। ব্যায়াম করলে মাংসপেশী যেমন সুদৃঢ় হয়, মস্তিষ্কেরও তেমনি ব্যায়াম প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিডিং এন্ড ল্যান্ডস্কেপ-এর পরিচালক মারিয়ান উলফ বলছেন, বই পড়ার সময় পাঠক নিজের মতো করে একটা দৃশ্যকল্প তৈরি করে নেন। প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে চিন্তাও করতে পারেন। ফলে পঠিত অংশের অন্তর্নিহিত অর্থটা বোঝা তার জন্যে সহজ হয়। অন্যদিকে পর্দায় কিছু দেখা বা শোনার সময় তিনি কিন্তু ‘পজ বাটন’ চেপে চিন্তা করেন না।

এ প্রসঙ্গে আলোকিত মানুষ চাই আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন, ‘আলোকিত বা শ্রেয়োবোধসম্পন্ন মানুষ যে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের ভেতর থেকে গড়ে উঠবে সে আশা খুবই ভুল। ইলেকট্রনিক মিডিয়া খুব ক্ষিপ্র এবং দ্রুতগামী। কোনো জিনিসকে আত্মস্থ করতে যে সময়ের দরকার হয়—এ মাধ্যম আমাদের হৃদয়কে সে সময় দেয় না। ধাবমান, দ্রুতগামী হরিণের মতো তা আমাদের চোখের সামনে থেকে চকিতে হারিয়ে যায়। আমাদের ভাবার, বোঝার, উপলব্ধি করার এবং সমৃদ্ধ হওয়ার সময় এই মাধ্যম আমাদের দেয় না।

ওটা সবচেয়ে ভালো পারে কেবল একটিমাত্র মাধ্যম: ‘বই’। বইকে আমরা পড়ি থেমে থেমে, বুঝে বুঝে, রসিয়ে রসিয়ে, উপলব্ধি করে করে। এর বোধগুলোকে আমাদের স্মৃতির তাকে সাজিয়ে রেখে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আমরা অবহিত মানুষ হই; কিন্তু বইয়ের মধ্য দিয়ে হই গভীর মানুষ।’ (বই ও আকাশ-সংস্কৃতি)

স্মৃতিশক্তিকে সূতীক্ষ্ম করে বই

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসকিনস ল্যাবরেটরির গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. কেনেথ হিউ

মা-বাবাকে পরামর্শ দিয়েছেন, সন্তানকে বেশি বেশি গল্পের বই পড়তে উৎসাহ দিন।

তার মতে, প্রতিটি গল্পের একটি শুরু, ধারাবাহিকতা ও শেষ থাকে, যা মস্তিষ্কে একটি সিকোয়েন্স অনুসরণ করতে উৎসাহ জোগায়। শিশুকে ঘটনার তাৎপর্য ও কার্যকারণের সাথে পরিণতির সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে। এবং এই দক্ষতা শৈশবেই আয়ত্ত করা মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। শিশু যত বেশি বই পড়বে, এই দক্ষতাও তার তত বৃদ্ধি পাবে।

বই দেয় আনন্দময় শৈশব ও সফল ক্যারিয়ার

বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের খ্যাতি তখন তুঙ্গে। একবার একজন ভদ্রমহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি চাই আমার সন্তান বড় হয়ে যেন সফল বিজ্ঞানী হতে পারে। তাকে কী ধরনের বই পড়ানো উচিত?’ আইনস্টাইন জবাব দিলেন, ‘সন্তানকে রূপকথা পড়ান।’

ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দা। বললেন, ‘আর কী পড়াব?’ আইনস্টাইন হেসে বললেন, ‘আরো আরো রূপকথার বই। কারণ একজন প্রকৃত বিজ্ঞানীর বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার হলো সৃজনশীল কল্পনা। রূপকথা পড়ার মধ্য দিয়ে শৈশবেই একজন মানুষ সেই গুণ অর্জন করতে পারে।’

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাও আইনস্টাইনের এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুযায়ী, যে-কোনো টিভি অনুষ্ঠানের তুলনায় শিশুতোষ বই শিশুর শব্দভাণ্ডারকে দ্বিগুণ সমৃদ্ধ করে। ফলে রিডিং টেস্ট ও বুদ্ধিমত্তা যাচাই পরীক্ষায় শিশুতোষ বই পড়ার অভ্যাস আছে এমন শিশুরা বেশি নম্বর পায়। পরবর্তী জীবনেও তারা অন্যদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকে।

তাই সন্তানকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন। বইয়ের রাজ্যে তার শৈশব হোক আনন্দময়।

তথ্যসূত্র : সাইকোলজি টুডে, ৪ জানুয়ারি ২০১৪; দ্য আটলান্টিক, ৮ জুলাই ২০১৩; টাইম, ২৭ অক্টোবর, ২০১৬

অত্যাৱশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীর আর সব সভ্যজাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়তে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য উপন্যাসের একচোখা দৈত্যের মতো ঘোঁত ঘোঁত করি। চোখ বাড়ার পছাটা কী? প্রথমত : বই পড়া এবং তার জন্য দরকার বই পড়ার প্রবৃত্তি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়া হচ্ছে বৃক্ষের মতো একটু একটু করে আকাশের কাছে যাওয়া।

সৈয়দ শামসুল হক

বই পড়ার অভ্যাস নেই আর বই পড়তে পারে না (নিরক্ষর) এমন মানুষের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই।

মার্ক টোয়েন (মার্কিন লেখক)

বই পড়তে শেখাটা হলো আগুন জ্বালানো। আর প্রত্যেকটি বর্ণ যেন একেবারে উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ।

ভিক্টর হুগো (ফরাসি সাহিত্যিক)

টেলিভিশনে কিছু দেখার সময় একজন মানুষ সেটা সরাসরি দেখে। কল্পনার কোনো সুযোগ তার নেই। কিন্তু যখন বইতে পড়ছে ‘নীল আকাশ’, সেখানে নীলও নেই, আকাশও নেই। কিছু অক্ষর ছাপা আছে। রেটিনা দিয়ে অক্ষরগুলো ব্রেনে পৌঁছাচ্ছে। ব্রেন সেটাকে বিশ্লেষণ করে কল্পনা করছে। অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড এই প্রক্রিয়া যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের ব্রেন বিকশিত হয় না। তাই বই পড়তে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, কোনো শিশু বই পড়া শিখে গেলে তাকে নিয়ে আমরা আর কোনো চিন্তা করি না।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সন্তান ও সমাজকে দেয়া একজন মানুষের সবচেয়ে বড় উপহার—শিশুদের বই পড়ে শোনানো।

কার্ল স্যাগান (মহাকাশবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্পদার্থবিদ)

একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে বই পোড়ানোর কোনো দরকার নেই।

গুধু বই পড়া থেকে মানুষকে

বিরত রাখতে পারলেই

কার্যসিদ্ধি হবে।

রে ব্র্যাডবারি (মার্কিন লেখক)



সচেতন হোন আপনিও

কর্মব্যস্ত দিনের শেষে আপনি ঘরে ফিরছেন ঠিকই, কিন্তু সত্যিই পরিবারের কাছে ফিরছেন কি? শিশুসন্তানটি আপনার সান্নিধ্য যতটা চায়, এর চেয়ে তার বেশি আশ্রয় কি আপনার স্মার্টফোন বা ল্যাপটপটির প্রতি? কিছুদিন আগেও যে দূরন্ত ছেলেটি দুপুর গড়াতেই খেলার মাঠে যাওয়ার বায়না ধরত, সে-ই কি এখন দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকে নিজের ঘরে? রাত-দিন এত যোগাযোগ, এত মানুষের ছবি দেখা-খবর নেয়া, তারপরও কি পরিবারের চেনা মানুষগুলোকেই খুব দূরের মনে হয় আজকাল?

মাত্র কয়েক বছরেই পরিবার, সমাজ, সারা পৃথিবীর দৃশ্যপটগুলো এভাবেই বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। জীবনকে আরো সহজ করবে বলে যে ইন্টারনেট আর প্রযুক্তিপণ্যকে মানবজাতি স্বাগত জানিয়েছে, তা-ই আজ এক ভয়াবহ আসক্তির নাম। চারপাশের অনেক মানুষই আজ ভার্টুয়াল ভাইরাসে আসক্ত কিংবা পরোক্ষ ভুক্তভোগী। এমনই কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো এখানে। সঙ্গত কারণেই নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হলো না।

চারপাশের জগতটা যেন তার কাছে অদৃশ্য

কর্মজীবী মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। গত বছর ১১ তম জন্মদিনে সে উপহার হিসেবে পেয়েছে একটি স্মার্টফোন। কিছুদিন না যেতেই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর স্ন্যাপচ্যাটে তার আইডি খোলা হয়ে গেল। নিজেই প্রোফাইলে বয়স বাড়িয়ে লিখল ১৬ বছর।

এখন তার অনেক ভার্টুয়াল বন্ধু। ফেসবুকে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনকে সে ব্লক করে রেখেছে, যাতে তার ছবি এবং পোস্ট কেউ দেখতে না পায়। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে পুরোটা সময় সে গাড়িতে বসে মোবাইল স্ক্রিনের দিকেই তাকিয়ে থাকে। চারপাশের জগতটা যেন তার কাছে অদৃশ্য, একমাত্র সত্য শুধু ভার্টুয়াল জগৎ। মা-বাবার ঘরে ফেরার সময় হলে সে ঠিকই চলে যায় পড়ার টেবিলে।

মা-বাবা দেখছেন, আগের চেয়ে মেয়েটা রেজাল্ট খারাপ করছে। সবকিছুতেই তার রাগ-জেদ অনেকটা বেড়েছে। সে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের সাথে আগের মতো কথাও বলে না। তার মধ্যে কৈশোরের প্রাণবন্ততাও আর দেখা যায় না। কারণ খুঁজতে গিয়ে মা-বাবা বুঝতে পারলেন, এ সবকিছুর জন্যে দায়ী তাদেরই দেয়া স্মার্টফোন।

স্মার্টফোনের কারণে বেড়েছে চোখের সমস্যা ও ঘাড়ব্যথা

সং নীতিবান একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার পর তিনি সকাল-বিকেল দুবেলা হাঁটতেন। মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। বই পড়া ছিল তার দৈনন্দিন কাজের অংশ। এর মাঝে টিভি সিরিয়ালের প্রতি কিছুটা আশ্রয় তৈরি হয়। কারণ তার স্ত্রী যখন টিভি সিরিয়াল দেখেন, তখন অন্য কিছু দেখার সুযোগ তিনি পেতেন না।

হঠাৎ করেই তার প্রবাসী পুত্র যখন একটি স্মার্টফোন বাবার জন্যে উপহার হিসেবে পাঠাল, তখন থেকে এই চিত্রগুলো হয়ে গেল অতীত। স্মার্টফোন হাতে পেয়ে একমাস কেটে গেল এটি কীভাবে চালাতে হয়, তা শিখতে গিয়ে।

পরবর্তীতে দেখা গেল, দিন-রাত ইউটিউবে নানান ধরনের ভিডিও আর টক-শো দেখছেন তিনি। সকালে হাঁটার ব্যাপারেও অনিয়মিত হয়ে গেছেন। এখন আর জীবনে রশ্টিন বলে কিছু নেই। ঘাড় গুঁজে সারাক্ষণ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতে তার চোখের সমস্যা এবং ঘাড়ের ব্যথাটাও বেশ বেড়ে গেছে।

সন্তান-সংসার কিছুই আর ভালো লাগে না

আমার বোন এবং তার স্বামী দুজনই চাকরিজীবী। তাদের দুই সন্তান, বড় ছেলের বয়স ছয় আর ছোট ছেলের বয়স আড়াই বছর। প্রতিদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরে স্বামী-স্ত্রী দুজনই যার যার স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সন্তান দুটোকে ভালোমতো সময় দেন না তারা।

আমার বোনকে আমি ভার্টুয়াল আসক্তি এবং এর কুফল সম্পর্কে জানালাম। তার প্রথম যুক্তিই হচ্ছে, ফেসবুকে তাকে অফিসের গ্রুপের এডমিন বানানো হয়েছে। কাজেই বাসায় এসেও এটার পেছনে তাকে সময় দিতে হয়। অবশ্য আমি দেখেছি, এডমিনের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি বেশি সময় ব্যয় করছেন নানা ধরনের কমেন্ট আর ভিডিও দেখে।

আশঙ্কার বিষয় হলো, আমার বোন বললেন, তার নাকি সন্তানদের প্রতি তেমন টান অনুভূত হয় না। মাঝে মধ্যে তিনি নাকি ভুলেই যান, তার আড়াই বছরের সন্তান আছে। সংসারও তার কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে, কিছুই ভালো লাগে না। বোনের স্বামীরও সংসার নিয়ে তেমন ভাবনা নেই, তিনিও ইন্টারনেটে ছবি শেয়ার নিয়ে ব্যস্ত।

ইন্টারনেটে সংযুক্ত না থাকলে অস্থির বোধ করি

আমি ফেসবুকের ব্যবহার করি ২০১৫ সাল থেকে। ভার্টিসির পড়াশোনা, ক্লাস ও পরীক্ষার সবরকম খোঁজখবর নিতে হতো ফেসবুকে। পরবর্তীতে অফিসের কাজের জন্যেও অহরহ দরকার পড়ত। শুরুতে আমার ব্যবহার মোটামুটি সীমিতই ছিল।

একটা সময় লক্ষ করলাম, প্রায় প্রতিদিনই আমি মাথাব্যথায় বেশ কষ্ট পাচ্ছি। কারণ খুঁজতে গিয়ে টের পেলাম, যখন আমি বাসে বা অন্য কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টে উঠি, পুরো পথ আমি স্মার্টফোনে ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এতে দীর্ঘসময় আমার ঘাড় ঝুঁকে থাকে এবং চলন্ত বাহনে মোবাইলে কিছু পড়তে গেলে চোখের ওপর অনেক চাপ পড়ে।

আরো খেয়াল করলাম, ইন্টারনেটে সংযুক্ত না থাকলে আমি অস্থির বোধ করছি। বাইরে থেকে বাসায় ফিরেই আমার প্রথম কাজ হলো ল্যাপটপ অন করে মুভি, সিরিজ ডাউনলোড দিয়ে রাখা। একটা শেষ করে আরেকটা পর্ব না দেখলে ঘুমই আসে না। এমনি করেই পার হয়ে যায় সময়। পরদিন ক্লান্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠি আর সারাদিনের রশ্টিনটা-ও এলোমেলো হয়ে যায়।



৯ ঘণ্টা

বর্তমানে তরুণ প্রজন্ম দিনে গড়ে নয় ঘণ্টা ব্যয় করে স্মার্টফোন ও কম্পিউটারে



৫০%

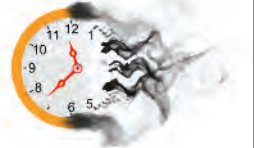
মার্কিন টিনএজারদের অর্ধেকই মনে করে তারা স্মার্টফোন আসক্ত



৩ জনে একজন

ইউনিসেফ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতি তিন জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু

১৩৫ মিনিট



ফেসবুক-ইউটিউব জাতীয় তথাকথিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একজন টিনএজার গড়ে দৈনিক সময় ব্যয় করে



১৫৩ জন

২০১৪-২০১৭ পর্যন্ত চার বছরে ঝুঁকিপূর্ণভাবে সেলফি তুলতে গিয়ে নিহতের সংখ্যা

আসক্তি মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছেন তরুণরা

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি শিখিলয়ন ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম। সিকি শতাব্দীর এ পথচলয় কোয়ান্টাম মেডিটেশনের সাথে যুক্ত হয়েছেন দেশের নানা শ্রেণি-পেশা-বয়সের মানুষ। চার দিনের কোর্সে অংশ নিয়ে লাখে মানুষ অর্জন করেছেন সঠিক জীবনদৃষ্টি। তারা রোগকে রূপান্তরিত করেছেন সুস্থতায়, অশান্তিকে প্রশান্তিতে, অভাবকে প্রাচুর্যে এবং ব্যর্থতাকে সাফল্যে।

নেতিবাচকতা ও হতাশায় আচ্ছন্ন বহু তরুণ জীবন বদলের এ অভিযাত্রায় অংশ নিয়ে উপলব্ধি করছে নিজের মেধা ও যোগ্যতাকে। ভার্চুয়াল আসক্তির যুগ-যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের জন্যেও অন্যতম সহায়ক-শক্তি হিসেবে কাজ করেছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। মেডিটেশনের মাধ্যমে আত্ম-আবিষ্কার ও আসক্তি মুক্তির কয়েকটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো।

ভার্চুয়াল ভাইরাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে জেনেছি

মিনহাজ উদ্দিন আহমদ শোভন



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে ভার্চুয়াল ভাইরাস বিষয়ে গুরুজী যা বলেছেন, এর প্রতিটি কথাই আমি সমর্থন করি। এই ভাইরাসের বিপদ যে কত সুদূরপ্রসারী এবং ভয়ানক, তা এ কোর্সে না এলে অনুভব

করতে পারতাম না।

কম্পিউটার, স্মার্টফোন এসব ডিভাইসের প্রকৃত ব্যবহার না জেনেই একরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা এসব পেয়ে গিয়েছি। আর এজন্যেই আমরা যা খুশি তা করছি। ইন্টারনেটের ভুল ব্যবহার আমাদের প্রজন্মকে অনেক পিছিয়ে দিচ্ছে।

আমার মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমাদের এই ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে। এখানে এসে মেডিটেশন করে আমার মনোবল বেড়েছে। এখন মনে হচ্ছে, পরীক্ষার আগে এই কোর্সটি করাটা আমার পড়াশোনার জন্যে খুব ভালো হয়েছে। কারণ সামনের দিনগুলো আমি পরীক্ষার জন্যে আরো ভালো প্রস্তুতি নিতে পারব এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের আসক্তি থেকে দূরে থাকতে পারব।

[এইচএসসি পরীক্ষার্থী, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ৪৩৯ ব্যাচ]

এবার জয় হবে আমার ইচ্ছাশক্তির

ফারহানা আক্তার



ফেসবুক ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আমি এত ব্যস্ত থাকতাম যে, পরিবারের সবাই পাশে থাকলেও তাদের সাথে কথাই বলতাম না। ফেসবুকে সেসব বন্ধদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, যারা

কোনোদিন আমার বিপদে-আপদে এগিয়ে আসবে কিনা আমি জানি না। এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ আমি খুঁজছিলাম কিন্তু কোথাও তা পাচ্ছিলাম না। কোর্সে এসে আমি সমাধানের পথ পেলাম।

আমি উপলব্ধি করেছি, স্মার্টফোন বা গুরুজীর ভাষায় শয়তানের বাস্তু নিয়ে আর মেতে থাকা যাবে না। শয়তানের জয় আর হতে দেয়া যাবে না। এবার আমার ইচ্ছাশক্তির জয় হবে।

কোয়ান্টামে আসার আগে আমি ভীষণ ব্র্যান্ড সচেতন ছিলাম। মনে হতো, অমুক ব্র্যান্ডের জিনিস না থাকলে আমার জীবন বৃথা। মেডিটেশন করে মনে হচ্ছে, ব্র্যান্ডের পেছনে ছুটে বেড়ানো অর্থহীন। আল্লাহ আমাকে মহামূল্যবান একটি মস্তিষ্ক দিয়েছেন এবং এই মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়েই আমি সবকিছু জয় করতে পারব।

[শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৩৪ ব্যাচ]

মেডিটেশন করে নতুনভাবে বাঁচতে শিখলাম

শেখ ফারদিন রহমান



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসার আগে আমি সবসময় ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, মেসেঞ্জার নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। স্কুল আর কোচিং ক্লাসের বাইরে কোনো ধরনের খেলাধুলা বা শারীরিক কসরতে আমার

একটুও আগ্রহ ছিল না। দৌড়, ফুটবল, ক্রিকেট এগুলো থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছিলাম।

এ-ছাড়াও এসবে আসক্ত হওয়ার পর থেকে আমার আচরণগত পরিবর্তন আমি নিজেই লক্ষ্য করছিলাম। কারো সাথে ঠিকমতো কথা বলতাম না, মিশতাম না। দীর্ঘসময় ইন্টারনেটে পড়ে থাকার কারণে পড়াশোনার বেশ পিছিয়ে পড়ছিলাম। মা-বাবার সাথেও দুর্ব্যবহার করতাম অনেক সময়।

মা-বাবা আর আত্মীয়স্বজনের উৎসাহে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। আসার আগে আমার দ্বিধা ছিল—এ কোর্স আমাকে কী শেখাবে?

কিন্তু মেডিটেশন কোর্স করে মনে হচ্ছে, আমি নতুনভাবে বাঁচতে শিখলাম। এখন বুঝতে পারছি, এই ভার্চুয়াল জগতে আমি কত সময় নষ্ট করেছি! আসলেই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, মেসেঞ্জার আমাদের কখনো ভালো কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। বরং এগুলো একজন মানুষকে মেধাশূন্য করে দেয়।

[শিক্ষার্থী, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। ৪৪১ ব্যাচ]

ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি

নওশিন তাবাসসুম



আমি একটি জিনিসে খুব বেশি আসক্ত ছিলাম। সেটা হলো, সেলফি। প্রতিদিন সকালে-বিকালে-রাতে আমি সেলফি তুলতাম। ঘুম থেকে উঠেই সেলফি না তুললে আমার ভালো লাগত না।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের এই চার দিন অংশ নিয়ে বুঝতে পারলাম, ঘন ঘন সেলফি তোলা একটি মানসিক সমস্যা। এখন যদি আমি সেলফি তুলতে যাই, ভেতর থেকেই একটা দ্বিধা কাজ করে।

এ-ছাড়াও আমার ফেসবুকের প্রতি নেশা ছিল। কোর্সে এসে এটাও জানলাম যে, ফেসবুক আসক্তি মাদকাসক্তির মতোই ভয়ংকর। তাই এটা থেকেও আমি বিরত থাকার চেষ্টা করছি।

কোর্সে গুরুজী এসবের ক্ষতিকর দিকগুলো যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে। কোয়ান্টাম মেথডকে ধন্যবাদ, কারণ এখানে এসে আমি নিজের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। ৪৪০ ব্যাচ]

মা-বাবার আদর্শ মেয়ে হতে চাই

রত্না সাহা

স্মার্টফোন, বন্ধুবান্ধব আর ফেসবুকে আমি এত আসক্ত ছিলাম যে, মা-বাবা ও পরিবারের কাউকে আমার ভালো লাগত না। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অকারণে মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম। বন্ধুরা ছাড়া আমার জীবনে আর কোনোকিছুরই গুরুত্ব ছিল না। পড়ালেখাতেও আমার মনোযোগ ছিল না।

এরপর আমার মাসি আমাকে কোয়ান্টামের সাদাকায়ন ও আলোকায়ন প্রোগ্রামে নিয়ে আসেন। প্রথম প্রথম এ প্রোগ্রামগুলো ভালো লাগত না। কিন্তু আস্তে আস্তে আমার ভালো লাগতে শুরু করে এবং বুঝতে পারি, আমার জীবন গড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় কথাগুলোই কোয়ান্টাম বলছে। এই ভালোলাগা থেকেই আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি।

কোর্সে এসে আমি আমার ভুলগুলো উপলব্ধি করেছি। ফেসবুক আর ইন্টারনেটের আসক্তি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। আর জেনেছি, মা-বাবার মতো নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীতে আর কেউ ভালবাসে না। আর তারা পাশে থাকলে জীবনে সফল হওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আজকের পর থেকে আমি নিজের ভুলগুলো শুধরে মা-বাবার আদর্শ মেয়ে হতে চাই।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ। ৪৩৪ ব্যাচ]

প্রশ্নোত্তর : আজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমার মেয়ে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে মোবাইল ফোন কেনার জন্যে বাসায় অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমরা তাকে এটা দিতে চাচ্ছি না। আবার তাকে ম্যানেজ করতেও পারছি না। এ অবস্থায় কী করণীয়?

উত্তর : এই সমস্যাটা শুধু আপনার নয়। এ সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। এখানে আপনাকে দৃঢ় হতে হবে কিন্তু রুঢ় নয়। অর্থাৎ তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

কারণ আমরা খুব স্পষ্ট করে বলছি, ১৮ বছর বয়সের আগে সন্তানকে স্মার্টফোন দেবেন না। দিলে আপনাকেই পরে পড়াতে হবে। তাই সন্তানকে মমতা দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন যে, মা, তোমার এখনো বয়স হয় নি। বয়স হোক, তারপর তোমাকে দেয়া হবে। আর যদি ভাবেন-অশান্তি করছে, দিয়ে দেই। স্মার্টফোন দিলে অশান্তির পরিমাণ আরো বাড়বে এবং সন্তান আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তাই এ ব্যাপারে আপোস করা যাবে না।

এর মধ্যে সংবাদপত্রে রিপোর্ট দেখলাম, আমাদের দেশে নাকি বাল্যবিবাহ বেড়ে গেছে এই স্মার্টফোনের বদৌলতে। এরা সব নাকি স্কুলের ছেলেমেয়ে। অতএব সতর্ক থাকতে হবে যে, সন্তান কার সাথে যোগাযোগ করছে। তার বোঝার বয়স না হওয়া পর্যন্ত যোগাযোগের সুযোগগুলো সীমিত করতে হবে। তাই সন্তানকে বোঝান এবং তাকে ভার্চুয়াল ভাইরাস ফোল্ডার ও বুলেটিন পড়তে দিন।

এ বুলেটিন পরিবারের সবাইকে পড়াবেন, প্রতিবেশী-আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদের পড়াবেন। কারণ চারপাশের মানুষ যদি অবুঝ থাকে, আপনি আপনার সন্তানকে কতক্ষণ রক্ষা করবেন? নিজের সন্তানকে রক্ষা করার জন্যেই চারপাশের মানুষকে বোঝাতে হবে ভার্চুয়াল ভাইরাসের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে।

সবার আগে নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হবে। পরিবারের জন্যে যে সময়টা রেখেছেন, তা পুরোপুরি পরিবারকে দিন। রাতে একসাথে খাবেন, সবাই মিলে গল্প করবেন। ফেসবুক, টিভি, স্মার্টফোন নিয়ে পরিবারের একেকজন একেকদিকে ব্যস্ত থাকবেন না। ভার্চুয়াল জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ঘর আর পরিবারের দরকার কী?

যখনই রাত ১১টা, স্টপ এভরিথিং। ১১টার পরে কোনো টিভি নেই, কম্পিউটার নেই, কোনো স্ক্রিন নেই। ছেলেমেয়ে যদি বলে পড়া আছে, পড়ার কাজে কম্পিউটার-ল্যাপটপ চালু রাখতে হবে। বলবেন-সকালবেলা পড়বে বাবা। সারারাত তুমি জেগে থাকবে আর সকালে ঘুমাবে, তা হবে না। যা করার সকালে করবে।

সন্তানকে বলুন, তুমি কম্পিউটারে কাজ করবে, আমি তোমার মা/বাবা হয়ে ঘুমাব, তা হয় কীভাবে? তোমার ছোটবেলায় তা-তো করি নি। বরং তুমি ঘুমিয়েছ, আমি জেগে ছিলাম, যাতে তোমার ঘুমের কোনো অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ কৌশল বুঝতে হবে। যদি আপনি দৃঢ় হতে না পারেন, কুশলী হতে না পারেন, এই ছেলে বা মেয়ে আপনার থাকবে না।

সন্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করার কিছু নেই। মা-বাবা হিসেবে মমতা থাকবে, কিন্তু নৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে দৃঢ় হবেন। সন্তান যদি বুদ্ধিমান হয়, আপনার চেয়ে জ্ঞানী হয়, সন্তানকে স্যাঁলুট করবেন যে, বাবা, আমি দেখছি, তোমার জ্ঞান আমার চেয়ে

বেশি। কিন্তু সন্তানের নির্বুদ্ধিতার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না। যারা এটা করেছেন, তারা ভুল করেছেন। পরিস্থিতি বরং আরো জটিল হয়েছে।

তবে সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করবেন না। রাগারাগি নয়, গামা লেভেল নয়, সবসময় আলফা লেভেল। কারণ তার দোষ নেই। সে বুঝতে পারছে না বলেই অশান্তিটা করছে। যখন বুঝবে, তখন আর করবে না।

প্রশ্ন : আমার ছেলে সারা দিন-রাত মোবাইল আর কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকে। যদি ওগুলো থেকে দূরে থাকতে বলি, তাহলে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করে এবং বাসার মধ্যে ভাঙচুর করে। বড় বোনদের কোনো কথা শোনে না। তার বয়স ২০ বছর। ভাসিটিতে ভর্তি করিয়েছি, পড়াশোনাও করবে না। ছেলেকে নিয়ে কী করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।

উত্তর : আসলে গাছের ডাল একবার যদি বাঁকা হয়ে যায়, সেটাকে সোজা করা খুব কঠিন। আপনি যেহেতু মা, তাকে নিয়মিত মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান, দিনে দুই বেলা।

সন্তানের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করুন। আলাপ কীভাবে শুরু করা যায়-এটা চিন্তা করবেন। কিন্তু ঘ্যানঘ্যান করবেন না। অর্থাৎ সারাক্ষণ একই কথা বলবেন না। তার সাথে বন্ধুত্বের পথটা খোলা রাখুন।

বোঝা যাচ্ছে যে, আপনার এক ছেলে। না হলে সাধারণত এত বাঁকে না। আহ্লাদ দিয়েছেন, এখন আহ্লাদের শাস্তি তো আপনাকে পেতে হবে। মা-বাবারা এ ভুল করেন-ছোটবেলায় অতিরিক্ত আহ্লাদ দিয়ে ফেলেন। তাদের কথা হলো, আমার ছেলে, বংশের চেরাগ!

কিন্তু এই চেরাগটা তো ঠিকমতো রাখতে হবে, যাতে বাতিটা জ্বলে। এখন ২০ বছরের ছেলেকে আপনি বেশি কিছু করতেও পারবেন না। কারণ সে আসক্ত, ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত। সারা দিন-রাত মোবাইল আর কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকা আর মাদক নিয়ে পড়ে থাকার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

বলা যায়, একটাই তফাৎ, তা হচ্ছে মাদক সম্পর্কে আমরা সচেতন, মা-বাবা হাতে তুলে দেন না আর ভার্চুয়াল ভাইরাস মা-বাবা নিজেই সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ছেলে যে অনেক স্মার্ট এবং সে কম্পিউটার কত ভালো বোঝে, এটা মা-বাবা গর্ব করে বলেন। কিন্তু স্মার্ট হতে গিয়ে সন্তান কী করছে, সেটা তারা বোঝেন না। সমস্যাটা হয় সেখানেই।

ছেলেমেয়েকে ছোট থেকে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আনাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। যে বখে গেছে, তাকে নিয়ে কতটুকু কী করা যাবে, বলা মুশকিল। তবে যাদের সন্তান এখনো ছোট আছে, তাদের ব্যাপারে এখন থেকেই সচেতন হোন।

স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে ভিডিও ছেড়ে শিশুকে খাওয়ানোর অভ্যাস করবেন না। স্মার্ট টিভির রিমোট কন্ট্রোল শিশুর হাতে দেবেন না। কারণ স্মার্টফোনে যা করা যায়, যে সাইটগুলোতে যাওয়া যায়, স্মার্ট টিভিতেও সেই সাইটগুলোতে যাওয়া যায়।

আর শৈশব থেকেই সন্তানকে একটার পর একটা সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান-আবৃত্তি ইত্যাদি। ফেসবুক-ইন্টারনেট-স্মার্টফোন

ব্যবহারের অবসর সময় যেন সে না পায়।

সন্তানের বন্ধু হবেন কিন্তু নৈতিক ব্যাপারে দৃঢ় হোন। মনে রাখবেন, সন্তান সবসময় মানসিকভাবে দৃঢ় মা-বাবাকে পছন্দ করে। তাই সন্তানকে আদর করবেন, কিন্তু শৃঙ্খলার মধ্যে রাখবেন। অর্থাৎ ছোটবেলা থেকেই তাকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাকে নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ এবং অনুসরণ করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই আল কোরআনের মর্মবাণী পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সেইসাথে সন্তানকে নিয়ে মেডিটেশন করুন। মেডিটেশনে সন্তানের সাথে যে হৃদয়তা গড়ে ওঠে, তা অপূর্ব। এর ফলে আপনি তাকে যে-কোনো ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। আর পরিবারের প্রত্যেকটা কাজে বয়স অনুযায়ী তাকে অংশীদার করুন। আপনি যদি আজ সচেতন না হন, পরে আপনাকে অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে।

প্রশ্ন : আমার ছোট দেবর এই বছর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছে। প্রথম পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ের তিনটায় শূন্য পেয়েছে। সে বলে, সে নাকি পড়াশোনা বোঝে না। সে সারাদিন মোবাইল ফোন নিয়ে পড়ে থাকে। বোঝালে বোঝে না, খেপে যায়। কোয়ান্টামে আনতে চেয়েছি, বলে আমার কোয়ান্টাম লাগবে না। এসব থেকে তাকে কীভাবে ফেরানো যায়?

উত্তর : একজন ছাত্র যদি পাঁচটি বিষয়ের তিনটিতেই শূন্য পায়, তার আসলে পড়াশোনার দরকার নেই। তাকে উপার্জনে ঢুকিয়ে দিন। কিছুদিন সে উপার্জন করুক। উপার্জন করতে গিয়ে যে কষ্ট, এটা সে দেখুক। তারপর যদি পড়াশোনায় সে আগ্রহী হয়! এটা হলো একটি প্রক্রিয়া।

আর কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া হলো, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা। যেহেতু আপনার দেবর, আপনি একজন বড় বোনের মতো তাকে বোঝাতে পারেন। আর যদি না পারেন, আপনার স্বামীকে বলুন। আপনি কমান্ড সেন্টারে বোঝাতে চেষ্টা করুন এবং আপনার স্বামীকে দিয়ে বাস্তবে বোঝানোর চেষ্টা করুন।

এ সমস্যার কথা আপনার স্বামীকে এখনই জানান। অনেক সময় আমরা পরিবারে অনেক কিছু গোপন রাখি-জানালাে আবার কী অশান্তি হয়! কিন্তু অশান্তি যা হওয়ার তা হবেই। এখন হলেও হবে, ছয় মাস পরে হলেও হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বরং বেশি হবে। তাই পারিবারিক এই তথ্যগুলো সবসময় অভিভাবককে বা যিনি সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারবেন, তাকে গুরুত্বই জানানো উচিত।

এ মাসের অটোসাজেশন

সকল আসক্তি ও প্রবৃত্তির
শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে আমি হবো
আত্মজয়ী বীর।

ভার্চুয়াল ভাইরাস ৯ বাড়ছে সচেতনতা



২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের এলজিইডি মিলনায়তনে শ্রদ্ধেয়া মা-জীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় পারিবারিক ওয়ার্কশপ। এতে অংশ নেন তিন শতাধিক গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার। আলোচনা ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের সামনে তুলে ধরা হয় প্রযুক্তি আশ্রাসন কীভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে তরুণ প্রজন্মকে। এর সর্বনাশা হাতছানি থেকে পরিবার ও সমাজকে বাঁচানোর জন্যে শ্রদ্ধেয়া মা-জী অংশগ্রহণকারীদের সমন্বিতভাবে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।



মহাখালীর টিএন্ডটি আদর্শ মহিলা কলেজে আয়োজিত কোয়ান্টাম সভায় অংশ নেন মোট ১২৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। অংশগ্রহণকারীদের সচেতন করে তুলতে দেখানো হয় ফাউন্ডেশন নির্মিত দুটি ডকুমেন্টারি-ভার্চুয়াল ভাইরাস ও সেলফি সিনড্রোম।

ঢাকার লালমাটিয়া একাডেমিয়া স্কুলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশ নেন ১১৭ জন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। আর শিক্ষকদের ভার্চুয়াল ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে একাডেমিয়া স্কুলের লালমাটিয়া, পল্লবী ও গুলশান শাখায় মোট তিনটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

পাবলিক বাসের জানালায় সেলফি সিনড্রোম ও স্মার্টফোন আসক্তি স্টিকার লাগাতে গিয়েছিলেন ফাউন্ডেশনের একজন কোয়ান্টিয়ার। বাসের কর্মীরা স্টিকারের লেখা পড়ার পর নিজেরাই জানালার কাচ পরিষ্কার করে দিয়েছেন যেন স্টিকারটি ভালোভাবে সবার চোখে পড়ে।

মধ্যবয়স্ক আরেক ভদ্রলোক এই স্টিকার দেখে বলে উঠলেন, দেয়ালে না, এটা আমার কপালে লাগান। আমার সন্তান তো হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফেসবুকে আসক্ত হয়ে সে দিন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এক চায়ের দোকানে স্টিকার বিতরণ করতে গেলে গুরুতর দোকানদার নিষেধ করেন। কিন্তু যখন দেখলেন স্টিকারে ফেসবুক আসক্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে তখন সাথে সাথে তিনি বললেন, ভাই, এটা দোকানের প্রত্যেকটি দেয়ালে লাগান, পারলে আমার বাড়িতেও লাগান। আমার স্ত্রী রান্না করতে করতেও ফেসবুক দেখতে থাকে।

এই হলো বাস্তবতা, ভার্চুয়াল ভাইরাস এভাবে

ভোগাচ্ছে সবাইকেই। ভুক্তভোগী সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। হয় নিজে আসক্ত, নতুবা পরিবারের সদস্য-আত্মীয়-বন্ধুরা। মাদকাসক্তির চেয়েও ভয়ংকর এ আসক্তি সম্পর্কে ফাউন্ডেশন ২০০৯ সাল থেকেই সচেতন করে আসছে।

তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ভার্চুয়াল ভাইরাস ক্যাম্পেইন শুরু হয় এবছর ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার আইডিইবি হলে অনুষ্ঠিত আর্ডেন্টারিয়ার ওয়ার্কশপের পর। ইতোমধ্যেই ক্যাম্পেইনটি সর্বমহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। এ সম্পর্কিত বুলেটিন, ফোল্ডার ও স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, মার্কেটে। এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিতে একাধিক সেমিনার আয়োজন করছে সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলো। সেমিনারে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ভার্চুয়াল ভাইরাস ও সেলফি সিনড্রোম ভিডিও দেখানো হয়েছে।

ঢাকার যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতা সভা আয়োজন করা হয়েছে সেগুলো

হলো-আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, একাডেমিয়া স্কুল, মোহাম্মদপুর মেধাকুঞ্জ স্কুল, মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল, টিএন্ডটি আদর্শ মহিলা কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং গুলশান কলেজ। এ-ছাড়াও লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লি. ও রূপগঞ্জ ৯নং কমিশনার ওয়ার্ডে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকার বাইরে বগুড়ায় সরকারি মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ ও নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার বি.আর.ডি.পি. ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত হয়েছে সচেতনতামূলক সেমিনার।

ভার্চুয়াল ভাইরাস বুলেটিন, ফোল্ডার ও স্টিকার বিতরণ করার অভিজ্ঞতা জানাতে যোগাযোগ করুন-
bulletin@quantummethod.org.bd

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী মানবিক যোগাযোগ বাড়ালে সমাজ সুন্দর হবে



বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। কোয়ান্টামের এই কার্যক্রমের সাথে আমি নিজেও যুক্ত হতে চাই।

আমি মনে করি, রক্তদাতাদের মিছিলে আরো মানুষ সংযুক্ত হলে আমাদের মানবিক যোগাযোগ বাড়বে। বর্তমান সময়ে মানবিক যোগাযোগ কমে গেছে বলেই দিন দিন ফেসবুক আসক্তির পরিমাণ বাড়ছে। রক্তদানের মতো মানবিক যোগাযোগগুলো সমাজে বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই নানা রকম আসক্তির প্রবণতা কমে যাবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক ডা. এ বি এম ইউনুস। তিনি বলেন, ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত পাঁচটি টেস্ট নিশ্চিত করার পরই কেবল কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে রক্ত সরবরাহ করা হয়। তাই এটি এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রেফারেন্স ল্যাবে পরিণত হয়েছে।’

সভাপতির বক্তব্যে মাদাম নাহার আল বোখারী বলেন, ‘রক্তদানের পর এই রক্ত কার জীবন বাঁচাচ্ছে রক্তদাতারা তা জানেনও না। কিন্তু নীরবে তারা মুমূর্ষুকে বাঁচানোর জন্যে রক্ত দিয়ে যাচ্ছেন। রক্তদাতাদের এই নীরব দানের প্রতিদান স্রষ্টা অবশ্যই দেবেন।’

এ আয়োজনে প্রত্যেক রক্তদাতাকে সম্মাননা সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড ও সুদৃশ্য ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে কমপক্ষে ২৫ বার রক্তদান করেছেন এমন ১৬৫ জন রক্তদাতাকে সম্মাননা জানানো হয়। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত ১৬ তম গোল্ডেন ডোনার সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত রক্তের বিকল্প আবিস্কৃত হয় নি। তাই রক্তের



স্টলের দৃষ্টিনন্দন সাজসজ্জা আকৃষ্ট করে রুচিশীল পাঠকদের

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ৭ম বারের মতো অংশগ্রহণ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। পুরো ফেব্রুয়ারি মাসজুড়েই স্টলে সর্বস্তরের পাঠকদের সমাগম ছিল লক্ষণীয়।

কোয়ান্টাম স্টলে ড. এম শমশের আলী

২৩ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম স্টলে আসেন বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী, ধর্মতাত্ত্বিক ও লেখক অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী। তাকে ঘিরে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত তিনি ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন বইতে পাঠকদের অটোগ্রাফ দেন। ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম চেতনার উপযোগিতা নিয়ে রচিত বইটি ইতোমধ্যেই পেয়েছে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা।



ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন বইতে ড. এম শমশের আলীর অটোগ্রাফ নিতে পাঠকদের ভিড়



বইমেলায় নতুন বই ৥ কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

এবারের মেলায় কোয়ান্টাম প্রকাশ করে নতুন বই—কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার পথিকৃৎ ও শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খানকে। কর্মব্যস্ততা, সেবা, স্বাস্থ্য, পরিবার ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে নির্বাচিত ৩২টি নিবন্ধের একটি অনবদ্য সংকলন এ বইটি।

ভোগবাদী পণ্য-আধ্বাসন আর নিত্যনতুন প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে বিপর্যস্ত হতাশ ও পরিবার-বিচ্ছিন্ন আধুনিক মানুষের যুগ-যন্ত্রণার কার্যকরী প্রতিষেধক হয়ে উঠতে পারে কর্মব্যস্ত সুখী জীবন বইটি। প্রকাশের প্রথমদিন থেকেই বইটি পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : মার্চ ২০১৮ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক

৩১/তি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **গুণভেদ্য মূল্য - ৫ টাকা**

Phone : 9341441, 48319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ॥ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd



কোয়ান্টাম বুলেটিন

বর্ষবরণ সংস্করণ ১৪২৫

স্মার্ট হোন ॥ ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে নিজে বাঁচুন, পরিবারকে বাঁচান

ফেসবুক
টুইটার
ম্যাপচ্যাট
ইনস্টাগ্রাম
সেলফি
ইউটিউব
ওয়েব সিরিজ
টিভি সিরিয়াল
ভার্চুয়াল গেম
অনলাইন শপিং
স্মার্ট টিভি
ইন্টারনেট
ও
স্মার্টফোন
আসক্তি

শিশুরা ঝুঁকিতে

জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা (ইউনিসেফ)-এর রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি বড় অংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১১ হাজার ৮২১ জন শিশু-কিশোরদের নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে ইউনিসেফ। অংশগ্রহণকারীদের ৮১.২ শতাংশ বলেছে, তারা প্রতিদিনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। ১৩ শতাংশ শিশুই স্বীকার করেছে যে, তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো না কোনো সময় হয়রানি বা উদ্ভাবের শিকার।

তথ্যসূত্র : দ্য ডেইলি স্টার, ৩০ মার্চ ২০১৮

স্মার্ট হোন। যে সচেতনতা শুরু হয়েছে দেশব্যাপী, এমনকি বিশ্ব অঙ্গনেও-তার সক্রিয় অংশ হোন। সময়ের সাথে থাকুন আপনিও। ফেসবুকসহ সব ধরনের ভার্চুয়াল ভাইরাসের ছোবল থেকে মুক্ত হতে দ্রুত উদ্যোগী হোন। ভালো থাকুন। নিরাপদে রাখুন আপনার সন্তান ও পরিবারকে।

২০০৯ সাল থেকেই ফেসবুকসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আধুনিক প্রযুক্তিপণ্যের আসক্তিকর দিক সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তুলছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। শুরু থেকেই কোয়ান্টাম বলেছে-ব্যক্তিগত জীবন, মনোদৈহিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক শান্তির জন্যে এক ভয়ানক হুমকি তথাকথিত এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সেই ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকেই কোয়ান্টাম দেশজুড়ে শুরু করে ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতা প্রচারণা।

মাস পেরোতেই প্রমাণিত হলো এ কথার সত্যতা, লক্ষ কোটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি ও প্রতারণার দায়ে আজ বিশ্বজুড়ে রব উঠেছে 'ডিলিট ফেসবুক'। আমরা বলতে পারি, ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে নিজেকে ও অন্যকে বাঁচাতে এক দশক আগে যে কার্যক্রমের সূত্রপাত করেছিল কোয়ান্টাম-সময়ের প্রয়োজনে তা-ই আজ সাদরে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের মানুষ। কারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রত্যেকেই উপলব্ধি

করছেন-ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে আজ যেখানে যত অস্থিরতা হিংস্রতা নেতিবাচকতা, তার অন্যতম প্রধান কারণ এই ভার্চুয়াল ভাইরাস। যা একটু একটু করে ধ্বংস করে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতা, পারিবারিক বন্ধন ও বিশ্বস্ততা, সামাজিক সম্প্রীতি ও সমর্মিতার মতো মানবিক উৎকর্ষের চিহ্নগুলো।

গবেষকদের মতে, স্মার্টফোন-ইন্টারনেটের লাগামহীন ব্যবহার আর গেম-ইউটিউব-সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি জীবনঘাতী মাদকের চেয়েও ভয়াবহ। যাকে গবেষকরা অভিহিত করেছেন 'ডিজিটাল কোকেন' হিসেবে! তাদের মতে, মাদকের চাহিদা সৃষ্টি হলে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক নিঃসৃত হয়, ঠিক একই ঘটনা ঘটে এসব প্রযুক্তিপণ্যে আসক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও। এ আসক্তির শিকার আজ ধনী-গরিব নির্বিশেষে লক্ষ কোটি শিশু-কিশোর-তরুণসহ সব বয়সী মানুষ।

তাই আসুন, জ্ঞানে-উপলব্ধিতে সত্যিকারের একজন আধুনিক মানুষ হয়ে উঠি। নিজে সচেতন হই। যথাসাধ্য সচেতন করে তুলি আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী-সহকর্মীদের। ভার্চুয়াল ভাইরাসের মরণ-আগ্রাসন থেকে বাঁচাই সন্তান ও পরিবারকে। বাঁচাই প্রিয় দেশবাসীকে। এ সচেতনতার পথ ধরেই সূচিত হোক আমাদের নৈতিক পুনর্জাগরণ। মানবিকতার অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিক প্রিয় বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞদের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করুন

- পরিবারকে সময় দিন। পরিবারের জন্যে বরাদ্দ সময়ে টিভি-কম্পিউটার-স্মার্টফোনসহ সকল ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরে থাকুন। সন্তান মা-বাবা ভাইবোন আত্মীয়দের সাথে বাস্তব যোগাযোগ ও একাত্মতা বাড়ান।
- আপনার স্মার্টফোন থেকে ফেসবুক-টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যাবতীয় অ্যাপস আজই ডিলিট করে দিন। পেশাগত/শিক্ষাগত প্রয়োজনে এসব ব্যবহার করতে হলেও তা করুন শুধু কম্পিউটার/ল্যাপটপে, দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে।
- শিক্ষার্থী জীবনে বিরূপ প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করেছে। যথাযথ উদ্যোগ নিন আপনিও।
- নিজের ও সমাজের কল্যাণে সংস্কে সক্রিয় থাকুন। সমমনা মানুষদের সাথে গড়ে তুলুন প্রত্যক্ষ সামাজিক যোগাযোগ।
- দৈনন্দিন জীবনে মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চার পাশাপাশি সুস্থ জীবন-অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে ঘটবে আপনার আত্মশক্তির জাগরণ-সব ধরনের আসক্তিকে 'না' বলতে পারবেন আপনি।

**সাবধান! ভার্চুয়াল ভাইরাস-
ফেসবুক, স্মার্টফোন, ইউটিউব-আসক্তি
হতাশা ও বিষণ্ণতা বাড়ায়**

quantummethord.org.bd



ফেসবুক-ইন্টারনেট আসক্তি সত্যিকারের দুর্ভাবনার বিষয়

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

একটা দৃশ্য কল্পনা করা যাক।

আপনি একজন বাবা কিংবা মা, আপনার ছেলেমেয়েরা বড় হয় নি, তারা স্কুল-কলেজে পড়ে। একদিন আপনি বাসায় এসেছেন, এসে দেখলেন আপনার ছেলে বা মেয়েটি টেবিলে পা তুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা সিগারেট টানছে। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী করছিস বাবা (কিংবা মা)?’

আপনার ছেলে কিংবা মেয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, ‘সিগারেট খাচ্ছি আম্মু (কিংবা আব্বু)।’

তারপর টেবিল থেকে পা নামিয়ে বলল, ‘খাওয়ার পর একটা সিগারেটে টান না দিলে ভালোই লাগে না।’

কথা শেষ করে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে তার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করল।

আপনি বললেন, ‘ঠিক আছে বাবা (কিংবা মা) সিগারেটটা শেষ করে হোমওয়ার্কগুলো করে ফেল।’

কথা শেষ করে আপনি ভেতরে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন : ‘আমার ছেলেটি (বা মেয়েটি) কত লক্ষ্মী। বাইরে কোনো বুট-ঝামেলার মাঝে যায় না। ঘরের মাঝে থাকে, মাঝে মাঝে সিগারেট খায়!’

আমি জানি, আপনারা যারা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ের বাবা তারা আমার এই কাল্পনিক দৃশ্যটির বর্ণনা শুনে যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন। বলছেন, একজন বাবা কিংবা মা তার ছেলে বা মেয়ের এরকম একটা আচরণকে কখনো এত সহজভাবে নিতে পারে না।

অবশ্যই নিতে পারে না এবং কখনো নেয় না।

সিগারেট হচ্ছে নেশা। এরকম আরো অনেক নেশা আছে, আমরা দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো দেখে অভ্যস্ত নই। তাই কাল্পনিক দৃশ্যটিতে অন্য নেশাগুলোর কথা না বলে সিগারেটের উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সন্তান কোনো একটা নেশায় আসক্ত হয়েছে জানতে পারলে আমরা সেটা মেনে নিতে পারব না। আমরা দুশ্চিন্তিত হবো, বিচলিত হবো এবং সন্তানকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে পাগল হয়ে যাব। যদি এই বিষয়টা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে বসে থাকতে দেই?

যে বিষয়টি এতদিন একটা সন্দেহ বা আশঙ্কা ছিল, এখন সেই বিষয়টি গবেষণা জার্নালে বের হতে শুরু করেছে। কোকেন-আসক্ত একজন মাদকাসক্ত মানুষকে যদি মাদক খেতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে যে কেমিক্যালগুলো বের হয়ে তাকে অস্থির করে তোলে, ফেসবুকে আসক্ত একজন মানুষকে যদি ফেসবুক করতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে সেই একই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি ছেলেমানুষী বিনোদন নয়, বিষয়টি মাদকে আসক্তির মতো গুরুতর একটি ঘটনা।

কারো কারো কাছে নিশ্চয়ই মনে হতে পারে, আমার পুরো বক্তব্যটা বুঝি একধরনের বাড়াবাড়ি। বিষয়টি মোটেও এমন কিছু গুরুতর নয়। কিন্তু আমি মোটামুটি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি-বিষয়টা যথেষ্ট গুরুতর।

মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সেটা যথেষ্ট রহস্যময়। একজন ছেলে বা মেয়ে যখন বড় হচ্ছে সেই সময়টাতে সে কীভাবে তার মস্তিষ্ক ব্যবহার করেছে, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে তার মস্তিষ্কের গঠনটি কেমন হবে। তাই একজন বড় মানুষের ফেসবুক আসক্তি দেখে আমি যতটুকু বিচলত হই তার থেকে অনেক বেশি বিচলিত হই, যদি সেটি হয় কমবয়সী একটি ছেলে বা মেয়ের আসক্তি।

আজ থেকে ১০ বছর পরে হয়তো আমরা জানতে পারব শৈশব-কৈশোরে মাঠে-ঘাটে ছোটোছুটি করে



খেলাধুলা না করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ছোট একটা স্ক্রিনের সামনে বসে থাকার কারণে আমাদের কী ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমাদের কিছু করার থাকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে একটুখানি কমনসেন্স হয়তো আমাদের অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

যারা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করছেন আমি তাদের এতটুকু খাটো করে দেখছি না। কিন্তু এই প্রযুক্তি যাদের ব্যবহার করছে, আমার দুশ্চিন্তা তাদের নিয়ে!

সবাই হয়তো জানে না, যারা এই প্রযুক্তি গড়ে তুলছে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছলে-বলে-কৌশলে কোনো একজনকে তাদের ওয়েবসাইটে কিংবা পোর্টালে নিয়ে আসা এবং যত বেশি সম্ভব তাদের সেখানে আটকে রাখা। যারা আমার কথা বিশ্বাস করেন না তাদের বলব-‘বিবিসি’র মতো কোনো সম্ভাব্য একটা নিউজ মিডিয়ার সাইটে যেতে। আশেপাশে তাকান, আপনি কী দেখবেন?

সারা পৃথিবীতে কত গুরুতর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে ওসবের চিহ্ন নেই। একেবারে না দিলেই নয় সে-রকম একটি-দুটি ঘটনার পাশাপাশি শুধু রগরগে চটুল খবর। তার যে-কোনো একটাতে ক্লিক করে দেখেন আপনাকে নিজে থেকে তারা একটার পর একটা ভিডিও দেখাতে শুরু করবে, আপনার মনের জোর যদি যথেষ্ট বেশি না থাকে কিছু বোঝার আগেই আপনি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ভিডিও দেখে দেখে ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করে ফেলবেন।

আপনি কোন ধরনের ওয়েবসাইটে গিয়েছেন সেটি বিশ্লেষণ করে আপনাকে লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা সেই ধরনের জায়গায় ঠেলে দেবে! শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করেছেন বলে এই সাইবার জগৎ কিন্তু আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানে।

‘লাইক’ দেওয়া নিয়ে কিছুদিন আগে আমি একটা সত্যি ঘটনা শুনেছি। একটা বাচ্চা মেয়ে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলে কিছু একটা পোস্ট করে দিয়ে অপেক্ষা করে আছে সেখানে কেউ ‘লাইক’ দেবে। যখন দেখতে পেল কেউ তাকে খেয়াল করে ‘লাইক’ দিচ্ছে না, তখন সে নিজেই আর একটা অ্যাকাউন্ট খুলে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেকে ‘লাইক’ দিতে থাকল!

বিষয়টা একটা কৌতুকের বিষয় কিন্তু তারপরও এটা শুনে আমি কেন জানি একটু আহত অনুভব করেছি। আমার মনে হয়েছে কেন আমার দেশের একটি ছোট মেয়ে জীবনের প্রতি এরকম একটা দীনহীন মনোভাব নিয়ে কাঙালের মতো বড় হবে? কে ঠিক করে দিয়েছে জীবনকে অর্থপূর্ণ হতে হলে ফেসবুকে ‘লাইক’ পেতে হবে?

কেউ স্বীকার করুক আর না-ই করুক ইন্টারনেট আসক্তি কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে যদি বলা হয়, ফেসবুক আসক্তি একটি সত্যিকারের দুর্ভাবনার বিষয়। আমি তাই সবাইকে মনে করিয়ে দেই, অনলাইন জীবনের পাশাপাশি যে রক্তমাংসের বাস্তব জীবনটি আছে সেটি যেন আমরা ভুলে না যাই।

তথ্যসূত্র : বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম
২৪ মার্চ ২০১৭

ভার্চুয়াল বিপদ সত্য জানুন

ফেসবুকসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে কখন যে আপনি আসক্ত হয়ে যাবেন, টেরই পাবেন না। হুঁশ ফিরবে যখন, ততক্ষণে শরীর-মন আর পরিবারে অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। ফিরে পাবেন না আপনার ক্ষয়ে যাওয়া মেধা-সময়-অর্থ। বিজ্ঞানসম্মত তথ্য-উপাত্তগুলো এমনটাই বলছে। আসুন, জেনে নিই বিশ্বব্যাপী নানা গবেষণায় উঠে আসা তথ্যগুলো :

প্রিয়জনের চেয়েও প্রিয় স্মার্টফোন!

সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইন্ড ব্রেন বিহেভিয়ার ও সায়েন্স অব হ্যাপিনেস ও টেলিকমিউনিকেশন সংস্থা মটোরোলা-র যৌথ উদ্যোগে একটি জরিপে দেখা গেছে, ৬৫ শতাংশ ভারতীয় তরুণদের কাছে প্রিয়জন বা ঘনিষ্ঠজনের চেয়েও প্রিয় হলো তাদের স্মার্টফোনটি! এমনকি এটি সাথে না থাকলে বা হারিয়ে ফেলার ভয়ে প্রায়শই তারা ভীষণ অস্থিরতা-আতঙ্কে ভোগেন। এতে আরো বলা হয়, স্মার্টফোন-আসক্তরা ক্রমশ জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।

(দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

বিশ্বজুড়ে হুমকির মুখে শিশুরা

২০১৬ সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতি তিন জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫টি অঙ্গরাজ্যে কিন্ডারগার্টেন থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত জরিপ করে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের লেখার প্রতি আগ্রহ দিন দিন কমে টাইপিং শেখানোর প্রবণতা বেড়েছে। ফলে তৃতীয় শ্রেণির শিশুদের হাতের লেখা শেখাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষকরা। (ডয়েচে ভ্যালে, ১ নভেম্বর ২০১৩)

যেসব শিশুরা দিনে তিন ঘণ্টার বেশি সময় স্ক্রিনের সামনে কাটায়ে তারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে আছে। ২০০৪-২০০৭ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের তিনটি শহরের নয় থেকে দশ বছর বয়সী সাড়ে চার হাজার শিশুদের নিয়ে গবেষণাটি করেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর একদল বিশেষজ্ঞ।

(দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ১৫ মার্চ ২০১৭)

অনলাইন ও ভিডিও গেম ৥ মেধাশূন্য ও আত্মসী হয়ে উঠছে তরুণেরা

ভিডিও গেম খেলার সময় ব্যক্তির মনে হয়, গেমের জগতটাই বাস্তব, এখানকার সবকিছু সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে। গেম আসক্ত ব্যক্তি বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ বোঝে না-সে সাজানো নাটকের অংশমাত্র। এ কথাগুলো বলেছেন আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট ডগলাস জেনটাইল।

আতকে ওঠার মতো একটি ঘটনা ঘটে ২০১০ সালে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক দম্পতি অনলাইন গেম আসক্ত হয়ে সারাদিন সাইবার ক্যাফেতে পড়ে থাকত। একপর্যায়ে গেমের মধ্যে কাল্পনিক একটি শিশুকে নিয়ে তারা এতই মনোযোগী ছিল যে, বাস্তবে নিজেদের তিন মাস বয়সী সন্তানকে দিনে খাবার দিত মাত্র একবার। অনাহারে-অস্বস্তিতে শেষপর্যন্ত মারা যায় ছোট শিশুটি। (সিএনএন, ৫ মার্চ ২০১০)

জার্মানির মিউনিখে ১৮ বছরের এক তরুণ অতর্কিত হামলা চালিয়ে নয় জনকে নিহত ও ১৬ জনকে আহত করে। তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় সে ছিল সহিংস গেম আসক্ত। দীর্ঘ গবেষণায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, সহিংস গেমগুলো কিশোরদের প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হিংস্র করে তুলছে।

(টাইম ম্যাগাজিন, ১৭ আগস্ট ২০১৫)



সোশ্যাল মিডিয়া ৥ মাদক এবং জুয়ার চেয়েও আসক্তিকর

ফেসবুকসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটি ফর পাবলিক হেলথ। নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে এমন ১৪-২৪ বছর বয়সী ১৫০০ জন তরুণ-যুবক এতে অংশ নেয়। দেখা যায়, এদের শতকরা ৯১ জনই সোশ্যাল মিডিয়ায় এতটাই আসক্ত, যা সিগারেট বা অ্যালকোহলে আসক্তির চেয়েও বেশি।

বিশেষত ছবি শেয়ারিং অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে ভয়ংকর প্রভাব ফেলছে। প্রতি পাঁচ জনে একজন তরুণের ভাষ্য হচ্ছে, তারা মাঝরাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো নতুন মেসেজ এলো কিনা তা চেক করে, যার ক্লাস্ট্র পরদিন সারাক্ষণই তারা বয়ে বেড়ায়।

(দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ২১ মে ২০১৭)

জার্নাল সাইকোলজিক্যাল রিপোর্ট: ডিজঅ্যাভিলিটি এন্ড ট্রমা-তে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, ফেসবুক ব্যবহার করার দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে এমন মানুষদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নের সাথে মিলে গেছে মাদকদ্রব্য ও জুয়ায় আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের প্যাটার্ন।

ছবিতে লাইক পাওয়ার আগ্রহ মস্তিষ্কে নিঃসরণ করে ডোপামিন নামক হরমোন। ড্রাগ গ্রহণের সময় বা জুয়ায় জিতলে মস্তিষ্কে এই একই হরমোন নিঃসরণ হয়ে থাকে। (দ্য সান, ৬ জুলাই ২০১৬)

নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতায় আক্রান্ত কিশোর ৥ পরিণতি হতে পারে আত্মহত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের তথ্য হলো, ২০১০ থেকেই ১৩-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের স্মার্টফোন ও প্রযুক্তিগণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বিষণ্ণতায় ভোগা ও আত্মহত্যা-প্রবণতা বেড়ে গেছে। পরবর্তী

পাঁচ বছরে যা আরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৫ ভাগে। যেসব কিশোর-কিশোরী স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিভাইসে দিনে পাঁচ ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করছে, তাদের ৪৮ ভাগ অন্তত একবার হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

(হিন্দুস্তান টাইমস, ১৫ নভেম্বর ২০১৭)

গুরুতর মানসিক রোগ 'সেলফিটিস' সেলফি নিষিদ্ধ হলো কান চলচ্চিত্র উৎসবে

ঘন ঘন সেলফি তোলা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্যে ব্যাকুল হওয়ার নামই সেলফিটিস। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণত যারা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং অনুকরণপ্রিয় (ট্রেন্ডি), তারাই মূলত সেলফি রোগে আক্রান্ত।

(দ্য টেলিগ্রাফ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭)

চলচ্চিত্র-বিষয়ক বিশ্বখ্যাত আয়োজন ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসব। অনাকাঙ্ক্ষিত বিশৃঙ্খলা এড়াতে এবছর অনুষ্ঠিতব্য এর ৭১ তম আয়োজনে সেলফি তোলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উৎসবের প্রধান আয়োজক থিয়েরি ফ্রাঙ্কো-র মতে, সেলফি একটি ব্যাধি, যা সত্যিই উদ্ভট ও ভীতিকর।

(দ্য গার্ডিয়ান, ২৪ মার্চ ২০১৮)

সাইবার বুলিং ৥ নৃশংসতার নতুন ফাঁদ

অনলাইনে অশালীন কথা ও ছবি, অকথ্য গালিগালাজ, এমনকি হত্যার হুমকির নামই সাইবার বুলিং। আমাদের দেশেও ঘটছে এ ধরনের ঘটনা।

ঢাকার উত্তরায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৈরি হওয়া পাঁচটি গ্রুপের খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। পারস্পরিক বিবাদ প্রথমে ফেসবুকে অশোভন ভাষায় হুমকি দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা রূপ নেয় বাস্তব নৃশংসতায়। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি একটি গ্যাং-এর কিশোররা খুন করে তাদেরই সহপাঠীকে।

দিন দিন একটু হয়ে উঠছে চোখ-কান ও মনোদৈহিক স্বাস্থ্য-সমস্যা

ম্যাসাচুসেটস-এর চোখ-কান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্মার্টফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিজনিত সমস্যা এবং মাথাব্যথার রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

(দ্য বোস্টন গ্লোব, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬)

দ্য স্পাইনাল জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘক্ষণ বুক্রে স্মার্টফোন ব্যবহারে ঘাড়ে ক্রমাগত চাপ পড়ে। এ চাপের পরিমাণ একজন ব্যক্তির মাথার ওজনের প্রায় ছয়গুণ। ফলে স্মার্টফোন আসক্তরা আক্রান্ত হচ্ছে 'টেক্সট নেক' নামক ঘাড়ব্যথা।

আবার আমেরিকার ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হওয়া, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কারণও হচ্ছে দীর্ঘসময় ইলেকট্রনিক ডিভাইসের স্ক্রিনের দিকে বুক্রে থাকা। (নিউইয়র্ক টাইমস, ২৫ জানুয়ারি ২০১৮)

সচেতন হওয়ার দায়িত্ব আপনার

একজন সাধারণ ব্যবহারকারীও দিনে অন্তত দেড়শ বার স্মার্টফোনের মেসেজ বা নোটিফিকেশন চেক করেন। শুধু তা-ই নয়, স্মার্টফোনের স্ক্রিন টাচ করে দিনে অন্তত দু-হাজার বার।

(দ্য গার্ডিয়ান, ১১ নভেম্বর ২০১৭)

প্রিয় পাঠক, ভার্চুয়াল জগতের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সত্যটা তো জানলেন। এবার সচেতন হওয়ার পালা। এ দায়িত্ব একান্তই আপনার।



প্রযুক্তি যেন সর্বনাশের বাহন না হয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

মোবাইল ফোন জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হওয়া ভালো না। আজকাল ফেসবুক-গেমস ইত্যাদি নিয়েই সময় কাটায় সবাই।

পরিবারে কেউ কারো সাথে কিছু শেয়ার করতে চায় না। এতে একদিকে যেমন পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে, অন্যদিকে ছেলেমেয়েরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলকে সচেতন হতে হবে।

ইতিবাচকতা ও মানবকল্যাণে লাগানোর মধ্য দিয়েই প্রযুক্তির সার্থকতা নিহিত। এ প্রযুক্তি যেন সর্বনাশের বাহন না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

[খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের নির্বাচিত অংশ, ৪ এপ্রিল ২০১৮]

ফেসবুক নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

অধিকাংশ মানুষ বিশেষত তরুণরা এখন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। আজ পরিবারগুলোও বিচ্ছিন্নতাবোধের নির্মম শিকার।

একটা সময়

সামাজিক-সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানগুলো ছিল মানুষে মানুষে মিলনের কার্যকর ক্ষেত্র। যেমন : গ্রন্থাগারে যাওয়া, গান-আবৃত্তি-নাটকে সবাই মিলে অংশ নেয়া, একসাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসবের প্রায় কিছুই এখন নেই। এর প্রতিকারের জন্যে চাই সামাজিক যোগাযোগ। ফেসবুকের যোগাযোগ নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ।

[শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যে আসক্তির কারণে কমে যাচ্ছে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা

অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা



এখনকার বাচ্চারা অনেক রাত করে ঘুমাতে যায়। রাত জেগে টিভি দেখাটা সে শিখছে বাবা-মা ও পরিবারের বড়দের কাছ থেকে। কম ঘুমের ফলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা কমে

যাচ্ছে। এতে বাড়ছে মেদস্থূলতা, চোখ-কানেরও ক্ষতি হচ্ছে। লেখাপড়াতেও তাদের মনোযোগ কমে যাচ্ছে। স্মার্টফোনসহ এ ধরনের সকল প্রযুক্তিপণ্যের ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

উপদেশ নয়, শিশু চায় দৃষ্টান্ত

আবুল মোমেন

শিশুদের নিয়ে ৪১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে

বলতে পারি-সরাসরি উপদেশ দিলে শিশু কিছু শেখে না। শিশু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ, সে চায় দৃষ্টান্ত। শিশু যে-রকম বড়দের জুতা পরে, শাড়ি পরে, স্বভাবটাও সে বড়দের কাছ থেকেই আয়ত্ত করে।

মা-বাবা বগড়া করবেন আর আশা করবেন সন্তান শান্তশিষ্ট হবে, যৌক্তিক আচরণ করবে, এটা হবে না। দৃষ্টান্ত দিতে হবে তার সামনে, যেন সে বুঝতে পারে কোনটা সত্য, কোনটা গ্রহণযোগ্য।

[কবি, লেখক ও কলামিস্ট। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]



তরুণদের ২৪ ঘণ্টাই আসক্ত করে রাখছে স্মার্টফোন

অধ্যাপক ডা. জহির উদ্দিন আহমাদ

মাদকাসক্তরা

সাধারণত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে মাদক গ্রহণ করে। কিন্তু স্মার্টফোন-ইন্টারনেট-ফেসবুক আসক্তি ২৪ ঘণ্টাই মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। এতে আসক্তরা কর্মক্ষেত্রে, খাবার টেবিলে, এমনকি টয়লেটে গিয়েও স্মার্টফোন চালাতে থাকে।

আমি মনে করি, ১৮ বছর বয়সের আগে কেউ স্মার্টফোন পেলে এর অপব্যবহার বেশি হবে। এসব থেকে বাঁচতে হলে সন্তানকে ধর্মের শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরিবারে নৈতিক শিক্ষা শুরু করতে হবে। এছাড়াও মেডিটেশন চর্চা তরুণ প্রজন্মকে ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে।

[বিভাগীয় প্রধান, মানসিক ও স্নায়ুরোগ বিভাগ, শাহাব উদ্দিন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]



স্মার্টফোন-ফেসবুক আসক্তিতে মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

স্মার্টফোন ও ফেসবুক আসক্তি তরুণ প্রজন্মের মস্তিষ্কের ক্ষতি করে চলেছে। এতে তাদের মানসিক বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। আমি মনে করি, অন্যান্য

রোগের মতো এসবে

আসক্তিও এক ধরনের রোগ, যার চিকিৎসা প্রয়োজন।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কোয়ান্টাম রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন]



আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, কিন্তু সচেতনতা বাড়ে নি

অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক

আগে জীবনে ফেসবুক ছিল না, তবে শান্তি ছিল। এখন ফেসবুক না দেখে আমরা দুদণ্ড শান্তিতে বসতে পারি না-কে কার বদনাম করল, তার উত্তর না দিলে রাতে আমাদের ঘুম পর্যন্ত আসতে চায় না! এভাবে নিজেদের শান্তি নষ্ট করছি আমরা। সমাজে বৈরিতা বাড়ছে, প্রতারণা বাড়ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে। আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, সচেতনতা বাড়ে নি। এক ধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানবিক গুণগুলো।

[মনোচিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]



যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম

সারাদিন যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে করতে যে মানুষ একেবারে যন্ত্রের বশীভূত হয়ে গেছে, তাকে যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ মহাকাশে যাচ্ছে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে। কিন্তু পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নৃশংসতা লোভ ঘৃণা যুদ্ধ ও গণহত্যা! কমছে মমত্ববোধ ও সম্প্রীতি। তাই এ কালে আমাদের অর্জন অনেক-এটা সত্যি, কিন্তু বিসর্জনও কম নয়।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনতত্ত্বের অধ্যাপক ও লেখক। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]





ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো

আসাদুজ্জামান নূর

আমার বাড়ির কাছেই একটা স্কুল আছে। রোজ সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, অনিচ্ছুক বাচ্চাগুলোকে মায়েরা টানতে টানতে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন। অত সকালে তো কারো স্কুলে যেতে ইচ্ছা করে না, আবার পিঠে বইয়ের ব্যাগটাও এত ভারী যে, বাচ্চারা সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। স্কুলটা একটা তিনতলা বাড়ি-ওখানে না আছে কোনো মাঠ, না আছে কোনো খেলাধুলার ব্যবস্থা।

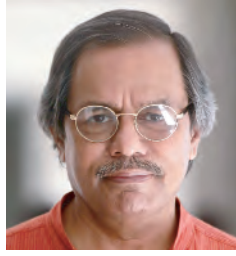
ক্লাস-হোমওয়ার্ক-কার্টুন, এখন এই হলো একটা শিশুর জীবন। ওর জীবনে নদী ফুল আকাশ পাখি কিছুই নেই। মা-বাবার সঙ্গেও যে তার খুব একটা কথাবার্তা হয়, তা-ও না। মা-বাবা কেন, আজকাল তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই কথা হয় না। সবাই টিভি-সিরিয়াল আর খেলার চ্যানেল দেখায় ব্যস্ত। এভাবে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো।

কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে কেবল ক্লাসের বই পড়ালে হবে না, তার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ তার হৃদয়ে যে আবেগ আছে তা ভুল পথে পরিচালিত হলে মানুষের জন্ম না হয়ে অমানুষের জন্ম হতে পারে! কিন্তু আমরা তো দানবের সমাজ গড়তে চাই না। আমরা একটি মানবিক সমাজ গড়তে চাই।

[কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন বরণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর]

গ্যাং কালচার শেখায় গেমস

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম



বর্তমান পরিস্থিতির দায় প্রথমত পরিবারের, দ্বিতীয়ত শিক্ষাব্যবস্থার। পরিবারগুলোর চিন্তা এখন বৈষয়িক উন্নতিকেন্দ্রিক। এতে করে দুর্নীতির বিশাল বিস্তার ঘটেছে এবং

পরিবারগুলো নৈতিক অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে। এর একটা প্রভাব শিশু-কিশোরদের ওপর পড়ছে। সনদনির্ভর লেখাপড়া শিশুদের বিনোদন বা অবসর দিতে পারে না। তারা গেমস খেলে বা ফেসবুক ব্যবহার করে। গেমস গ্যাং কালচার শেখায়, খেলার মাঠে দলের যে ধারণা তৈরি হয় তা শেখায় না।

[৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ 'নৃশংসতার চর্চা বাস্তবে, ভার্য্যাল জগতে' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক প্রথম আলোতে। সম্প্রতি ঢাকার উত্তরায় কিশোরদের গ্যাং কালচার-এর দৌরাভা এবং নৃশংসতার প্রসঙ্গে একথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম]

১৬ বছর বয়সের আগে মোবাইল ফোন ব্যবহার নয়

অধ্যাপক ড. প্রাণ গোপাল দত্ত



মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার শুধু বিপজ্জনক নয়, এর চেয়েও বেশি কিছু। মোবাইলে ১৫ মিনিট কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বাড়ে, শিশুদের

ক্ষেত্রে আরো বেশি। তাই ১৬ বছর বয়সের নিচে কোনোভাবেই মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়।

দেশে এখন থাইরয়েড ক্যান্সার, প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ ও বক্ষ্যাত্ম আগের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এর সম্ভাব্য প্রধান কারণ লোককালে অনিরাপদ উচ্চতায় মোবাইল ফোনের টাওয়ার স্থাপন এবং মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

[বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রখ্যাত নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

সন্তানকে প্রযুক্তিপণ্য দেয়ার আগে শতবার চিন্তা করুন

অধ্যাপক ডা. মনীষা ব্যানার্জী



বর্তমানে অধিকাংশ মা-বাবাই শিশুকে ইউটিউবে কোনো ভিডিও দেখিয়ে খাবার খাওয়ান। এতে করে শিশুটি কী খাচ্ছে, খাবারটির স্বাদ-গন্ধ কেমন, রঙের তফাৎ

কতটা-কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সাধারণত শিশু খাবার মুখে নিয়ে প্রথমেই এর স্বাদ বোঝার চেষ্টা করে। পাকস্থলী এবং হজম প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সব অর্গান এসময় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনমতো পাচক রস নিঃসরণ করে। ফলে খাবার সঠিকভাবে হজম হয়।

অথচ শিশুটি ভিডিও দেখে খেতে অভ্যস্ত হলে তার মনোযোগ থাকে টিভি বা স্মার্টফোনের দিকে, খাবারের দিকে নয়। এভাবে চলতে থাকলে তার হজম প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে দুর্বল হয়ে যায়। সন্তানকে কোনো প্রযুক্তিপণ্য দেয়ার আগে অভিভাবকদের শতবার চিন্তা করতে হবে, এর আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, নবজাতক বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ



বর্তমানে মোবাইলসহ অন্যান্য গ্যাজেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। স্মার্টফোন আর এ

ধরনের ডিভাইসগুলোর কারণে ক্রমেই চিন্তাভাবনা করার সামর্থ্য আমরা হারিয়ে ফেলছি।

আমরা যদি কায়িক পরিশ্রম না করি, দৌড়াদৌড়ি না করি তাহলে হাত-পায়ের পেশি সবল হবে না। তেমনি আমরা যদি চিন্তা না করি, তাহলে মস্তিষ্কও সবল হবে না। আমরা যদি মোবাইলে কথা বলার ব্যস্ত থাকি, তাহলে চিন্তাশক্তি কখনো বিকশিত হবে না।

বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, দেখা করা, অনুভূতির আদান-প্রদান, সবকিছুই এখন মোবাইলে আর ইন্টারনেটে। এগুলো অর্থেরও অপচয়। এ যুগে তরুণদের অনেকের মধ্যেই নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। তাই স্মার্টফোনসহ প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

[শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

আধুনিক গ্যাজেট ব্যবহার শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের অন্তরায়

অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার



নবজাতকের মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ঘটে। আর এভাবেই তার মস্তিষ্ক বিকশিত হয়। যোগাযোগের সুবিধার্থে শিশুর মস্তিষ্কে প্রতি সেকেন্ডে তৈরি হয় প্রায় ৭০০টি সিন্যাপস। এ পুরো প্রক্রিয়াটির ফলাফল ভালো না মন্দ হবে, তা নির্ভর করে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ওপর।

তাই শিশুর সঠিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজন পরিবেশের যথাযথ উদ্দীপনা ও সাড়া দেয়ার সুযোগ। যেমন : শিশু যখন কিছু নিয়ে প্রশ্ন করে বা কৌতূহলী হয় তখন পরিবারের সদস্যরা সেটির সাথে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু টিভি, মোবাইল ফোন, ট্যাব শিশুকে একতরফা কিছু উদ্দীপনা দিতে থাকে—যেখানে শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখানোর বা ভাবের আদান-প্রদানের কোনো সুযোগ

নেই। এটি তার মস্তিষ্কের সূচু বিকাশের অন্তরায়। এতে শিশুর মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও নবজাতক ইউনিটের প্রধান, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

আসক্তি মুক্তির অভিজ্ঞতা

আমি আসক্ত নই, তাই দৃঢ়তার সাথে সন্তানদের বলতে পারি

আমার ছেলে এখন কলেজে পড়ে। সে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় ফেসবুক ও ভার্চুয়াল গেম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকত, পরিবারের কারো সাথে সেভাবে কথাও বলত না। ধীরে ধীরে তার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। একসময় লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া শুরু করল। কিছু বললে রাগ করত, মারমুখী হয়ে যেত।

ছেলের এ পরিবর্তন আমাকে খুব কষ্ট দিত, দুর্গ্গস্তাও করতাম। এর মধ্যে কোয়ান্টামের এক প্রোগ্রামে গুরুজীর আলোচনায় অটোসাজেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানলাম। I can I will এই অটোসাজেশনটি চর্চা করে লেখাপড়ায় সাফল্য পেয়েছে, এমন দুই বোনের ঘটনা শুনে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হলাম সেদিন। মনে হলো, ছেলেকে আবার সুস্থ-সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে আনতে হলে আমাকেও এ চর্চাগুলো করতে হবে ও প্রো-একটিভ হতে হবে।

আমি প্রতিদিন ঘুমানোর সময় ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম, ভালো ভালো কথা বলতাম, কোরআন পড়ে শোনাতাম, সবসময় I can I will বলতে উদ্বুদ্ধ করতাম। ছেলের জন্যে নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দানের টাকা রাখতাম। সাধ্যমতো সদকা হিলিংয়ে নাম দেয়া ও কোরআন মর্মবাণী বিতরণ চলতে থাকল। আমি প্রতি শুক্রবার সপরিবারে সাদাকায়নে যেতাম। সন্তানকে নামাজ ও মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করতাম।

ছেলের সাথে কখনো রাগারাগি বা ঝগড়ায যেতাম না, কৌশল অবলম্বন করতাম। কোনো অন্যায় করে সে ধরা পড়লে এবং অনুতপ্ত হলে কঠোর না হয়ে তাকে শোধরানোর সুযোগ দিয়েছি। ভালো অভ্যাসগুলো আয়ত্ত করার প্রশংসা করেছি।

ভার্চুয়াল ভাইরাস মুক্ত হতে সম্প্রতি উদ্যোগী হতে শুরু করেছেন চারপাশের সচেতন মানুষ। ব্যক্তিভেদে আসক্তির মাত্রা ও ভোগান্তি যেমন আলাদা, তেমনি বৈচিত্র্যময় একেকজনের আসক্তি মুক্তির পদক্ষেপ। এ পথে কখনো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মা-বাবা, পরিবারের সদস্যরা; কখনো শ্রোতের বিপরীতে উদ্যোগী হতে হয়েছে নিজেকেই। ভার্চুয়াল ভাইরাস নামের প্রবল এ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, এমনই কয়েকজন কোয়ান্টাম সদস্য জানিয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমানে আমার ছেলে ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত এবং সে তার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে পেরেছে। লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কী কী করতে হবে তা সে পড়ার টেবিলের সামনে বোর্ডে লিখে রেখেছে। সারাদিনের একটি রুটিন তৈরি করেছে এবং তা অনুসরণ করছে।

সন্তানকে ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত করতে আমার দেড় বছর সময় লেগেছে। আর এ কাজটি সহজ হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমত, কোয়ান্টামের আত্ম উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজে আমি যুক্ত থেকেছি। ফলে সবসময় বিশ্বাস করতে পেরেছি—আমি পারব। দ্বিতীয়ত, টিভি সিরিয়াল, ফেসবুক, আড্ডা—এ ধরনের কোনো আসক্তি আমার নেই। এজন্যে সন্তানদেরও আমি ভালো কাজের কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি। কোয়ান্টামকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্যে।

সন্তানদের ফেসবুক থেকে দূরে রাখতে কুশলী হয়েছি

বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজন আছে ভেবেই বাসায় ইন্টারনেট সংযোগ নিয়েছিলাম। সন্তানরা কম্পিউটার নিয়ে প্রায় সারাদিন পড়ে থাকছে দেখেও আমি সেভাবে গুরুত্ব দেই নি। পরবর্তীতে কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে জানতে পারলাম এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে। সচেতন হলাম এবং বুঝতে পারলাম বাসায় ইন্টারনেটের ব্যবহার বেশি হচ্ছে।

একদিন বাসায় ফিরে বেশ কঠোরভাবে বললাম যে, এ বাসায় হয় ইন্টারনেট থাকবে বা আমি থাকব। খুবই বিস্মিত হলাম যখন আমার বাচ্চারা বলল—‘ইন্টারনেট লাইন থাকবে, তুমি বাসা থেকে বের হয়ে যাও।’ বুঝলাম, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং পরিবারের সাথে লড়াই করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামি। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলাম, জোর করে সন্তানদের সাথে সুবিধা করতে পারব না, আমাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

সমস্যা নিয়ে দুর্গ্গস্তা না করে আমি সমাধানের দিকে মনোযোগী হলাম। প্রথমেই যোগাযোগ করলাম আমাদের ইন্টারনেট সংযোগ অপারেটরদের সাথে। তাদেরকে বললাম, আমার বাসায় ইন্টারনেটের স্পিড কমিয়ে দিতে। একই পরিমাণ বিল দিতে আমি রাজি, কিন্তু ফেসবুক-ইউটিউব চালানোর মতো স্পিড যেন না থাকে।

এ কৌশল অবলম্বন করার পর দেখলাম, বাচ্চারা ইন্টারনেটে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। দুই মাসের মধ্যে তাদের অপ্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার কমে গেল।

ভার্চুয়াল ভাইরাস বুলেটিন, ফোল্ডার, স্টিকার বিতরণ করার ও ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতা লিখে পাঠান—
bulletin@quantummethord.org.bd

এখন আমি সময়কে কাজে লাগাতে পারছি

সামাজিকতা রক্ষার নাম করে আমি সারাদিন ফেসবুকিং করতাম। এটা কীভাবে একজন সামাজিক মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে, সেটা আমি বুঝতাম না। তবে আমি বলব, আমার এ অভ্যাসের ক্ষেত্রে মা-বাবার মৌন উৎসাহ ছিল। সমাজের অধিকাংশ মা-বাবার মতো তাদেরও ধারণা ছিল, ছেলে বাইরে গিয়ে অন্যদের সাথে মিশে খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং মোবাইল-কম্পিউটার নিয়ে ঘরে থাকুক। সন্তান চোখের সামনে আছে, তার মানেই ভালো আছে।

এভাবেই ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়া আমার জীবনের অংশ হয়ে গেল। ফেসবুকে সময় নষ্টের বিষয়টা সবসময় আমার চোখ এড়িয়ে যেত।

যখন কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে অংশ নিতে শুরু করলাম, দেখতাম কোয়ান্টাম খুব জোর গলায় বলছে ভার্চুয়াল ভাইরাসের ক্ষতিকর দিক নিয়ে। ফেসবুক-ইন্টারনেট কীভাবে আমাদের চিন্তাশক্তিকে ব্যাহত করছে, মূল্যবান সময় নষ্ট করছে, সে-সম্পর্কে কোয়ান্টামের অনেক লেখা পড়লাম। তারা বলছে ভার্চুয়াল জগৎ থেকে দূরে থাকলে আপনি ভালো থাকবেন, জীবন সুন্দর হবে।

প্রথমদিকে এ কথাগুলো আমাকে সেভাবে প্রভাবিত করে নি। কখনো কখনো ব্যবহার কমিয়েছি কিন্তু ফেসবুক পুরোপুরি বন্ধ করি নি। কিন্তু এবছর

ভার্চুয়াল ভাইরাস স্টিকার ক্যাম্পেইনের সময় আমার মনে হলো, একবার চেষ্টা করেই দেখি। ফেসবুকের বন্ধদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তাদেরকে বললাম, আমাকে ফেসবুকে পাবে না। খুব জরুরি হলে ফোন করবে।

ফেসবুক না থাকাতেই বরং
আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুদের সাথে
আমার সম্পর্ক ভালো হতে
শুরু করেছে।

ফেসবুক বন্ধ করার পর প্রথমদিন আমার সাধারণভাবেই কেটে গেল, করার কিছু পাচ্ছিলাম না বলে বই পড়তে শুরু করলাম। রাতে দীর্ঘসময় ফেসবুকে বসে থাকা নেই, তাই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন অবাক হয়ে দেখলাম, আমি ভোর ৬টায় ঘুম থেকে উঠে গেছি এবং অনেকদিন পর ফজরের নামাজ পড়লাম।

এভাবে তিন দিন যেতে না যেতেই আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা হতে লাগল ফেসবুকে লগ ইন করার—‘আমার বন্ধুরা কী করছে? তারা কোথায় বেড়াতে গেল কিনা? কারো নতুন কোনো খবর আছে কিনা? আড্ডার নতুন টপিকটা মিস করলাম নাকি? নিউজ ফিডের

নিউজগুলো মিস হয়ে যাচ্ছে! অন্যদের সাথে আমার সম্পর্কগুলো তো হালকা হয়ে যাচ্ছে।’ মাথায় এমন নানা চিন্তা ঘুরতে লাগল।

আবার একইসাথে বিপরীত চিন্তাও আসতে লাগল। কেন আমি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারছি না? ফেসবুক কি আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ? একসময় উপলব্ধি করলাম আমি আসলে আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। যেভাবে মাদক নিয়ন্ত্রণ করে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্কে, ঠিক সেভাবে ফেসবুকও নিয়ন্ত্রণ করছে আমাকে। তখন আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠলাম আমি।

ফেসবুক বন্ধ করার পর আমার জীবন অনেক সুশৃঙ্খল হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় যেসব কাজ আমি করব করব বলে ভাবতাম কিন্তু করা হতো না, এখন অনায়েসেই সে কাজগুলো করতে পারছি। প্রতিদিন ঠিকমতো খাওয়া, পড়ালেখা, পর্যাপ্ত ঘুম, মেডিটেশন, ব্যায়াম, পরিবারের কাজে সহযোগিতা করা সহ অনেক কিছু করা যায়। এখন আমি সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ফেসবুক না থাকাতেই বরং বন্ধ ও আত্মীয়-পরিজনদের সাথে আমার সম্পর্ক আরো ভালো হতে শুরু করেছে। আর এসব সম্ভব হলো ছোট্ট একটি সিদ্ধান্তের কারণে—আমি আর ফেসবুক ব্যবহার করব না।

মনোযোগ লুটের অর্থনীতি

আপনার স্মার্টফোনটির কল্যাণে গুগল ম্যাপের মতো কোম্পানিগুলো খোঁজ রাখে আপনি কোন রেষ্টোরায়ে খেতে যান, কোন শপিং মলের কোন দোকান থেকে নিয়মিত কেনাকাটা করেন। আবার ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো জানে, আপনার বন্ধু কারা, তাদের সাথে কোন বিষয়ে কথা বলতে আপনি আগ্রহী, কোন ওয়েবসাইট থেকে আপনার আড্ডার রসদ পান।

একজনের ওয়েবসাইট ভিজিটের তথ্য মিলিয়ে তার দৈনন্দিন অভ্যাসের প্রোফাইল তৈরি করা টেক কোম্পানিগুলোর জন্যে খুবই সহজ ব্যাপার। যেহেতু দৈনন্দিন কাজের বেশিরভাগই আমরা করি অভ্যাসচক্রের অংশ হিসেবে, তাই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা না হয়েও বলতে পারে, কী হতে পারে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড!

ফেক ব্লগ ও ওয়েবসাইট তৈরি করে তারা বাধ্যও করতে পারে ব্যক্তিকে তাদের বেছে দেয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে। কীভাবে? যেমন, চ্যাটিং-এর সময় বন্ধুকে আপনি জানালেন ইদানীং বেশ দুর্বল লাগে। এরপর হঠাৎ দেখলেন, আপনার নিউজফিডে দুধের চেয়ে শক্তিদায়ক খাবারের বিজ্ঞাপন আসছে। প্যাকেটজাত খাবারের চেয়ে দুধ যে স্বাস্থ্যকর, তা আপনি জানেন। কিন্তু কয়েকদিন বিজ্ঞাপন দেখার পর আগ্রহবশত ইন্টারনেটে সেরা দশ স্বাস্থ্য-বিষয়ক ওয়েবসাইট খুঁজে বের করলেন। এরপর সেরা দুটো ওয়েবসাইটে সেই খাবারের গুণাগুণ পড়ে নেটো কিনলেনও।

আপনি মনে করছেন, আপনি খাবারটি কিনছেন

দেখে-শুনে। কিন্তু সত্য হলো, আপনি কিনছেন টেক কোম্পানিগুলোর সাজানো ফাঁদে পা দিয়ে।

ঠিক এভাবেই কেমব্রিজ এনালিটিকা, ফেসবুক ও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে পণ্য কিনতে; এমনকি ভোটাধিকার প্রয়োগের বেলায়ও। যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ কোটি ভোটারকেও তারা প্রভাবিত করেছে এভাবেই। ফেক ব্লগ তৈরি করে, ফেক আইডি থেকে গুণকীর্তন করে প্রতারিত করেছে ভোটারদের সিদ্ধান্ত নিতে।

কারণ ফেসবুক, ইউটিউব, ম্যাপচ্যাট, টুইটার প্রভৃতি কোম্পানিগুলোর আয়ের উৎস ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর দেয়া বিজ্ঞাপন। যত বেশি বাড়বে ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং যত বেশি সময় মানুষ কাটাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, তত বেশি বিজ্ঞাপন সে পাবে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে।

গুগলের সাবেক ডিজাইন নীতি-নির্ধারক ক্রিস্টান হ্যারিস একে ব্যাখ্যা করেছেন মনোযোগ লুটের অর্থনীতি হিসেবে। ২০১৭ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এ কৌশল প্রয়োগ করে বিজ্ঞাপন থেকে আয় করেছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকা মাত্র!

সিএনএন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকানরা দিনে গড়ে প্রায় ১১ ঘণ্টা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে ব্যয় করে। অর্থাৎ ঘুম বা কাজের চেয়ে বেশি সময় তারা স্টেটে থাকে ডিভাইসের স্ক্রিনের সাথে। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নয় পুঁজিপতিরা।

বিনোদন প্রতিষ্ঠান নেটফ্লিক্স-এর প্রধান নির্বাহী



রিড হ্যাস্টিংস বলেছেন, ‘ফেসবুক বা ইউটিউব নয়। আমাদের প্রধান প্রতিযোগী মানুষের ঘুম।’ বর্তমানে প্রতি তিন জনে একজন আমেরিকান অনিদ্রায় ভোগে, তারপরও এমন বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায়—এ প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা সেবা (!) দিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র : বিবিসি, ৩০ মার্চ ২০১৮ ও এইচবিও-তে প্রকাশিত ক্রিস্টান হ্যারিসের সাক্ষাৎকার, ২ জুন ২০১৭

আপনি কতটা আসক্ত?

ড. কিম্বারলি ইয়াং। ইন্টারনেট আসক্তি বিষয়ে বিশ্বের প্রথমসারির একজন বিশেষজ্ঞ। ১৯৯৫ সালে তিনি আমেরিকায় সেন্টার ফর ইন্টারনেট অ্যাডিকশন প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্ভাবিত প্রশ্নমালা অনুসারে জেনে নিন ইন্টারনেটে আপনি কতটা আসক্ত—

উত্তর	না	কদাচিৎ	মাঝে মাঝে	প্রায়ই	সবসময়
স্কের	১	২	৩	৪	৫

- কখনো কি মনে হয় প্রয়োজনের বেশি সময় ইন্টারনেটে ব্যয় করেন?
- পরিবারকে সময় দেয়ার চেয়ে ইন্টারনেট চালাতে বেশি পছন্দ করেন?
- কাজ বা পড়াশোনা কি ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে প্রায়ই বিঘ্নিত হয়?
- ‘ইন্টারনেটে এতক্ষণ কী করেন?’ এর উত্তরে কি সত্য বলতে পারেন?
- দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার চেয়ে কি সোশ্যাল মিডিয়ায় অলস সময় কাটাতে ভালো লাগে?
- অফলাইন বা কাজের সময় কি প্রায়ই মনে হয়, কখন অনলাইন হবো?
- রাত জেগে ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে ক্লাসে বা অফিসে কি প্রায়ই আপনার ঘুম পায় বা ক্লান্তিবোধ করেন?
- সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা অবস্থায় কি মনে হয় ‘আর মাত্র কয়েক মিনিট’ কিন্তু বের হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়?

স্কের ৮-১৮ : স্বাভাবিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী।

স্কের ১৯-২৯ : ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহার মাঝে মাঝে আপনার স্বাভাবিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটায়। এখনই সময় সচেতন হওয়ার।

স্কের ৩০-৪০ : আপনি আসক্ত। ইন্টারনেট আপনার জীবন থেকে কী নিচ্ছে, তা ভালোভাবে পর্যালোচনা করুন। বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করুন, ব্যবহারের মাত্রা ঠিক করুন।

ওদের পৌষমাস আমাদের সর্বনাশ

কোটি কোটি শিশু-কিশোর-তরুণের মস্তিষ্কের চূড়ান্ত সর্বনাশ করলেও প্রযুক্তি-উদ্ভাবকরা ঠিকই আগলে রাখেন নিজ সন্তানদের। অ্যাপলের কর্তৃপক্ষ স্টিভ জবস কখনো সন্তানদের আইপ্যাড ব্যবহার করতে দেন নি। ফেসবুকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ পালিহাপিতিয়া সাত বছর ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর গুরুদায়িত্বে থাকলেও নিজে ফেসবুক ব্যবহার করেন না। তিনি এ-ও বলেছেন, My kids are not allowed to use that shit.

ফেসবুক পোস্ট/ ছবিতে ‘লাইক’ পাওয়ার জন্যে মানুষ কত উদ্ভট কাণ্ডই না করে! এই লাইকের উদ্ভাবক জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজের ফোন থেকে সযত্নে লাইক বাটনটি সরিয়ে দিয়েছেন আসক্ত হয়ে পড়ার ভয়ে। টুইটারের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইও ইভান উইলিয়ামসের দুই শিশুপুত্র আইপ্যাডের জন্যে বহু আবদার করলেও তিনি নাকচ করে দেন। আইপ্যাডের বদলে ওদের তিনি কিনে দিয়েছেন কয়েকশ বই।

শৈশবেই কম্পিউটার ও স্মার্টফোন

জাতীয় যন্ত্র ব্যবহারে শিশু অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার সৃজনশীলতা, মনোযোগ ও ভাব আদান-প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। গুগল অ্যাপল ইয়াহু-র এক্সিকিউটিভরা এ সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন। তাদের কয়েকজন স্বীকার করেছেন, তেল ও জলের মতো লেখাপড়া ও কম্পিউটারও মিশ খায় না। তাই সন্তানদের এমন স্কুলে পাঠান যেখানে কম্পিউটার-স্মার্টফোন-ট্যাবের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

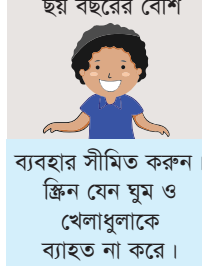
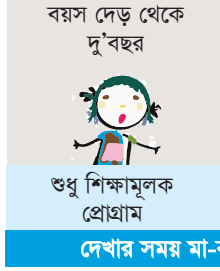
বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি সমস্যা নিয়ে বেশ চিন্তিত। তা হলো—ক্লাসরুমেও ছাত্রছাত্রীরা মোবাইলে মেসেজ চালাচালি করছে। টিফিনের বিরতিতেও খেলাধুলায় আগ্রহ নেই। আসক্তের মতোই তারা ডুবে থাকছে ভার্চুয়াল জগতে। এ সমস্যার বিহিত করতে না পেরে ফ্রান্স ২০১৮ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলে মোবাইল ফোন আনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান ২৩ ও ২৬ জানুয়ারি ২০১৮



ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার ॥ শিশুদের জন্যে গাইডলাইন

যুক্তরাষ্ট্রের শিশু বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস। ২০১৬ সালে তারা শিশুদের সুরক্ষায় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়েছে, সব বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমিত করা উচিত।



ফেসবুককে 'না' বলুন

বিশ্বজুড়ে ফেসবুকসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্জন এখন রূপ নিয়েছে গণসচেতনতায়। সম্প্রতি তথ্য-নিরাপত্তাজনিত ঘটনায় বিশ্বব্যাপী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অনেকেই তাদের ফেসবুক একাউন্ট ডিলিট করে দিচ্ছেন।

ইতোমধ্যেই রকেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স ও ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা টেসলা-র উদ্যোক্তা এলন মাস্ক ফেসবুক একাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছেন। যার প্রত্যেকটি একাউন্টে অনুসারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৬ লক্ষ। এদিকে অ্যাপল-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াক-ও ফেসবুক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। হলিউড-বলিউড তারকারাও তথ্য-নিরাপত্তার শঙ্কায় ডিলিট করছেন ফেসবুক একাউন্ট।

কারণ ফেসবুক ও ম্যাসেঞ্জারে দেয়া তথ্য বা ছবি আপনি ডিলিট করলেও তা ঠিকই সংরক্ষণ করছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, ২৩ মার্চ ২০১৮
ইউএসএ টুডে, ৯ এপ্রিল ২০১৮

আসক্তির নতুন ফাঁদ অনলাইন শপিং

অনলাইন শপিং। বিশ্বজুড়ে এটি রূপ নিয়েছে আসক্তির এক নতুন ফাঁদে। এ কেনাকাটা এখন আর প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ নেই, পৌঁছে গেছে আসক্তির পর্যায়ে। আধুনিক মানুষের ব্যস্ততাকে পূঁজি করে গড়ে উঠেছে চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন আর ঘরে বসে পণ্য পাওয়ার অভিনব উপায়। এদিকে ইন্টারনেট-প্রযুক্তিকেও এমন 'স্মার্ট' (!) করে তোলা হয়েছে যে, ওয়েবসাইট ভিজিটের ধরন দেখেই বিজ্ঞাপনদাতারা বুঝে ফেলে আপনি কী চান। স্ক্রিনের সামনে চলে আসে একের পর এক পণ্যের মনোহারী বিজ্ঞাপন।

নতুন কেনা পণ্যটির ট্যাগ না খুলেই আরেকটি পণ্যের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ক্রেতার। আর এ জন্যে দোকানেও যেতে হচ্ছে না। সাইকোলজি টুডে-র একটি রিপোর্টে (৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯) পণ্যসমূহকে অ্যালকোহল আসক্তির সাথে তুলনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানী ড. এপ্রিল বেনসন। গ্রিনপিস-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হংকংবাসী প্রতি বছর যে অতিরিক্ত পোশাক ফেলে দেয় তার পরিমাণ এক লক্ষ ১০ হাজার টন! অর্থাৎ জনপ্রতি ১৫ কেজি। এর অধিকাংশই ক্রেডিট কার্ড ও অনলাইনে কেনা এবং নিত্যন্তই চোখের ক্ষুধায়।

বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বর্তমানে এদেশে ফেসবুকসহ ওয়েবভিত্তিক অনলাইন শপ রয়েছে ১০ হাজারেরও বেশি। বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার পণ্য কেনাবেচা হচ্ছে অনলাইনে!

এ যুগে পণ্য যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মানুষের অভাববোধ। অস্বাভাবিক পণ্যপ্রীতি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। তাই অনলাইনে পণ্য যতই আপনার হাতের নাগালে থাকুক, আসক্তির কানাগলিতে ঢুকে পড়ার আগেই সচেতন হোন।

তথ্যসূত্র : ডয়েচে ভ্যালু, ১৬ মে ২০১৭
সাউথ চায়না মনিং পোস্ট, ৫ আগস্ট ২০১৭

আপনার করণীয়

বর্জন করুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বিনোদনের জন্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করবেন না। ফেসবুকসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্জন করুন।

রাত জাগার অভ্যাস ত্যাগ করুন

প্রয়োজন ছাড়া রাত্রি জাগরণ ভার্যায়াল ভাইরাসে আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। এ থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাত ১১টার পর মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার-জাতীয় সকল গ্যাজেট বন্ধ রাখুন। সন্তান সারাক্ষণই রুমের দরজা বন্ধ করে রাখছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

সন্তানের বন্ধু হোন, তাকে পরিবারের অংশ করে নিন

সন্তানকে বকাঝকা নয়, উদ্ভুদ্ধ করুন। তাকে ঘরের কাজে সম্পৃক্ত করুন। সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করুন। আসক্ত হওয়ার মতো অবসর সময় যেন সন্তানের না থাকে। ভাইবোনের সাথে শেয়ার করতে শেখান তাকে। আপনিই হোন তার প্রথম ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।

পরিবারে নৈতিকতা ও ধর্মের শাস্ত্র শিক্ষা মেনে চলুন

নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী নিয়মিত পাঠ করতে, অনুধাবনে ও অনুশীলনে তাকে উদ্ভুদ্ধ করুন। নিজেও অনুশীলন করুন।

আপনার সন্তানের রোল মডেল আপনিই

আপনার কথা নয়, সন্তান অনুসরণ করে আপনার আচরণ। আপনি ভার্যায়াল ভাইরাসে আসক্ত হলে সন্তানকে এ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। তাই

আগে নিজে ফেসবুক বর্জন করুন, সন্তানকেও এ থেকে দূরে রাখুন।

১৮'র আগে স্মার্টফোন নয়

সন্তানের আবদার মেটাতে বা স্ট্যাটাস বজায় রাখতে গিয়ে ১৮ বছর হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন কিনে দেবেন না। ঘরে শিশুরা থাকলে স্মার্ট টিভিকে না বলুন। কারণ কৌতূহলের বশে সে সহজেই ভার্যায়াল ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

মেডিটেশনকে পারিবারিক রেওয়াজে পরিণত করুন

যেসব সঙ্গ আসক্তির কানাগলিতে ঠেলে দেয়, তাদের পরিত্যাগ করুন। পরিবারের সবাই মিলে প্রতি বৃহস্পতিবার পারিবারিক মেডিটেশন করুন। সপরিবারে ফাউন্ডেশনের সাদাকায়ন, আলোকায়ন ও আলোকিত পরিবার কার্যক্রমে অংশ নিন।

এগিয়ে আসুন সৃষ্টির সেবায়

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কাজ হতাশা-বিষণ্ণতা-একাকিত্বের অনুভূতি হ্রাস করে। বাড়ায় আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা। তাই সাধ্যমতো নিবেদিত হোন সৃষ্টির সেবায়, মানুষের কল্যাণে।

প্রযুক্তিদক্ষ হোন
ভার্যায়াল ভাইরাস
থেকে বাঁচুন!

কোয়ান্টাম বুলেটিন : বর্ষবরণ সংস্করণ ১৪২৫ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/১১ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥

Phone : 9341441, 48319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025

E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd



মে ২০১৮

সৃষ্টির সেবা সংখ্যা

কোয়ান্টাম বুলেটিন



প্রধান অতিথির (মাঝে উপবিষ্ট) সাথে
ন্যূনতম ১০ বার ও ২৫ বার রক্তদানকারীদের একাংশ

সম্মাননা অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদাতারা মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন

রক্তদাতাদের নিঃস্বার্থ সেবায় বহু মুমূর্ষু মানুষের জীবন বেঁচে যাচ্ছে। আর নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়া এসব দুঃস্থ মানুষের আন্তরিক দোয়া স্রষ্টার কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়। আমি মনে করি, মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তারা। তাদের জীবন সার্থক।

৬ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া।

ন্যূনতম ১০ বার রক্তদানকারী সিলভার ডোনার, ২৫ বার দানকারী গোল্ডেন ডোনার ও ৫০ বার দানকারী প্লাটিনাম ডোনার মিলিয়ে তিন শতাধিক রক্তদাতাকে এ আয়োজনে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এ বি এম ইউনুস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, এখানে আসার পর থেকেই মনে হচ্ছে আমি একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে এসেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ব্যস্ততার কারণে আমি সবখানে যেতে পারি না, কিন্তু কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যখন আমাকে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায় তখন অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমি রাজি হয়েছি-শুধু কিছু মহৎ মানুষকে দেখার জন্যে, যারা অন্যের কল্যাণে নিয়মিত নিজের শরীরের রক্ত দান করেন।

আমি জীবনে দুয়েকবার রক্তদান করেছি, কিন্তু এখানে আজ এমন রক্তদাতাও আছেন-যারা ৫০ বারের বেশি রক্তদান করেছেন। মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কোয়ান্টাম সদস্যদের এই একাগ্রতা ও নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

তিনি আরো বলেন, আজ আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটার অভাব তা হলো, মানুষের উপকার করার মানসিকতা। সবাই এখন ছুটছে শুধু নিজের প্রয়োজন

মেটাতে। অন্যদিকে আজকালকার ছেলেমেয়েরা দিনরাত কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন নিয়ে বন্ধ ঘরে বসে থাকে। বাস করে একটা নিঃসঙ্গ জগতে। এভাবে জীবনটা শেষ করে দিচ্ছে ওরা। এদেশের অধিকাংশ মানুষই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, অথচ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার যে দিক-নির্দেশনা কোরআনে রয়েছে তা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি। ঢুকে পড়েছি অস্থির জীবনযাপনের মধ্যে।

আমাদের দেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করছে, স্বল্পোন্নত থেকে বাংলাদেশ রূপান্তরিত হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশে। ভবিষ্যতে আরো উন্নত অবস্থানে আমরা যাব। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে আমরা যদি সফল হতে না পারি, তবে আমাদের সব অর্জন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফসলও আমরা ঘরে তুলতে পারব না। কিন্তু আজ এখানে এসে এত সংখ্যক রক্তদাতাকে একসাথে দেখে মনে বিশ্বাস জাগছে-আপনাদের মধ্য দিয়েই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার একটা সুযোগ হয়তো আসবে।

এ-ছাড়াও আমি জেনেছি, রক্তদান কার্যক্রমের পাশাপাশি কোয়ান্টামের অন্যান্য কার্যক্রমও মানবকল্যাণ ও সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত। তাই আমি এ প্রতিষ্ঠানের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি ও বহুল বিস্তৃতি কামনা করি। আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এমন একটি আলোর সন্ধান দেয়ার জন্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী। সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন, গত সিকি শতাব্দী ধরে কোয়ান্টাম যে মানবিক মহাসমাজের স্বপ্ন দেখে চলেছে সেই দরদী সমাজের সমর্মিতার শুরু স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের মধ্য দিয়ে। কোয়ান্টাম পরিবারের পাশাপাশি সারা জাতিই রক্তদাতাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

উল্লেখ্য, এ অনুষ্ঠানে প্রত্যেক রক্তদাতাকে বিশেষ আইডি কার্ড, সার্টিফিকেট, সুদৃশ্য ক্রেস্ট ও মেডেল প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়।

আমি পারি আমি করব আমার জীবন আমি গড়ব

মানুষকে মনোজাগতিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে সিকি শতাব্দী আগে কোয়ান্টামের যাত্রা শুরু হয়। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে মানুষ এসেছেন নানাবিধ রোগ নিয়ে, হয়েছেন সুস্থ। এসেছেন হতাশা নিয়ে, জেগে উঠেছেন বিশ্বাসের শক্তিতে। এসেছেন ব্যর্থতা নিয়ে, পেয়েছেন জীবন বদলের চিরায়ত সাফল্যসূত্র। মেডিটেশন চর্চা করে লাখো মানুষ অর্জন করেছেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। এমনই কয়েকজনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো—

স্মার্টফোন, বন্ধুবান্ধব আর ফেসবুকে আমি এত আসক্ত ছিলাম যে, মা-বাবা ও পরিবারের কাউকে আমার ভালো লাগত না। কোর্সে এসে আমি আমার ভুলগুলো উপলব্ধি করেছি। আর জেনেছি, মা-বাবার মতো নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীতে কেউ ভালবাসে না।

রত্না সাহা • শিক্ষার্থী, ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ

৫০ বছর ধরে মাইগ্রেন ও ৩৬ বছর ধরে অনিদ্রা রোগে ভুগছিলাম আমি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে ও মেডিটেশন চর্চা করে আমি মাইগ্রেন ও অনিদ্রা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

খান মো. নুরুল ইসলাম • চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল

১০ বছর ধরে আমার পায়ে ব্যথা। ঠিকমতো কিছুক্ষণ বসে থাকতেও আমার কষ্ট হতো। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে মেডিটেশন করার পর দীর্ঘ ১০ বছর পরে আমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছি। এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া।

মনিরা রহমান • অফিস ইনচার্জ, ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্সপিরেশন, নেছারাবাদ

কোর্স করে আমরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আগের চেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারছি। আগে কোনো বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য হলে সেটা মতবিরোধে গিয়ে শেষ হতো, এখন সেটা মতৈক্যে গিয়ে পৌঁছায়। সব মিলিয়ে আমরা এখন সুখী পরিবার।

এ কে এম মাহবুবুল হক • ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মেটলাইফ

আমার হার্টে চারটি রিং লাগানো আছে। প্রতিদিন ১৪-১৫টি করে ওষুধ খেতে হতো। সহকর্মীর মাধ্যমে কোয়ান্টামের খোঁজ পেয়ে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা শুরু করি। কোর্সে আসার আগপর্যন্ত ২-৩টি ওষুধ খেতাম। এখন সেগুলোও আর খাচ্ছি না। ওষুধ ছাড়াই ভালো আছি।

মো. আবু বকর সিদ্দিক • চাকরিজীবী

পাঁচ বছর ধরে আমার প্রচণ্ড এসিডিটির সমস্যা ছিল। পকেটে সবসময় ওষুধ রাখতে হতো। মেডিটেশন করে আমার এসিডিটির সমস্যা দূর হয়েছে। আমি এখন সুস্থ আছি, ভালো আছি।

বিবেক বিশ্বাস • প্রভাষক, যশোর সরকারি সিটি কলেজ

মেডিটেশন করে আমার এনার্জি লেভেল বেড়েছে এবং বেশ প্রাণবন্ত অনুভব করছি। এখন থেকে আমি রোগীদের ওষুধ-পথ্যের পাশাপাশি মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করতে চাই। আমার বিশ্বাস, এতে তাদের নিরাময় দ্রুত হবে।

ডা. রাণী বিলকিস • সহকারী সার্জন, কেন্দ্রীয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নেত্রকোণা

অনার্সে ফলাফল আশানুরূপ হলো না। চাকরির পরীক্ষাতেও ব্যর্থ হলাম। মনে হচ্ছিল, আমার দ্বারা কিছুই হবে না। কোর্স করার পর আমার হতাশা ও নেতিবাচক চিন্তা দূর হয়ে গেছে। আমি এখন জানি ব্যর্থতার মধ্যবর্তী থাকে সাফল্যের বীজ। এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস আমি ফিরে পেয়েছি।

ইসমত জাহান • শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমি একটা রোগে ভুগছিলাম। আমার সবসময় মনে হতো নাকে ও মুখে ময়লা জমে আছে। আমি ক্রমাগত থুথু ফেলতাম। কোর্সে মেডিটেশন করে এ রোগ থেকে মুক্ত হয়েছি।

রুবিলা মনির • ব্যবসায়ী

সব ধর্মের সব মানুষের

quantummethord.org.bd

পণ্য আর প্রযুক্তির ভিড়ে আধুনিক মানুষকে প্রশান্তির সন্ধান দিতেই কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটের কর্মপ্রয়াস। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে-কোনো সময় কোয়ান্টাম চেতনায় নিজেকে আলোকিত করার এক অনন্য সুযোগ এই ওয়েবসাইট।

বর্তমানে ইংরেজি ও বাংলায় যোগ-মেডিটেশনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট এটি। নতুনরূপে বিনামূল্যে ডেস্কটপ অ্যাপ, উইশ বোর্ড এবং নতুন এন্ড্রয়েড অ্যাপ, কোয়ান্টাম ভিডিও, কোয়ান্টাম মেডিটেশন, আল কোরআন ও বাংলা মর্মবাণী সংযোজনের মাধ্যমে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট এগিয়ে গেছে আরো একধাপ। অ্যাপগুলো পাওয়া যাবে পুরোপুরি ফ্রি।

প্রযুক্তির অপব্যবহারের আসক্তি থেকে মুক্ত করে বর্তমান প্রজন্মকে কল্যাণকর আধুনিক মানুষে রূপান্তর করাই এ ওয়েবসাইটের লক্ষ্য।



Video



Meditation



Wish



সংগ্রহ করুন কোয়ান্টাম প্রকাশনা

সফল জীবন গড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সবার জন্যে সহজলভ্য করেছে কোয়ান্টাম প্রকাশনা। ডিজিট করুন publication.quantummethord.org.bd এবং ফ্রি ডাউনলোড করুন মেডিটেশন, বই, স্মারক ইত্যাদি। নিয়মিত চর্চায় আপনি লাভ করবেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন।



বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পুষ্টিসেবা পেয়েছেন ৫,৮৬২ জন প্রসূতি মা

গর্ভবতী মায়ের সুস্থতা ও শিশুর নিরাপদ জন্মানকে নিশ্চিত করতে ২০০৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শুরু হয় মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম। এ পর্যন্ত ৫,৮৬২ জন মা মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় পেয়েছেন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, জন্ম দিয়েছেন সুস্থ-সবল শিশু।

গর্ভকালীন সময়ের তিন মাস সময় থেকে সন্তান জন্ম দেয়ার পরবর্তী ৪০ দিন পর্যন্ত মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে সেবা পেয়ে থাকেন সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত মায়েরা। এ সময় তাদের নিয়মিত চেকআপের পাশাপাশি জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও ওষুধের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এ-ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা হয় গর্ভকালীন সময়ে মা ও শিশুর যত্নের বিষয়ে।

সমৃদ্ধ দেশ গড়তে মা ও শিশু উভয়ের সুস্থতাই অপরিহার্য। এই বিশ্বাস থেকেই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সম্মুখীন দানে এক যুগ ধরে পরিচালিত হচ্ছে এ সেবামূলক কার্যক্রম।



চট্টগ্রামে মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় সেবাপ্রাপ্ত মা ও তাদের সন্তানদের একাংশ



চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন ২ লক্ষ ৮ হাজার ৬৩২ জন

গত দু-য়ুগ ধরে ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে সুবিধাবঞ্চিতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও ওষুধ দেয়া হয়। মিরপুরে গৃহকর্মীদের বিনামূল্যে নিয়মিত চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়।



খতনা সেবা পেয়েছেন ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৮৪ জন

২০০৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুরু করে খতনা কার্যক্রম। দরিদ্র শিশু-কিশোর ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে খতনার সুযোগবঞ্চিত পূর্ণবয়স্ক পুরুষরাও এ সেবা পেয়ে থাকেন।

বঞ্চিত জনপদে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প
সেবা পেয়েছেন ১৮ হাজার ২২৪ জন



৫ জানুয়ারি ২০১৮, বান্দরবান লামার কোয়ান্টামে আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা কোয়ান্টাম পরিবারের ১১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এ ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন বঞ্চিত পাহাড়ি-বাঙালি তিন সহস্রাধিক রোগী। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীদেরকে বিনামূল্যে মোট এক লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৪৩ ইউনিট ওষুধ বিতরণ করা হয়। লামায় কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ানে ২০০০ সাল থেকে নিয়মিত বিভিন্ন বয়সের পাহাড়ি-বাঙালিকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেয়া হচ্ছে।

সৃষ্টির সেবা সংখ্যা ৯ মে ২০১৮

শিক্ষা ও ক্রীড়ায় জাতীয় অঙ্গনে সাফল্য

বান্দরবানের লামায় ২০০১ সালে মাত্র সাত জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। বর্তমানে এখানে ২০টি জাতিগোষ্ঠীর ১৭ শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সকল ধর্মের শিশুরাই যার যার ধর্ম পালন করছে এবং একসাথে গড়ে উঠছে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন আলোকিত মানুষ হিসেবে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর টেবিল টেনিস দ্বৈতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা ২০১৪ চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি গ্রহণ করছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল হ্যান্ডবল টিম।



মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে বাংলাদেশ খো খো পুরুষ দল। ২০১৫ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত এসএ গেমসে অংশগ্রহণ করা এ দলের নয় জন খেলোয়াড়ই ছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ছাত্র।



গ্রীষ্মকালীন ২০১৬ ও শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭-এর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি-র কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল।

কুচকাওয়াজে পর পর চার বার প্রথম স্থান অর্জন

২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২৬ মার্চ ২০১৮ ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশের কুচকাওয়াজে টানা চতুর্থ বার প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ।





২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ কোয়ান্টাদের একাংশ

পাবলিক পরীক্ষায় সাফল্য

২০১৭ সালের পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের পাশের হার শতভাগ। পিইসি-তে ৯৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৮১ জন এ প্লাস এবং ১৪ জন এ গ্রেড পায়। জেএসসি-তে মোট ৪৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে তিন জন এ প্লাস, ৩৮ জন এ এবং আট জন এ মাইনাস লাভ করে। এসএসসি পরীক্ষার্থী ৩১ জন কোয়ান্টার মধ্যে ২৪ জন এ, পাঁচ জন এ মাইনাস এবং দুজন বি গ্রেড পায়। এইচএসসি পরীক্ষার্থী ১৪ জনের মধ্যে একজন এ প্লাস, নয় জন এ, চার জন এ মাইনাস গ্রেড অর্জন করে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল পিইসি ও জেএসসি-তে শতভাগ পাশের সাফল্য অর্জন করে।

মেধা তালিকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

২০১৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪ জন ভর্তি পরীক্ষা দেয় ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদের মধ্যে সাত জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাকি ছয় জন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এ নিয়ে পর পর চতুর্থ বারের মতো কোয়ান্টাম কসমো কলেজের তত্ত্বাবধানে ভর্তিপ্রস্তুতি নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারার রেকর্ড গড়ল এ শিক্ষার্থীরা।

মনছবি যাদের অলিম্পিকে সোনা জয়

- ◆ প্রথম বাংলাদেশ যুব গেমস ২০১৮ : হ্যান্ডবল ও কাবাডিতে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন (১৩টি স্বর্ণপদক)
- ◆ ৪৭ তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৮ : টেবিল টেনিস ইভেন্টের দ্বৈতে পরপর তিন বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন
- ◆ ৪৫ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬ : চ্যাম্পিয়ন-হ্যান্ডবল, কাবাডি ও টেবিল টেনিস, ১০০ ও ২০০ মিটার স্প্রিন্ট
- ◆ ৪৩ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৪ : চ্যাম্পিয়ন-হ্যান্ডবল
- ◆ ৪২ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৩ : চ্যাম্পিয়ন-হ্যান্ডবল

- ◆ বিজয় দিবস জিম্নাস্টিকস প্রতিযোগিতা ২০১৭ : ৬টি স্বর্ণসহ ১৮টি পদক
- ◆ জাতীয় বয়সভিত্তিক জিম্নাস্টিকস প্রতিযোগিতা
 - ২০১৭ : ১১টি স্বর্ণসহ ৩২টি পদক
 - ২০১৬ : ৯টি স্বর্ণসহ ২৯টি পদক
 - ২০১৫ : ৩টি ইভেন্টেই স্বর্ণসহ ২২টি পদক
 - ২০১৪ : ৩টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ
 - ২০১৩ : ৫টি স্বর্ণসহ ১৫টি পদক
- ◆ ২য় আরচারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৫ : স্বর্ণ ও রৌপ্য
- ◆ স্বাধীনতা দিবস খো খো টুর্নামেন্ট ২০১৪ ও ২০১৫ : অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন
- ◆ ১ম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ ২০১৪ : চ্যাম্পিয়ন
- ◆ বাংলাদেশ গেমস ২০১৩ : রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ (খো খো)

বেড়ে উঠছে অভিভাবকহীন ২৬৫ জন মেয়েশিশু



১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে প্যারেড ও ডিসপ্লেতে প্রথমবারের মতো অংশ নেয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের মেয়ে শিক্ষার্থীরা। এবছরও বিজয় দিবসে চট্টগ্রাম বিভাগে প্যারেড ও ডিসপ্লেতে কোয়ান্টার বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার লাভ করে। উল্লেখ্য, কোয়ান্টাম শিশুসদনে উদারনৈতিক শিক্ষা ও সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে উঠছে অভিভাবকহীন ২৬৫ জন মেয়েশিশু। ২০০৪ সালে রাজশাহীতে শুরু হওয়া ফাউন্ডেশনের এ কার্যক্রমটি পরবর্তীতে স্থানান্তরিত করা হয় বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে।

সৃষ্টির সেবায় দুই দশক

দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম

বর্ধিত ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে ১৯৯৬ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গঠন করে যাকাত ফান্ড। ২০১৭ সালে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা এ ফান্ডে জমা করেন ১১ কোটি ২৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৯৬ টাকা। যাকাত ফান্ডের অর্থে এ পর্যন্ত ১৫,৮৭০ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৩৩৭ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সারাদেশে দুস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনে ৩৮৯টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। এ-ছাড়াও পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন ফলজ প্রকল্প, প্রাণী ও পশুসম্পদ প্রকল্প (বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঁস, মুরগি, উন্নত জাতের ছাগল ও ভেড়া), দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ঋণমুক্তি, কর্মসংস্থান প্রকল্প।



প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন ২,৪৯৪টি পরিবারকে গৃহনির্মাণে সহায়তা দেয়া হয়েছে।



এ পর্যন্ত ২১টি ব্যাচে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৩৩৭ জন মহিলাকে। সেলাই মেশিন পেয়েছেন ৩৮৯ জন।



সড়ক দুর্ঘটনায় পা হারানো যশোরের জাকির হোসেন এখন মুদি দোকানের মালিক



বছরব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল-এর উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ও আবাসিক এলাকায় নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম। উল্লেখ্য, গত ২৪ মার্চ ২০১৮ ঢাকা জেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণে জাতীয় স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে কোয়ান্টামের সাত শতাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন।



শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল 'রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ'-এর শিক্ষা কার্যক্রমসহ সার্বিক পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব ২০১৫ সাল থেকে গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বর্তমানে এই স্কুলে পড়াশোনা করছে মোট ২৯১ জন শিক্ষার্থী।



দাফন কার্যক্রম ৥ মমতাপূর্ণ শেষ বিদায়

পরিচয়হীন অথবা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সংকারের জন্যে ২০০৪ সালে শুরু হয় দাফন কার্যক্রম। এ পর্যন্ত মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানানো হয়েছে ৪৭৪ জনকে।

বিশুদ্ধ পানি পান করছেন লক্ষ মানুষ

১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৯২টি পানির ট্যাংক, ২৮৩টি টিউবওয়েল ও দুইটি ইঁদারা স্থাপিত হয়েছে দেশের উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায়। এর ফলে বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছেন পথচারী ও স্থানীয় অধিবাসীসহ হাজারো মানুষ।

আশ্রয়মম ৥ মমতার আশ্রয়ে অসহায় প্রবীণরা

আত্মীয়-পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধদের নিয়ে বান্দরবানের রাজবিলায় ২০১২ সালে স্থাপিত হয় 'আশ্রয়মম'। বর্তমানে চার জন পুরুষ ও চার জন নারী সেবাার্থীকে এখানে সার্বক্ষণিক পরিচর্যা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

কোয়ান্টাম ইয়োগা ॥ তিন যুগে উপকৃত লাখো মানুষ

শ্বাস-প্রশ্বাসের জটিল নিয়ম, আসনের কঠিন প্রক্রিয়া ও আয়ত্তকরণে দীর্ঘ চর্চার কারণে যোগব্যায়ামের উপকার থেকে আধুনিক মানুষ ছিল বঞ্চিত। এ প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের চর্চার উপযোগী করে আশির দশকে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক উদ্ভাবন করেন যোগব্যায়ামের সবচেয়ে সহজ ও ফলপ্রসূ সংস্করণ-কোয়ান্টাম ব্যায়াম। ১৯৮৩ সালে যোগ-মেডিটেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিন যুগ ধরে উপকৃত হয়েছেন লাখো মানুষ। বর্তমানে ঢাকাসহ সারা দেশে সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে দুদিনব্যাপী কোয়ান্টাম ইয়োগা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।



রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার
প্রাঙ্গণে কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা করছেন
নবনিযুক্ত ১,১০৬ জন নারী পুলিশ কনস্টেবল।
২২ ও ২৩ নভেম্বর ২০১৭

পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে কোয়ান্টাম ইয়োগা যুক্ত হয়েছে নবনিযুক্ত নারী পুলিশ কনস্টেবলদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ সূচিতে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা' বইটিকে প্রশিক্ষণের পাঠ্যবই নির্বাচিত করা হয়েছে। ২০১৭ সালে কোয়ান্টাম ইয়োগা প্রশিক্ষণের দুটি ব্যাচে অংশ নিয়েছেন মোট ২,২৪২ জন কনস্টেবল।

সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোয়ান্টাম ইয়োগা



২০১৬ সালে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে যুক্ত হয়েছে কোয়ান্টাম ইয়োগা। ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিসিএস প্রশাসন একাডেমি শাহবাগে, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সাভারে এবং গাজীপুরে টেলিকমিউনিকেশন স্টাফ কলেজে কোয়ান্টাম ইয়োগার মোট ১৬টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাচগুলোতে অংশ নিয়েছেন ৮৭৭ জন সদ্যনিযুক্ত বিসিএস ক্যাডার, ১২০ জন উপ-সচিব ও ৮২ জন যুগ্ম সচিব।



নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনে (আগারগাঁও) ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমের চারটি ব্যাচ। এ ব্যাচগুলোতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৩৪৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নেন। এছাড়া ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, কুমিল্লা পুলিশ লাইন-এ পুলিশ সুপারসহ ৩৪ জন পুলিশ অফিসার অংশ নিয়েছেন কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে।

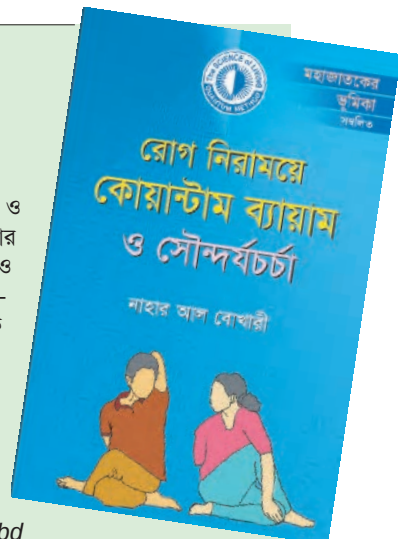


শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে ব্যায়াম করছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ কার্যক্রমে আলাদাভাবে ২৫ জন পুরুষ ও ২৯ জন মহিলাসহ মোট ৫৪ জন অংশ নেন। ২১ ও ২২ এপ্রিল ২০১৭

যোগব্যায়ামের সর্বাধুনিক বই

বাংলাদেশে মহিলাদের যোগব্যায়াম চর্চা ও প্রশিক্ষণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাদাম নাহার আল বোখারীর দীর্ঘ দুই যুগের অভিজ্ঞতা ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের আলোকে যোগব্যায়ামকে উপস্থাপন করা হয়েছে এ বইতে।
সুস্থ, সুন্দর ও সুখী জীবন গড়তে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের যে-কোনো সেন্টার শাখা সেল থেকে আপনিও সংগ্রহ করতে পারেন এ বইটি।

ফ্রি ডাউনলোড : publication.qm.org.bd





কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের ১৮ বছর বেঁচেছে নয় লক্ষাধিক প্রাণ



‘নিরাপদ ও স্বেচ্ছা রক্তদানে একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম’-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে ১৫ তম গোবিন্দেন্দ্র ক্লাবের সদস্য স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এম.পি। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ২৩,৭১৮ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে সম্মাননা জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় ভূষিত কোয়ান্টাম ল্যাব

নিরাপদ রক্ত
পরিসঞ্চালনে
গুরুত্বপূর্ণ অবদান
রাখায়
কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশনকে
বিশেষ সম্মাননা
স্মারক প্রদান
করেছে



গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য
অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বিশ্ব রক্তদাতা দিবস
২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ স্বীকৃতি
দেয়া হয়।

২০০৭ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশনকে সম্মাননা প্রদান করে স্বেচ্ছা
রক্তদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ অবদান রাখায়।

রক্ত সবসময় সবার জন্যে ফ্রি

রক্ত ও রক্ত উপাদানের
কোনো বিক্রয়মূল্য হয় না।
তাই কোয়ান্টাম ল্যাবে
কেবলমাত্র রক্তের বিশুদ্ধতা
নির্ণয়ে মৌলিক পাঁচটি
স্ক্রিনিং (হেপাটাইটিস-বি,
হেপাটাইটিস-সি, সিলিফিস,
এইডস এবং ম্যালেরিয়া)-
এর জন্যে ন্যূনতম প্রসেসিং
খরচ রাখা হয়।

খোলা থাকছে ২৪ ঘণ্টা

মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে সারা বছর দিন-
রাত ২৪ ঘণ্টা এ সেবা নেয়ার সুযোগ থাকছে
সর্বস্তরের মানুষের জন্যে। নিয়মিত রক্তের
চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের যে-কোনো
দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনে মানুষের পাশে আছে
কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

৯,৬৫,৪০৯ ইউনিট

১৮ বছরে সরবরাহকৃত রক্ত ও রক্ত উপাদান

৩,২০,৬৮৪ জন

ব্লাড ডোনার পুর্নে স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা

১,৯২,৮০৯ ইউনিট

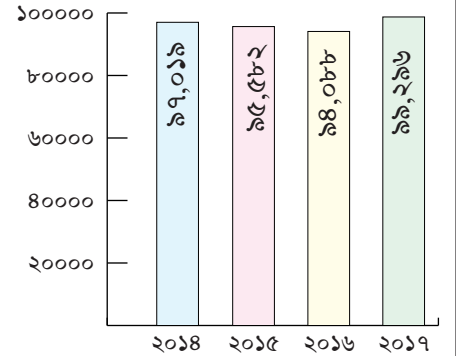
১৮ বছরে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসাথে
সরবরাহকৃত ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা

৯,৯২৪ ইউনিট

স্ক্রিনিং টেস্টে দূষিত গণ্য হওয়ায় বাতিল

(২০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত)

২০১৪ থেকে বার্ষিক সরবরাহ প্রায় ১ লক্ষ ইউনিট



অত্যাধুনিক কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্ত বিভাজনের মাধ্যমে
রক্তের ৮টি উপাদান সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় এক
ব্যাগ রক্ত থেকে চার জনের জীবন বাঁচানো সম্ভব।



কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় প্রতিবছর নর্থ সাউথ
ইউনিভার্সিটির সোশ্যাল সার্ভিস ক্লাব আয়োজন করছে দেশের অন্যতম বৃহৎ ব্লাড
ক্যাম্প। উল্লেখ্য, স্বেচ্ছা রক্তদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে
৩,৭৩৫টি ক্যাম্প। একদিনের ক্যাম্পে সর্বোচ্চ সংগ্রহ ১,৪০৬ ব্যাগ রক্ত।

- এ পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, কিডনিবৈকল্য ও এনিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদেরকে আংশিক মূল্যে বা বিনামূল্যে নিয়মিতভাবে রক্ত সংগ্রহের জন্যে ৪২৪টি কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত সামর্থ্যহীনদের জন্যে বিনা প্রসেসিং খরচে ৩৪,৭২৭ ইউনিট এবং সীমিত সামর্থ্যবানদের ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে ৫১,৬৮৭ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান প্রদান করা হয়েছে।

অজেয় ১৯ ঃ উদ্বুদ্ধ হয়েছে ৫৩ হাজার শিক্ষার্থী

১৮ বছর পূর্তিতে অর্থাৎ ১৯ তম
জন্মদিনকে প্রথম রক্তদানের মাধ্যমে
স্মরণীয় করে রাখার পাশাপাশি
রক্তদানের মতো একটি মহান
মানবিক কাজে তরুণদের সম্পৃক্ত
করতে পরিচালিত হচ্ছে অজেয়
১৯ কার্যক্রম। এ পর্যন্ত ৩৮৩টি
স্কুল, কলেজ ও বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে মোট ৮৭০টি কার্যক্রমে
অংশ নিয়েছে ৫৩ হাজার অগ্রহী রক্তদাতা।



কোয়ান্টাম বুলেটিন : সৃষ্টির সেবা সংখ্যা : মে ২০১৮ ঃ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ঃ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক,
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত
Phone : 9341441, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd



মাহে রমজান সংখ্যা

কোয়ান্টাম বুলেটিন

মে ২০১৮

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

এবারের রমজান হোক আসক্তিমুক্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ রমজান

সংযমের মাস পবিত্র রমজান। কেবল উপবাস যাপন নয়, এ সংযম অনুশীলন করা চাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে। তাহলেই রমজান থেকে আমরা লাভ করতে পারব পরম করুণাময় আল্লাহর সর্বাধিক ক্ষমা ও দয়া। তাই ইফতার ও সেহরিতে ভোজন-উৎসব বর্জন করার পাশাপাশি যথাযথ সংযম পালন করুন আপনার সামগ্রিক জীবনাচারেও। ফেসবুক, স্মার্টফোন, টিভি সিরিয়াল, ভিডিও গেম ও অনলাইন শপিং-সহ যাবতীয় ভার্চুয়াল ভাইরাস আসক্তির সর্বনাশা ছোবল থেকে মুক্ত হোন এ রমজানেই। এবারের রমজান হোক আসক্তিমুক্ত, জীবনের শ্রেষ্ঠ রমজান।

১৮ এপ্রিল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। কাকরাইলের আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে আসন্ন রমজানে করণীয় সম্বন্ধে সমন্বয়যোগী আলোচনা উপস্থাপন করেন তিনি।

গুরুজী বলেন, বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ বিকাশের ফলে মুনাফালোভীদের কাছে সবকিছুই এখন ব্যবসার হাতিয়ার। দুঃখজনক হলেও সত্যি, ধর্মকেও তারা এর বাইরে রাখে নি। যে কারণে দেখা যায়, রমজানের শুরু থেকেই জমকালো ইফতার ও সেহরি পার্টির বিজ্ঞাপন ও ঈদ উপলক্ষে কেনাকাটায় প্রলুদ্ধ করার



এবারের রমজানে নিজের ও পরিবারের কল্যাণে সাধ্যমতো বিতরণ করুন আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী। আপনার এ উদ্যোগে কোরআনের আলোয় আলোকিত হোক আরো লক্ষ মানুষ ও পরিবার।

শতসহস্র আয়োজন। এসব দ্রষ্টাচার রমজানের গুরুত্ব ও ধর্মের শিক্ষা থেকে আমাদের অনেক দূরে সরিয়ে দেয়।

এর পাশাপাশি সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে নতুন উপদ্রব-ভার্চুয়াল ভাইরাস আধ্বাসন। আগেকার দিনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মানুষকে ধরে নিয়ে দাস বানিয়ে রাখত, যারা বাধ্য হতো মাথা নিচু করে জীবন কাটিয়ে দিতে। শোষকগোষ্ঠীর আরোপিত শৃঙ্খল আর নির্যাতনের সার্বক্ষণিক আতঙ্ক ওদের তাড়া করে ফিরত বলে ওরা মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস পেত না।

কিন্তু এ-যুগে আর কাউকে জোর করে দাস বানাতে হয় না, বরং আমরা নিজেরাই দ্রাস্ত জীবনদৃষ্টি ও অসুস্থ বিনোদনের ফাঁদে পড়ে নিজেদেরকে সেই স্তরে নামিয়ে আনি। বর্তমান সমাজে ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে সবাই দিনের একটা বড় অংশই ঘাড় গুঁজে কাটিয়ে দিচ্ছে স্মার্টফোন-ট্যাব-আইপ্যাডের স্ক্রিনে।

পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। 'ফেকবুক' (!) সহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আর স্ক্রিন আসক্তির কারণে পৃথিবীজুড়েই বাড়ছে

হতাশা-একাকিত্ব-বিশৃঙ্খলিত আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা। গবেষকরা যাকে চিহ্নিত করেছেন মাদকাসক্তির চেয়েও ভয়ানক আসক্তি হিসেবে। ফেকবুককে তারা অভিহিত করেছেন 'অবসাদগ্রস্ত মানুষের আখড়া' বলে। শুধু তা-ই নয়, এসব জীবনঘাতী আসক্তি তরুণদের ক্রমশ করে তুলছে একদিকে হিংস্র ও বেপরোয়া, অন্যদিকে আত্মবিশ্বাসহীন ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। পরিবারগুলো হয়ে পড়ছে বিচ্ছিন্ন ও অশান্ত।

এ প্রেক্ষাপটে নিজেরা সাবধান হওয়ার পাশাপাশি চারপাশের সবাইকে সচেতন করে তোলার আহ্বান জানিয়ে গুরুজী বলেন, নিজেদের পরিবারসহ দেশের মানুষকে বাঁচাতে এ আসক্তির র‍্যাকহোল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। সংযম পালন ও স্রষ্টার নৈকট্য অর্জনের পুণ্যমাস রমজানই হতে পারে এ ভয়ংকর আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়।

তাই এ রমজানে সর্বাঙ্গিক প্রয়াস চালান অসুস্থ খাদ্যাচার, পণ্যাসক্তি ও ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে চিরতরে মুক্ত হতে। বরকতময় রমজান হোক আমাদের সার্বিক কল্যাণের উপলক্ষ।

গুরুজী মা-জীর সাথে
ঈদ মোলাকাতে
সপরিবারে অংশ নিন

পবিত্র রমজান উপলক্ষে দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থানরত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের দোয়া ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গুরুজী ও মা-জী। এর পাশাপাশি তারা সবাইকে আসন্ন ঈদ মোলাকাতে অংশ নিতে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ঢাকার কাকরাইলস্থ ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে (আইডিইবি) প্রতিবারের মতো এবারও ঈদের দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এ আয়োজন। কোয়ান্টাম পরিবারের সকল সদস্যের আনন্দমুখর এ মিলনমেলায় আপনিও অংশ নিন সপরিবারে।

যাকাত আদায় করুন
সম্ভবদ্বাভাবে

নিয়মিত যাকাত আদায় যেমন ফরজ, তেমনি সম্ভবদ্বাভাবে যাকাত আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ১৯৯৬ সালে গঠন করে যাকাত ফান্ড। দুঃস্থ ও বঞ্চিতদের পুনর্বাসনের জন্যে আপনি নিজের ও পরিচিতদের যাকাতের অর্থ কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে প্রদান করুন। এ অর্থ পুরোপুরি শরিয়ত নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হয়।

কোয়ান্টামে খতমে
কোরআন

১৮ থেকে ২৪ মে

স্থান : ফাউন্ডেশনের সেন্টার, শাখা, সেল

১৮ থেকে ২৩ মে

স্থান : কোয়ান্টাম, লামা

গুরুজীর পরিচালনায়
আখেরি দোয়া

প্রাজুয়েটদের জন্যে : ১ জুন, শুক্রবার

প্রো-মাস্টারদের জন্যে : ২ জুন, শনিবার

স্থান : আইডিইবি মিলনায়তন

কাকরাইল, ঢাকা

সময় : সকাল ৯টা - ইফতার পর্যন্ত



ভার্চুয়াল ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন হতে এবং রমজানে আপনার করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে জানতে সংগ্রহ করুন এ কণিকা দুটি। নিজে পড়ুন। চারপাশে ছড়িয়ে দিন।



বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, লেখক ও ধর্মতাত্ত্বিক আল্লামা ড. এম শমশের আলী। ১৮ এপ্রিল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অগ্রসর সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং আসন্ন রমজানে করণীয় সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। তার বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রযুক্তির পরিমিত ব্যবহারে সার্থক হোক রমজান

মায়েদের নিতে হবে চালিকাশক্তির ভূমিকা

নারীদের প্রচণ্ড একটা শক্তি রয়েছে, তা হলো মমতার শক্তি। তাই মায়েদের অনুরোধ করি, আপনারা এই শক্তিকে প্রয়োগ করুন, কাজে লাগান। স্মার্টফোন, ফেসবুক, ইউটিউব, ভিডিও গেম-কত নাম বলব! এসব ভারুয়াল ভাইরাস থেকে সন্তানদের বাঁচান। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিন, ১৮ বছর বয়সের আগে সন্তানকে কোনোভাবেই স্মার্টফোন দেবেন না। তাদের মমতা দিয়ে বোঝান। একটা পরিবার হলো রাষ্ট্রের একক। এখানে মায়েদের আধুনিক চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রযুক্তি হোক স্রষ্টার মহিমা উপলব্ধির মাধ্যম

ছোটবেলায় মনে প্রশ্ন জাগত, সারা জীবনের আমলনামা কেয়ামতের দিন এক হাতে কীভাবে আসবে? এই যে এত জায়গায় ঘুরছি, এত কথা বলছি। এত তথ্য এক হাতে কীভাবে ধরবে? পৃথিবীতে মাইক্রোইলেকট্রনিকস বিপ্লবের পর এটা বোঝা গেল। সেটা কেমন?

প্রথমে কম্পিউটার ছিল বিশাল হলরুম জুড়ে। এরপর ডেস্কটপ, ল্যাপটপ হয়ে কম্পিউটার এখন মানুষের হাতের তালুতে চলে এসেছে। এত ছোট! ধরা যাক, একজন মানুষ ৭০ বছর বাঁচল। প্রতিদিন ১০ হাজার করে সে যে আড়াই কোটি বাক্য বলেছে, এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশি তথ্য একটা এক সেন্টিমিটার মাইক্রো প্রেসসরে সংরক্ষণ করা সম্ভব। এটা থেকে বুঝলাম এক হাতে আমলনামা কীভাবে আল্লাহ দেবেন। অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে যে কোরআনের বাণীই প্রমাণ হলো এটা কেউ বলে না।

রমজান হোক পরিবারে কোরআন চর্চার মাস

পরিবারে সবাই মিলেই ধর্মচার অনুসরণ করা জরুরি। কোরআন পুরো সৃষ্টির জন্যে রহমতস্বরূপ ও সংবিধান। রমজানে সপরিবারে প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্যে হলেও কোরআনের চর্চা করুন। ছেলেমেয়েরা কোরআন থেকে জানবে যে, বাবা-মা বৃদ্ধ হলে তাদের সেবা করতে হবে, বিরক্ত হওয়া যাবে না, ‘উহু’ শব্দটিও বলা যাবে না। তখন তারা উপলব্ধি করবে কত জিনিস খেয়াল রাখতে হবে।

বাবা-মাও জানবেন নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে। সন্তান জন্মানোর পর দুই বছর বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের সাথে সন্তানের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এতে তার মধ্যে নিরাপত্তাবোধ তৈরি হয়। এরকম শিশু ধ্বংসাত্মক হয় না।

রমজানে করণীয়

নানা রকম প্রযুক্তি এসে এখন আমাদের সময়ের অপচয় অনেক বেড়ে গেছে। মানবজাতির ধ্বংসের জন্যে আজ আর কোনো অস্ত্র বা যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। অপসংস্কৃতিই নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যথার্থই বলছে, প্রযুক্তিকে পরিমিতভাবে ব্যবহার করো। কিন্তু আসক্ত হওয়া যাবে না। তাই এই ভারুয়াল ভাইরাস থেকে তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে যে স্টিকার, ফোল্ডার, বুলেটিন কোয়ান্টাম প্রকাশ করেছে, দেশের মানুষের কাছে আপনারা তা পৌঁছে দিন। স্টিকারগুলো বাসে, ট্রেনে সবখানে লাগান। জাতি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে এমন একটা ভালো কাজের জন্যে।

সব মানুষই শান্তি চায়। কিন্তু শুধু নিজের জন্যে কাজ করলে শান্তি আসে না। অন্যের জন্যে কাজ করলেই তা পাওয়া যাবে। আর সময় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কেউ জানে না জমিনের ওপরে তার জন্যে সময় কতটুকু আছে। তাই কাজ করতে হবে একাগ্রচিত্তে। হৃদয় থাকবে স্রষ্টার দিকে ধাবিত। আর হাত থাকবে কাজের দিকে ধাবিত। এই রমজানে প্রযুক্তিকে শুধু প্রয়োজনে ব্যবহার করুন এবং অন্যদেরও এ সম্পর্কে সচেতন করুন।

অনুলিখিত

আধুনিক প্রযুক্তির কাছে মানুষের অনেক আশা ছিল। এর অনেকটা পূর্ণও হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি মঙ্গলের সাথে কিছু অমঙ্গলও যুক্ত থাকে। অধিকাংশ মানুষ মঙ্গলটাকে ভুলে গিয়ে অমঙ্গলের দিকে বেশি ধাবিত হয়। এভাবেই আজ পৃথিবীজুড়ে বহু মানুষ স্মার্টফোনসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

তরুণ জনশক্তিকে বিপথগামী করার নীলনকশা

আজকের দিনে তরুণ সমাজকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হচ্ছে কত রকম বিজ্ঞাপন। যেখানে বলা হচ্ছে, সারা রাত কথা বলো। যত রাত হবে, কলরেট তত কম। কিন্তু সারা রাত গল্প করলে একজন ছাত্র বা ছাত্রী পড়বে কখন? ঘুমাবে কখন? সে কি ঘুমাতে ঘুমাতে ক্লাসে যাবে? দেশে একজন সচেতন ব্যক্তিও কি নেই যিনি বলবেন, তরুণ সমাজের কল্যাণার্থে এসব বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। এসব বন্ধ করো।

বিজ্ঞাপনে আরো বলে, ফেয়ার এন্ড লাভলি মাখো, তোমার ঔজ্জ্বল্য এত বাড়বে যে, সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এটা পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক ও বর্ণবিদ্বেষী একটা কথা। শ্যামবর্ণ হলে যে তাকে সুন্দর লাগবে না, তা কে বলল? মনের সৌন্দর্যটাই আসল। ইসলামে কোনো বর্ণবিদ্বেষ নেই। নবীজী (স) বেলাল (রা)-এর সাথে মানবিক ব্যবহার করে দেখিয়ে দিয়েছেন, একজন ক্রীতদাস হলেও তার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে।

এ যুগের আরো ভয়াবহ জিনিস হচ্ছে মাদক ও পর্নোগ্রাফি। তরুণ সমাজকে এসবে আসক্ত করার জন্যে কৌশলে প্রচারণা চলছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা এরকম কাজ করেছে। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আমাদের বাচ্চারা হরদম ঘোরাফেরা করছে। অভিভাবকরা সময় থাকতে সাবধান হোন, খোঁজ রাখুন আপনার সন্তান কী কী ওয়েবসাইট ভিজিট করে।

হুমকির মুখে তরুণ প্রজন্মের মস্তিষ্ক

১৯৮১ সালে কানাডার ক্যালগেরিতে একটা কনফারেন্সে গিয়েছি। ওখানে আমার এক ব্রিটিশ বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করছি। এসময় ওখানে একটা ছেলে এলো। অধ্যাপক বন্ধু বলল, তোমাকে একটা মজা দেখাই। সে ওই ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, এককে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? ছেলেটি বলল, খুব সহজ। বলেই সে পকেট থেকে ক্যালকুলেটর বের করল। অর্থাৎ এককে দুই ভাগ করলে যে শূন্য দশমিক পাঁচ হয়, এটা ক্যালকুলেটর ছাড়া বলতে পারছে না!

অনেকে বলেন মানুষের সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জ মহাকাশে যাওয়া, কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রে পৌঁছানো। আমি বলি, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মানুষ নিজে। আল্লাহ মস্তিষ্কের মতো এত রহস্যময় ও সম্পদশালী আর কিছু তৈরি করেন নি, যা আমরা নষ্ট করছি মাত্রাতিরিক্ত প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে। কারণ আমরা চিন্তা করছি না। মস্তিষ্ক ব্যবহার না করার ফলে কমে যাচ্ছে আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাবিলিটি। সাধারণ যোগ-বিয়োগে এখন আমাদের যন্ত্রের সাহায্য লাগে।

আজকে ফেসবুকের উদ্যোক্তারা আফসোস করছেন, আমরা শিশুদের মস্তিষ্কের অনেক বড় ক্ষতি করে ফেলেছি। বিল গেটস সন্তানদের কম্পিউটারে আসক্ত হতে দেন নি। নিজের সন্তানকে না দিয়ে সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের আসক্ত হওয়ার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন।

রমজানে অভ্যস্ত হোন বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাসে সুস্থ থাকুন সারা বছর

‘রমজানে খাবারের কোনো হিসাব দিতে হবে না’-ব্রাহ্ম এই ধারণাটি আমাদের মাঝে কীভাবে এলো, তার হদিস পাওয়া যায় নি বটে, কিন্তু এর সূত্র ধরেই রমজান পরিণত হয়েছে খাদ্য উৎসবের মাসে। রমজান এলেই রাস্তা-ঘাটে, পত্র-পত্রিকায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায় খাবারের বাহারি বিজ্ঞাপন।

এসময় শাহী ইফতার, অভিজাত ইফতার, ইফতার মেলা, এমনকি ভোররাতে সেহরি পাটির নামে চলে বেনিয়াদের জমজমাট ব্যবসা। এটা শুধু আমাদের দেশেই নয়, রমজান জুড়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সব দেশের মোটামুটি একই চিত্র।

অথচ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রমজান হলো খাদ্য সংযমের মাস, পরিমিতবোধের মাস, সর্বোপরি আত্মিক উপলব্ধির মাস। এ মাসে সঠিক জীবনচারণ অনুসরণ করে আমরা হয়ে উঠতে পারি শারীরিক ও মানসিকভাবে আরো সুস্থ ও উদ্যমী, যার কল্যাণকর প্রভাব বহমান থাকবে সারা বছর।

ইফতারে শ্রেফ খেজুর পানি ॥

পাবেন তাৎক্ষণিক প্রাণশক্তি

ইফতার করুন শুধু খেজুর ও পানি দিয়ে। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি ভেবে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। খেজুর ও পানির মিশ্রণে সুক্রোজ তৈরি হয়, যা শরীরে তাৎক্ষণিক প্রাণশক্তি এনে দেয়।

হযরত আনাস (রা) বলেন, ‘রসুলুল্লাহ (স) কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর খেতেন। তাজা বা শুকনো খেজুরের কোনোটিই না থাকলে কয়েক টোক পানি পান করতেন।’ (আবু দাউদ)

প্রয়োজন নেই বাড়তি চিনি বা শরবতের

জার্মানির ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি অব মিউনিখ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭-তে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, প্রতি বছর রমজান মাসে মুসলিম দেশগুলোতে চিনির চাহিদা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। সেইসাথে বৃদ্ধি পায় চিনির মূল্যও। যার অন্যতম কারণ হলো, রমজানে চিনি দেয়া শরবত এবং মিষ্টি জাতীয় খাদ্যের চাহিদা।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, চিনি দেয়া শরবত, অতিরিক্ত মিষ্টি দেয়া খাবার শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। প্যাকেটজাত জুসও পরিহার করুন। কারণ এতে থাকে নানাবিধ ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান। এসবের চেয়ে দেশীয় মৌসুমি ফল খাওয়াই শ্রেয়।

রমজানে ওজন বৃদ্ধি বা পেটের পিড়া ॥

ভুল খাদ্যাভ্যাসই অন্যতম কারণ

বিস্ময়কর হলেও সত্য, রমজানে পুরো মাস রোজা রাখার পরও অনেকের ওজন বেড়ে যায়। এ নিয়ে সিএনএন একটি প্রতিবেদন (২৩ নভেম্বর ২০০৩) প্রকাশ করে। এতে উদাহরণ হিসেবে তিউনিসিয়ার নাগরিকদের নিয়ে দেশটির সরকার কর্তৃক পরিচালিত একটি স্বাস্থ্য-জরিপ দেখানো হয়। জরিপের মূল বিষয় ছিল রমজানের খাদ্যাভ্যাস এবং নাগরিকদের ওজন-বিষয়ক পর্যালোচনা।

জরিপে পাওয়া যায়, রমজান শেষে ওজন বৃদ্ধির হার মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৯ শতাংশ এবং পুরুষদের ৩৫ শতাংশ। কারণ হিসেবে স্বাস্থ্য গবেষকরা বলেন,

অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসে দেশটিতে গড় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

শুধু যে ওজন বৃদ্ধি তা নয়, অতিভোজনের ফলে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এমন খবরও পাওয়া যায় প্রতিবছর। ২০১৩ সালে কাতারে রমজানে প্রতিদিন গড়ে ১৫ জন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর কারণ ইফতারে ও সেহরিতে অতিভোজন এবং হজমে গুণ্ডগোল।

পরবর্তীতে একই সমস্যায় দুবাই নগরীতেও অনেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাই ২০১৭-তে সেখানকার চিকিৎসকরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অতিভোজন এবং রোজা রেখে অস্বাস্থ্যকর খাবার না খাওয়ার পরামর্শ দেন।

রাতের খাবার ও সেহরি হোক স্বাস্থ্যসম্মত

রমজানে মাগরিবের নামাজ শেষ করে খেয়ে নিন রাতের খাবার-ভাত, শাকসবজি, মাছ/ মাংস/ ডিম, ডালসহ অন্যান্য সুস্বাদু খাবার। ভাজা-পোড়া, তেল-মশলা দেয়া গুরুপাক খাবার পুরোপুরি বর্জন করুন।

রোজা রাখলে মূলত তৃষ্ণাটাই বেশি পায়। সেহরিতে বেশি খেলে বা প্রোটিন জাতীয় খাবার বেশি খেলে তৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়। কারণ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হজমের জন্যে দেহে পানির প্রয়োজন বেশি হয়।

অন্যদিকে ভাত-সবজি সহজে হজম হয়, শরীরে পানির ঘাটতিও কম দেখা দেয়। বরংবরে অনুভূতি নিয়ে দিনের কাজে ও ইবাদতে মনোযোগ দেয়া সহজ হয়। কখনো ভাত-সবজির বদলে কলা-খেজুর বা দই-চিড়া খাওয়া যেতে পারে। এগুলোও সেহরিতে সমান উপাদেয়।

একমাসের সংযম ॥ সারা বছরের সুস্থতা

সাঁউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ভল্টার ল্যাংগো ২০ বছরেরও বেশি সময় মানুষসহ নানা প্রাণীর আয়ুষ্কাল এবং উপবাস থাকার ফলে শারীরিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বলেন, সুস্থতার জন্যে আমাদের উপবাস থাকার চর্চা করা উচিত, যা বর্তমান প্রজন্ম ভুলতে বসেছে।

সম্প্রতি তার গবেষণায় উঠে এসেছে, রোজা বা উপবাস মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে। কয়েকজন ক্যান্সার রোগীও ওপর গবেষণা চালিয়ে তিনি দেখেন, তিন থেকে পাঁচ দিন উপবাস-চর্চায় তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়েছে। কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এ চর্চার ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে থাকার ফলে দেহে সাময়িক শক্তি-সংকট দেখা দেয়, যা মস্তিষ্কের কোষগুলোতে উপকারী প্রোটিন-নিউরোট্রফিক ফ্যাক্টর উৎপাদনে উৎসাহ যোগায়। ফলে মস্তিষ্ক আগের চেয়ে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। এ-ছাড়াও আমাদের দেহ-কোষের অভ্যন্তরে অপ্রয়োজনীয় অনেক গ্লুকোজ এবং ফ্যাট-কণা জমে থাকে, যা পরবর্তীতে টক্সিন বা বিষাক্ত রূপ নেয়। অনাহারের ফলে এসব টক্সিনের বিনাশ ঘটে। ফলে মস্তিষ্কসহ দেহের কোষগুলো উজ্জীবিত হয়, যার অনুরণন বিদ্যমান থাকে সারা বছর।



কোয়ান্টাম প্রকাশিত তিন পর্বের স্বাস্থ্য কণিকা সংগ্রহে রাখুন, নিয়মিত পড়ুন ও চর্চা করুন। সারা বছর সুস্থ থাকতে জানুন আপনার করণীয় সম্পর্কে।

সারাদিন ইফতার তৈরিতে নয়, ইবাদতে মনোযোগী হোন

আমাদের দেশে অনেক পরিবারে দেখা যায়, রমজানে গৃহিণীরা প্রতিদিনই ব্যস্ত হয়ে পড়েন ইফতারের জন্যে মুখরোচক নানা খাবার তৈরিতে। কখনো কখনো এ ব্যস্ততা চলে মাগরিবের আজান অবধি। অথচ হরেক রকম খাবারে টেবিল সাজানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবারের সবাই একসাথে বসে ইফতার করা। আনুষঙ্গিক ইবাদত এবং নিজের ও অন্যের কল্যাণে দোয়া করার জন্যে ইফতারের আগের সময়টুকুর মহিমা অনেক।

ফেসবুকে প্রদর্শনী নয়, খাবার খান শুকরিয়ার সাথে

ইফতার পার্টি বা সেহরি পার্টি নামক নতুন হুজুগ আর খাবারের সাথে সেলফি বা খাবারের ছবি তুলে ফেসবুকে দেয়া এখন সাধারণ ঘটনা। দেখে মনে হয় যেন খাবারের প্রতিযোগিতা চলছে। এতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মর্যাদা যেমন ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তেমনি রমজানকে কেন্দ্র করে মুনাফালোভীরা ব্যবসা করে চলেছে জমজমাট। প্রদর্শনীর এ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসুন। আয়োজন যেমনই হোক, খাবার গ্রহণ করুন শুকরিয়ার সাথে।

বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হোন ॥

অর্জিত হোক রমজানের মূল লক্ষ্য

সংযমের মাস রমজান আমাদের জন্যে যেমন সুস্থতা ও কর্মোদ্যমের সুযোগ নিয়ে আসে, তেমনি খাবার যে প্রস্তুত কত বড় নেয়ামত এ সম্পর্কেও দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়। উপলব্ধি করা যায় অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা মানুষের যন্ত্রণা। তাই খাদ্যাভ্যাস-সহ রমজানের জীবনচারণ যেন আমাদের মধ্যে মানবিকতার বিকাশ ঘটায়।

বিজ্ঞাপন ও হাল-ফ্যাশনে প্রভাবিত হয়ে নয়, বরং ধর্মের মূল শিক্ষা ও বিজ্ঞানের আলোকে পালন করুন এবারের রমজান। নিশ্চিত করুন আপনার এবং আপনার পরিবারের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সুস্থতা।

তথ্যসূত্র :

দ্য গার্ডিয়ান, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

দ্য টেলিগ্রাফ, ৫ জুন ২০১৪

হাফিংটন পোস্ট, ৭ নভেম্বর ২০১৩

আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পাঠ ও বিতরণের অনুভূতি

পুরো অনুষ্ঠানে কোরআনই ছিল মূল আকর্ষণ

আব্দুল কুদ্দুস

দুই বছর আগে রমজানে প্রায় পাঁচশত পেশাজীবীকে নিয়ে একটি ইফতার মাহফিল আয়োজন করেছিলাম আমরা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সকল অতিথিকে উপহার হিসেবে দেয়া হয় আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় আমি স্টেজ থেকে দেখলাম, প্রায় সবাই আগ্রহ নিয়ে মর্মবাণী পড়ছেন। এই দৃশ্য এখনো আমার চোখে লেগে আছে। কোরআনই ছিল সেদিন পুরো আয়োজনের মূল আকর্ষণ।

[সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পি.ডব্লিউ.ডি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, ঢাকা]



চারপাশের মানুষ সাদরে গ্রহণ করছে মর্মবাণী

মালেকা পারভীন

একবার বাসে বাসে আমি আল কোরআন মর্মবাণী পড়ছি। পাশের সিটে বাসে থাকা মেয়েটিও যে আমার সাথে মর্মবাণী পড়ছে, সেটা আমি টেরই পাই নি। আমি যখন পাতা উল্টাতে গেলাম তখন মেয়েটি আরেকটু সময় চাইল। এতে বুঝলাম সে-ও পড়ছে।

মেয়েটি জানতে চাইল আমি এই কোরআনের এত সুন্দর অনুবাদ কোথায় পেলাম। এরপর সে নিজেই আগ্রহ করে হাদিয়া দিয়ে আমার কোরআনটা নিল। এ ঘটনাটি আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করল এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন থেকে নিয়মিত মর্মবাণী বিতরণ করব।

[গৃহিণী, ঢাকা]



বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলাম

বদরুন্নাহার মুনা

পণ্যের লেবেল ছাপানো হয় এমন একটি প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করি। এরকমই একটি অর্ডারে কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ক্লায়েন্ট আবার নতুন তথ্য পাঠাল। সচরাচর এরকম হয় না। কাজটির দায়িত্ব আমার ছিল। তাই পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল, যে-কোনো সময় আমার চাকরি চলে যেতে পারে।

পরিচিত একজনের পরামর্শে আমি বিপদমুক্তির নিয়তে ৪০টি মর্মবাণী বিতরণ করলাম। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আমার অনুকূলে আসতে শুরু করল। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। আমার অবস্থাও এমন ছিল। কিন্তু মর্মবাণী বিতরণের পর সহকর্মীরাই আমাকে সহযোগিতা করতে শুরু করল। ক্লায়েন্ট-এর সাথে আমরা একটা সমাধানে আসতে পারলাম।

কোরআন মর্মবাণী বিতরণের ফলে আমার পরিচিতরাও উপকার পেয়েছে। আমার এক আত্মীয় তাদের জমি ডেভেলপারের কাছে দেয়। কিন্তু তাদের বিল্ডিং-এর কাজ অসমাপ্ত রেখে ডেভেলপার পালিয়ে যায়। এদিকে যারা ফ্ল্যাটের বুকিং দিয়েছিল, তারা আমার সেই আত্মীয়ের বিরুদ্ধে মামলা করল। দু-পক্ষই মামলায় জড়িয়ে পড়ল। এরপর চলতে লাগল একের পর এক মিটিং আর ঝগড়া।

আমার উপকারের কথা শুনে তারাও সমস্যা সমাধানের নিয়তে ৪০টি মর্মবাণী বিতরণ করলেন। শ্রষ্টা সমাধানের পথ করে দিলেন। তারা অন্য ব্যক্তির কাছে বেশি দামে ফ্ল্যাট বিক্রি করতে পারলেন। এতে বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দেয়া সম্ভব হলো। আল্লাহ আমাদের চূড়ান্ত বিপদ থেকে রক্ষা করলেন।

[এক্সিকিউটিভ, এভারি ডেনিসন, ঢাকা]



কোরআনের মর্মবাণী আমার নিত্যদিনের সঙ্গী

শায়লা পারভীন

কোরআনের অর্থ বুঝতাম না বলে সবসময় একটা অপূর্ণতা অনুভব করতাম। আল কোরআনের বাংলা মর্মবাণী যখন আমার হাতে এলো, তখন মনে হলো এটাই তো এতদিন ধরে খুঁজছি। এরপর কোরআন চর্চার কোনো সুযোগ আমি হাতছাড়া করি নি। রমজানে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন প্রাথমিক ধ্যানের স্তরে কোরআন শুনে যেমন প্রশান্তি পেয়েছি, তেমনি উপলব্ধি করেছি সৎকর্মের কোনো বিকল্প নেই। মোবাইল ফোনে আল কোরআন মর্মবাণী অ্যাপস থাকায় প্রয়োজনীয় আয়াত খুঁজে পাওয়া সহজ হয়েছে। মর্মবাণী এখন আমার নিত্যদিনের সঙ্গী।

[সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, সুইড বাংলাদেশ। খুলনা]



সদকা হিলিং-এর সাফল্য

ছেলে এ প্লাস পেয়েছে

মেজর (অব.) আসাদ

গত বছর আমার ছেলে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তার পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষার দিন সকালে শুরু হলো ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি, সেইসাথে রাস্তায় যানজট। পরীক্ষা শুরু হবে ১০টায়, অথচ পথেই ১০টা বেজে গেল। ছেলে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়াতে দৌড়াতে পরীক্ষার হলে পৌঁছল, তা-ও আধাঘণ্টা দেরিতে। আমার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে ফোনে আমাকে সব ঘটনা জানালেন। আমি সব শুনে কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তৎক্ষণাৎ মাটির ব্যাংকে সাধ্যমতো দানের টাকা রাখলাম। মন কিছুটা স্থির হলো।

ছেলে পরীক্ষার পর জানাল, শিক্ষক তার খাতা জমা নেয়ার জন্যে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিন্তু জোর করেন নি। অবশ্য সে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে দ্রুত সব উত্তর লিখতে। পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়া পর্যন্ত টানা তিন মাস আমি হিলিং-এ নাম দিয়ে রাখলাম। শোকের আলহামদুলিল্লাহ! এসএসসিতে আমার ছেলের রেজাল্ট জিপিএ ফাইভ এবং পদার্থবিজ্ঞানে সে এ প্লাস পেয়েছে।

[হেড অব অপারেশন, মিলেনিয়াম সার্টিস সিকিউরিটি বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা]



লক্ষ্য পূরণ হলো

আফরোজা হক সুমী

এমবিএ ফাইনাল পরীক্ষার পর কর্মজীবনে প্রবেশের সময় হলো। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমার জীবনের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর আমি লক্ষ্য ঠিক করতে পারলাম—আমি শিক্ষক হবো। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে থাকি এবং বেশ কয়েকটি ইন্টারভিউ দিয়েও কোনো ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছিলাম না। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির পাশাপাশি আমি নিয়মিত দান করি ও ৪০ দিনের হিলিং-এ নাম দেই।

প্রভুর কাছে শুকরিয়া জানাই—কিছুদিন আগে ঢাকার একটি স্বনামধন্য কলেজে আমি প্রভাষক পদে যোগদান করার সুযোগ পেলাম। এরপর আমি আগের ঘটনাগুলো মিলিয়ে দেখলাম, যেসব প্রতিষ্ঠানে আমি কাজের সুযোগ পাই নি, সেগুলো ছিল আমার বাসা থেকে বেশ দূরে। কিন্তু এখন আমি যে প্রতিষ্ঠানে আছি, সেখানে আমার যাতায়াত, কাজের সুযোগ সবকিছুই একেবারে মনের মতো। আমার বিশ্বাস, সঙ্গে একাত্মতা, নিয়মিত দান ও হিলিংয়ের কল্যাণেই আমি সুবিধাজনক কাজটি পেয়েছি।

[প্রভাষক, হাবীবুল্লাহ বাহার ইউনিভার্সিটি কলেজ, ঢাকা]



খাদ্য সংযমে উপকৃত রোজাদার



গত দুই দশক ধরে কোয়ান্টাম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনচায়ে। এরই ধারাবাহিকতায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা সচেতনভাবে পরিহার করেছেন রাজসিক-তামসিক খাবার সহযোগে ইফতার পার্টি ও সেহরি পার্টির মতো নব্যপ্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কৃতি। বর্জন করেছেন রমজানে সকল প্রকার খাদ্য উৎসব। এর ফলে আত্মিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি তারা সারা বছরই থাকেন সুস্থ, প্রাণবন্ত ও কর্মোদ্যমী। কোয়ান্টাম পরিবারের এমনই কয়েকজন সদস্যের অনুভূতি তুলে ধরা হলো।



ইবাদত করার জন্যে আগের চেয়ে বেশি সময় পাচ্ছি

আমাদের পরিবারে মাত্র পাঁচ জন সদস্য। তারপরও শুধু রমজান মাসেই প্রয়োজন হতো ১৫ লিটার তেল। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে। ফলে খাবারে তেলের ব্যবহার অনেক কমেছে। এখন প্রয়োজন হয় মাসে পাঁচ লিটার। ফলে দানের পরিমাণ বাড়াতে পেরেছি। আগে কাজ শেষে তাড়াহুড়ো করে বাসায় ফিরে ইফতার তৈরি করতে হতো। এখন ইফতারের জন্যে ভাজা-পোড়ার আয়োজন করতে হয় না। তাই ইবাদত করার সময় বেশি পাচ্ছি।

[লুৎফুর নাহার, সহকারী শিক্ষক, গুল এজার বেগম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

ডায়াবেটিস থাকা সত্ত্বেও সুস্থভাবে রোজা রাখতে পেরেছি

আমার ডায়াবেটিস আছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, তিনি যেন আমাকে রোজা রাখার তওফিক দেন। কোয়ান্টামের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে আমি রমজানে ইফতার ও সেহরি করেছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমার ডায়াবেটিস থাকা সত্ত্বেও খুব সুন্দরভাবে রোজা রাখতে পেরেছি।

[নায়লা পারভীন, গৃহিণী, ঢাকা]

অতিরিক্ত ওজন ও খরচ দুই-ই কমেছে

রমজানে ইফতার ও সেহরিতে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়ার ফলে আমি চার কেজি ওজন কমাতে পেরেছি। অতিরিক্ত ওজন কমে যাওয়ায় শারীরিকভাবে হালকা অনুভব করেছি। সেইসাথে অন্যান্য মাসের তুলনায় আমার খরচ ছয় হাজার টাকা কম লেগেছে। ফলে দানের পরিমাণ বাড়াতে পেরেছি।

[জাকির-উল-আসাদ, প্রভাষক, ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, ঢাকা]

এসিডিটির কোনো সমস্যা হয় নি

গত কয়েক বছর ধরে রমজানে আমি কোয়ান্টামের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করেছি। তাই এসিডিটির কোনো সমস্যা হয় নি এবং ওষুধ খাওয়ারও প্রয়োজন হয় নি। অথচ আগে ইফতারে ভাজা-পোড়া খেয়ে নিয়মিত এসিডিটির সমস্যায় ভুগতাম। ইফতারে এসব খাবার আমরা নিজেরা খাই না এবং অন্যদেরও পরিবেশন করি না।

[কাজী নূরুল আবছার, ব্যবসায়ী, কাজী এন্টারপ্রাইজ, চট্টগ্রাম]

অন্যদেরও সচেতন করেছি

ভাজা-পোড়া ও গুরুপাক খাবার বর্জন করার ফলে ইফতারের পর কোনো ধরনের আলস্য বা অস্বস্তি অনুভব করি নি। বাইরে ইফতার করতে হলে বা কোনো দাওয়াতে যেতে হলেও কোয়ান্টামের খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করেছি। সেইসাথে অন্যদেরও রমজানে খাদ্য সংযমের গুরুত্ব সম্পর্কে নিঃসংকোচে বলেছি।

[হায়াত ফরহাদ চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার, ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট, গ্রামীণফোন, ঢাকা]

সারাদিন ঘরের কাজ করেও ক্লান্ত হই নি

গত রমজানে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করেছি। ফলে রোজা রেখে পানির তৃষ্ণায় আমি সেভাবে কোনো কষ্ট পাই নি। গৃহকর্মী না থাকায় ঘরের সব কাজ নিজে করেছি, তবু ক্লান্ত হই নি। খাবারে সংযমের পাশাপাশি কথা ও আচরণে সংযমী হয়েছি। কোয়ান্টামকে ধন্যবাদ, এই প্রথম রোজা রেখে এতটা সুস্থ বোধ করেছি ও তৃপ্তি পেয়েছি।

[আয়শা ছিদ্দিকা, গৃহিণী, টাঙ্গাইল]

দান আনে অফুরন্ত কল্যাণ

দানের উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাস বেড়েছে বহুগুণ

এডভোকেট লুবনা আফরিন

কিছুদিন আগে আমি একটা বড় সমস্যায় পড়েছিলাম। আমার চেম্বার থেকে একটি ফাইল হারিয়ে যায়। সাত দিন ধরে চেম্বারের সবাই অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। ফাইলে



ক্লায়েন্টের জমির দলিলসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ ছিল। এটা খুঁজে পাওয়া না গেলে আমি ও আমার ক্লায়েন্ট দুজনেই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

তারপর আমি মাটির ব্যাংকে এককালীন দান করি ও এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রার্থনা করতে থাকি। পরদিনই চেম্বারে গিয়ে খুঁজে পাই সেই হারানো ফাইল। এই ঘটনা দেখে সবাই অবাক। স্রষ্টার কাছে অশেষ শুকরিয়া জানাই সমস্যা সমাধানের জন্যে। দানের উপকারিতা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস বেড়েছে বহুগুণ।

[আইনজীবী, ঢাকা]

বঞ্চিত শিশুর আত্মিক অভিভাবক হলাম

তাহমিনা আজম

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে আমি নিয়মিত দান করি। এরই মাঝে আমি জানতে পারি যে, লামায় অসহায় শিশুদের অন্তত একজনের মাসিক খরচ দানের মাধ্যমে আত্মিক অভিভাবক হওয়া যায়। আমার একমাত্র সন্তানের কল্যাণের নিয়তে আমি একটি শিশুর আত্মিক অভিভাবক হলাম।



ব্যবসার পাশাপাশি আমি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। সেই সূত্রে আমি যে মাসিক সম্মানী পাই সেটা আমার হাতখরচের জন্যে থাকত। হাতখরচের পুরোটাই আমি আত্মিক শিশুর জন্যে দান করতে শুরু করলাম। ঠিক পরের মাসে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো, আমার সম্মানীর পরিমাণ বাড়ানো হবে। দেখা গেল, তা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। দানের ফলে এভাবেই আমার সম্পদে প্রবৃদ্ধি এসেছে।

[ব্যবসায়ী, টপাজ ফ্যাশন এন্ড বুটিকস, ঢাকা]

সম্ভবদ্বাভাবে যাকাত আদায়ে আমার কাজের প্রসার বেড়েছে

গাজি আহমেদ হাসান

আমাদের দেশের প্রচলিত পদ্ধতিতে আমি যাকাত দিতে অভ্যস্ত ছিলাম। এতদিন গরিব আত্মীয়স্বজনকে যাকাত দিতাম যেন তারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।



কিন্তু তারা পরের বছর আবার উপস্থিত হতো।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর আমি কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড সম্পর্কে জানতে পারি। এরপর যাকাতের একটি অংশ দিতে শুরু করি কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে। ক্রমে আমার সম্পদে প্রবৃদ্ধি আসতে শুরু করল। এতে আমি যাকাত আদায়ের ব্যাপারে আরো সচেতন হয়ে উঠলাম।

আমার উপলব্ধি হলো, সেখানেই যাকাত দেয়া প্রয়োজন যেখান থেকে আমরা দুনিয়াতে ও আখেরাতে সর্বোচ্চ লাভবান হবো। এছাড়া কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড থেকে সাহায্যপ্রাপ্তরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। সম্ভবদ্বাভাবে যাকাত আদায়ের ফলে আমার কাজের প্রসার অনেক বেড়েছে।

[চেয়ারম্যান, ফ্যাশন ফ্লাশ লিমিটেড, ঢাকা]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : গত রমজানে যতটা সম্ভব কোয়ান্টামের নির্দেশনা মোতাবেক ইফতার ও সেহরি করেছি। ফলে বেশ সুস্থ বোধ করেছি। পরিচিতদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে গেলে কেউ কেউ নেতিবাচক কথা বলে। তাদের কীভাবে বোঝাব?

উত্তর : কাউকে বোঝাতে যাবেন না। আপনি নিজে অনুসরণ করুন। আপনার সুস্থতা এবং ভালো থাকা দেখে তারা এমনিতেই উদ্বুদ্ধ হবে। কারো নেতিবাচক কথায় কখনো প্রভাবিত হবেন না। কারণ যা সত্য, যা বিজ্ঞানসম্মত এবং মানুষের জন্যে কল্যাণকর, আমরা সেটাই অনুসরণ করছি। এটা কোয়ান্টামের নির্দেশনা নয়, এটা রসুলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষা। আমরা যা জেনেছি সবসময় তা-ই আপনাদের বলেছি। আসলে যে-কোনো ক্ষেত্রে স্রোতের বিপরীতে চলতে হলে সাহস দরকার। আর পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে।

কয়েক বছর আগে আমরা যখন পহেলা বৈশাখে ইলিশের বিপক্ষে বলেছিলাম, ওটাও কিন্তু সাহসী পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি, আমাদের ইলিশের বংশ নির্বংশ করার একটা চক্রান্ত চলছে। এটা অনায়া। পৃথিবীর ৭৫ শতাংশ ইলিশ হয় এই বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে। ইলিশের জন্যে এর চেয়ে ভালো চারণভূমি আর নেই। কারণ গঙ্গা যমুনা কর্ণফুলির সমস্ত পলি এসে পড়ছে এই মহীসোপানে এবং এই পলিমাটি হচ্ছে ইলিশের সবচেয়ে ভালো খাবার। আর এ সময়ের ইলিশ হচ্ছে ডিমওয়ালা ইলিশ। একটা মা ইলিশ নিধন মানে হচ্ছে দেড় লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ ইলিশ শেষ।

আমরা ২০১৩ সালে বলেছিলাম, শুধু বৈশাখে ইলিশ খাওয়া থেকে বিরত থাকলে পাঁচ বছর পর আমাদের দেশে মানুষ হালি হিসেবে ইলিশ কিনে নিয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, পাঁচ বছর আগে নি, তৃতীয় বছরেই আমরা এর প্রভাব দেখলাম।

২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বৈশাখী মেন্যু থেকে ইলিশ বাদ দিলেন এবং পরের বছর সরকারি মেন্যু থেকেও বাদ পড়ল। ইলিশ মনের আনন্দে বিচরণ করছে বলে তাদের আকার ও ওজন বেড়ে গেল। কারণ কেউ যখন আনন্দে থাকে তার ওজন বেড়ে যায়। আর যখন টেনশনে থাকে তখন ওজন কমে। পরিসংখ্যান বলছে, সারা পৃথিবীতে ইলিশের সাইজ ছোট হয়েছে আর আমাদের ইলিশ বড় হয়ে গেছে! এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের মমতার কারণে, আমাদের একটি সিদ্ধান্তের কারণে।

আমরা অল্প কিছু মানুষ, কিন্তু আমরা সজ্ঞবদ্ধ। এই সজ্ঞবদ্ধতাই আমাদের শক্তি। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি এবং আমাদের এই ভালবাসার উৎস হচ্ছে সত্যকে ভালবাসা, আল্লাহকে ভালবাসা, আল্লাহর রসুলকে ভালবাসা। এর ওপর ভিত্তি করেই আমরা ইফতারের এ চর্চা শুরু করেছি।

রোজা এবং ইফতারের মতো ধর্মীয় বিষয়গুলোর সাথে নানা অবিদ্যা যুক্ত হয়েছে সময়ের সাথে সাথে। রোজার মাসে যত খাও কোনো হিসাব নেই—এই ভ্রান্ত ধারণা সমাজে প্রচলিত হয়ে গেল। আর আমরা কোয়ান্টামে বলি, সুস্থতার জন্যে খেজুর পানি দিয়ে ইফতার করুন। এতে শরীরে সুক্ৰোজ তৈরি হবে, যা তাৎক্ষণিক প্রাণশক্তি এনে দেবে। মাগরিবের নামাজ আদায় করে রাতের খাবার খেয়ে নিন। সব ধরনের ভাজা-পোড়া পরিহার করুন।

বাস্তবতা হলো, পাঁচ বছর আগেও রাস্তায় যে পরিমাণ ইফতারের দোকান দেখা যেত, এখন কিন্তু কমে যাচ্ছে। মানুষ সচেতন হচ্ছে এবং সুস্থ থাকার গুরুত্ব বুঝতে পারছে। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, সত্যিকারের রোজা যেভাবে পালন করা উচিত সেভাবে আমরা পালন করতে শুরু করেছি। আমাদের দেশে পহেলা বৈশাখে যেভাবে ইলিশ বর্জিত হয়েছে, ইনশাআল্লাহ এইসব ভাজা-পোড়া অখাদ্য কুখাদ্য ও ইফতার থেকে বর্জিত হবে।

প্রশ্ন : কেউ যদি এতিমের সম্পদ ও হক আত্মসাৎ করার পর মসজিদে ও মাদ্রাসায় দান করে, তাকে কি আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন?

উত্তর : আল্লাহ কাকে ক্ষমা করবেন বা করবেন না, এটা পুরোপুরি তাঁর এখতিয়ার। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি, এতিমের হক আদায় করার ব্যাপারে কোরআনে খুব স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। ‘যারা এতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের পেট পরিপূর্ণ করছে আগুন দিয়ে। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে চিরকাল।’ (সূরা নিসা, আয়াত ১০)

অতএব এতিম-অসহায়কে বঞ্চিত করে আপনি যেখানেই দান করুন না কেন, আগুন তো পেটের ভেতরে ঢুকে গেছে। আর এতিমের প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে, সে প্রসঙ্গেও আল্লাহ স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। ‘নিজে অসহায় সন্তান রেখে মারা গেলে, মৃত্যুকালে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার মনে যে উদ্বেগ-উৎকর্ষ থাকত, সেই একই অনুভূতি এতিমের প্রতি প্রদর্শন করো। আল্লাহ-সচেতন থাকো, হক কথা বলো, সুবিচার করো।’ (সূরা নিসা, আয়াত ৯)

তাই কোরআনের মর্মবাণী পড়তে হবে। সুখী পরিতৃপ্ত সুন্দর জীবনের জন্যে যা-কিছু প্রয়োজন, তার সবই রয়েছে কোরআনের পাতায় পাতায়। আমি জানি না বলে অন্যায় করেছি বা ভুল করেছি, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহর নির্দেশ জানা এবং তা মানা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্যে ফরজ।

প্রশ্ন : প্রতি ঈদে আমাদের সবার কেনাকাটার জন্যে একটা বাজেট থাকে। এর একটি অংশ কি আমরা কোয়ান্টামের (কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থী) জন্যে দিতে পারি? তাহলে তাদের ঈদ আরো আনন্দের হবে।

উত্তর : নিজের ও সৃষ্টির কল্যাণে আপনি যে-কোনো সময় দান করতে পারেন। এতে কোনো বাধা নেই। আমরা অসহায় শিশুদের জন্যে তা ব্যয় করব।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিশুরা ঈদে যে আনন্দ করে এটা শহরের অনেক সুবিধাপ্রাপ্ত বাচ্চা পায় না। ঈদে কোয়ান্টামের হয়তো অনেক দামি পোশাক নেই, জুতা নেই, অনেক কিছু নেই। কিন্তু তারা প্রাণভরে আনন্দ করে। কারণ এরকম ফ্রি টাইম তারা খুব কম পায়। এ শিশুদের হাসি আনন্দ ছুটোছুটি দেখলে আপনার মনটা সত্যিই ভরে যাবে।

শহরের বাচ্চারা কি ঈদে-পার্বণে আনন্দ করতে পারে? ঘুম থেকে উঠছেই না হয়তো। যদি-বা উঠল, হয়তো নামাজে গেল না, গেলেও এসে ঘুমিয়ে থাকল বা রুম বন্ধ করে স্মার্টফোন নিয়ে পড়ে থাকল।

আর কোয়ান্টামের দেখবেন, প্রতিটা মুহূর্ত তাদের উচ্ছ্বাস আর প্রাণবন্ততায় ভরপুর। এর কারণ হলো আমাদের এ বাচ্চাদের একটা রুটিন আছে। তাদের জীবনে শৃঙ্খলা আছে বলে ঈদ বা উৎসব তাদের জন্যে অনেক আনন্দের।

আর শহুরে বাচ্চাদের অনেক পণ্য আছে, অনেক বিনোদন আছে কিন্তু জীবনে কোনো আনন্দ নেই। শৈশব-কৈশোরের প্রাণবন্ততা তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে শিশু-কিশোর বা তরুণ সারারাত ভিডিও গেম বা ইউটিউব নিয়ে মগ্ন ছিল, তার কাছে ঈদের আনন্দ, পরিবারের সবার সাথে দেখা হওয়া—সবই তো অর্থহীন। তার তো ঘুমই ভাঙছে না। সে আনন্দ করবে কখন?

তাই জীবনকে রুটিনের মধ্যে নিয়ে আসুন। তথাকথিত সামাজিক যোগাযোগ ও বিনোদনের নামে কম্পিউটার, স্মার্ট টিভির সামনে না বসে পরিবারকে সময় দিন। সুযোগ পেলেই পরিবারের সবাইকে নিয়ে আত্মীয়স্বজনের বাসায় যান। সন্তানকে অটেল পণ্য নয়, তাকে সামাজিক মানুষ হিসেবে বাঁচতে শেখান। পরিবারের সবাই যেন ভাটুয়াল ভাইরাস-সহ সব ধরনের আসক্তি থেকে মুক্ত থাকে, সেই নিয়তে নিয়মিত দান করুন। কারণ যে-কোনো বালা-মুসিবত থেকে মুক্তির জন্যে দান খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : গুরুজী, প্রতিবছরই রমজান মাসে রোজা করি। কিন্তু সেভাবে নিজের কোনো পরিবর্তন অনুভব করি না। আমি সঠিকভাবে রোজা পালন করতে পারছি কিনা, তা কীভাবে বুঝব?

উত্তর : আপনি রোজা রেখেছেন কিনা তা দুটো বিষয়ের মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে।

প্রথমত, শারীরিকভাবে আপনার অতিরিক্ত ওজন কমেছে কিনা। যেরকম ময়লা কাপড়ের ওজন কিন্তু তুলনামূলক বেশি থাকে। ময়লা যখন পরিষ্কার হয়ে যায় তখন কাপড়ের ওজন কমে, কাপড়টা হালকা মনে হয়। তেমনি দেহের ময়লা যদি পরিষ্কার হয়, দেহের সমস্ত টক্সিন যদি দূর হয়, আপনি হালকা ও বারবারে বোধ করবেন। সেইসাথে আপনার এনার্জি লেভেল বেড়ে যাবে, প্রাণবন্ততা বেড়ে যাবে। এটা হচ্ছে রোজা পালনের শারীরিক উপকার।

দ্বিতীয়ত, আপনার দুর্ব্যবহার কমেছে কিনা। কারণ রোজা হচ্ছে দেহের শুদ্ধি এবং অন্তরের শুদ্ধি। অন্তরের শুদ্ধির প্রকাশ হচ্ছে, আপনার দুর্ব্যবহার কমে যাবে। আপনি নিজের ভুলগুলোকে চিহ্নিত করতে পারবেন। ভুল করলে আপনি সাথে সাথে ক্ষমা চাইতে পারবেন। রাগ-ক্ষোভ অহেতুক গালগল্প ও পরনিন্দা থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

আর যদি দুর্ব্যবহার না কমে তাহলে বুঝতে হবে, আপনি হয়তো শারীরিক উপকার পেয়েছেন কিন্তু রোজার যে আসল লক্ষ্য সৃষ্টি-সচেতনতা, আপনার মধ্যে তা পুরোপুরি আসে নি।

এ মাসের অটোসাজেশন

প্রার্থনা হচ্ছে সৌভাগ্য আনয়নের শক্তি ও প্রক্রিয়া। আমি আমার প্রার্থনায় মনোযোগী হবো।

অপসংস্কৃতি চর্চা ও ভারুয়াল জগতে নয় ঈদ হোক পরিবারের সাথে, সার্বজনীন ঐতিহ্যে

ঈদ-পার্বণকে কেন্দ্র করে অপসংস্কৃতি ও আধুনিক বিনোদনের ধারণা-কোনোটিই আমাদের ধর্মীয় বা দেশজ ঐতিহ্য নয়। প্রযুক্তির অপব্যবহার ও অবিদ্যার সূত্র ধরে ছেদ পড়েছে চিরায়ত পারিবারিক সুসম্পর্কে ও সার্বজনীন আনন্দে।

শ্রোতের বিপরীতে কোয়ান্টাম সবসময়ই বলে এসেছে, সুখী পরিবারই সুখী সমাজের পূর্বশর্ত। একা মানুষ সবসময়ই শক্তিহীন। আর সামাজিক বুননের একক হলো মানুষে মানুষে যোগাযোগ। এই বুননকে সংহত করার দায়িত্ব আমাদের সবার।

একাত্তর হোন প্রতিবেশীর সাথে

নবীজী (স)-এর হাদীস অনুসারে আপনার চারপাশে ৪০ ঘরে যারা বসবাস করেন, তারাই আপনার প্রতিবেশী। অর্থাৎ আপনার বাসার ডানে-বামে-উপরে-নিচে-সামনে-পেছনে মিলিয়ে ৪০টি পরিবার আপনার প্রতিবেশী।

আসুন রমজানে ও ঈদে হৃদয়তা গড়ে তুলুন আপনার নিকটবর্তী এই মানুষগুলোর সাথে। নিয়মিত তাদের খোঁজখবর নিন। ঈদের দিন শুভেচ্ছা জানাতে প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করুন এবং তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানান আপনার বাসায়।

ঈদ সালামি ৷ আশীর্বাদ না অত্যাচার!

সালাম যতটা শান্তির, তার চেয়েও বেশি অশান্তি বয়ে আনতে পারে সালামি, বিশেষত ঈদ সালামি। শিশু-কিশোরদের কাছে সালামির মাহাত্ম্য আর শ্রদ্ধা

জানানোর মধ্যে সীমিত নেই। অল্পবয়সে এমন আচমকা উপার্জন কিছু সময়ের জন্যে হলেও তাদেরকে লোভী আর বেহিসেবী করে তোলে। নগদ অর্থ হাতে পেয়ে বন্ধুদের সাথে তারা মেতে উঠতে পারে ক্ষতিকর কোনো আনন্দে।

তাই এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। সালামির পরিবর্তে বয়স অনুসারে ঈদ-উপহার হিসেবে তাদের দিন বৈচিত্র্যময় বিষয়ের ওপর বই, আত্মনির্মাণমূলক ও জীবনীভিত্তিক বই, শাস্ত্রত বাণীসম্মিলিত স্টিকার, শুদ্ধাচার-সুবচন-শিক্ষার্থী কণিকা, যা তাদের মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখবে। অথবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে ঘুরে আসুন স্থানীয় ও জাতীয় ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে।

ইউটিউব, নেটফ্লিক্স আর ফেসবুকে নয়,

ঈদ হোক পরিবারের সান্নিধ্যে

উৎসবের আনন্দ বন্দি হয়ে পড়েছে টিভি, ইন্টারনেট আর স্মার্টফোনের পর্দায়-এই চিত্র এখন শহর-গ্রাম

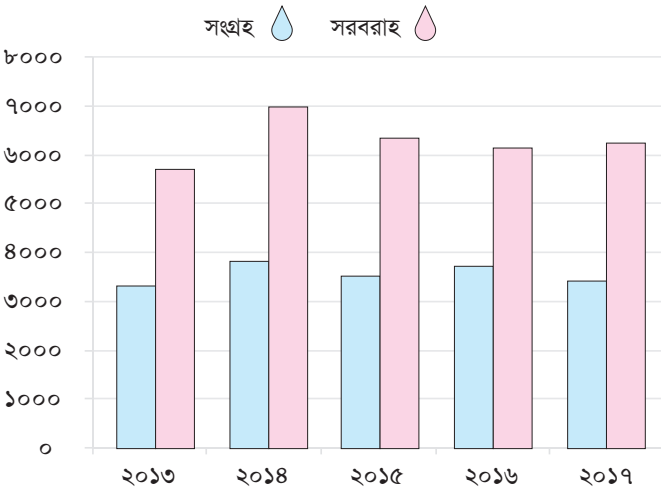


আনন্দঘন ঈদ মোলাকাতে গুরুজীর সাথে রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা, ২০১৭। প্রতিবছর ঈদের দিন জাতিধর্মনির্বিশেষে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা শুভেচ্ছা বিনিময় করতে আসেন গুরুজী ও মা-জীর সাথে।

সর্বত্রই। তরুণরা সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব আর নেটফ্লিক্সে নতুন সব মুক্তি বা টিভি-সিরিজ দেখেই কাটিয়ে দিচ্ছে ঈদের ছুটি।

অভিভাবকরাও ব্যতিক্রম নন। আত্মীয়-পরিজনদের সাথে কুশল বিনিময় আর দেখা করার পরিবর্তে সপ্তাহব্যাপী টিভি-বিনোদনে আসক্ত হয়ে পড়ছেন তারা। এভাবেই আধুনিক মানুষ হয়ে পড়ছে একাকী, বিষণ্ণ ও হতাশ। তাই সচেতন হোন। বেরিয়ে আসুন পারিবারিক-সামাজিক বন্ধনে ফাটল ধরানোর এই ফাঁদ থেকে।

রমজানে মুর্মূষের পাশে দাঁড়ান ৷ ল্যাভে এসে রক্ত দিন



গত পাঁচ বছরে রমজান মাসে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে রক্তের সংগ্রহ ও সরবরাহের চিত্র। রমজানে চাহিদার তুলনায় সংগ্রহ প্রায় অর্ধেক হওয়ায় অনেককেই ফিরে যেতে হয় রক্ত না পেয়ে।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের একজন নিয়মিত রক্তগ্রহীতা তাহমিদ। ওর বয়স আট বছর। যখন সে দেড় বছরের শিশু, তখন তার থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে। এরপর থেকে প্রতি ২১ দিন পর এক ব্যাগ করে রক্ত দিতে হয় তার শরীরে। চিকিৎসকদের মতে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্ত না পেলে তাকে হয়তো

অকালেই চলে যেতে হবে এ পৃথিবী ছেড়ে।

ছোট্ট এ শিশুটির দেহে রক্তের যে চাহিদা, তা মানে না কোনো উৎসব-পার্বণ কিংবা সরকারি-বেসরকারি ছুটি। তাই প্রতি ২১ দিন পর পর তার মা-বাবা ছুটে আসেন কোয়ান্টাম ল্যাভে। বছরের অন্যান্য মাসে সহজেই রক্ত পেয়ে যান তারা। তবে রমজান মাসটা তাদের জন্যে খুব দুশ্চিন্তার। কারণ বছরের এ সময়ে ল্যাভে রক্ত সংগ্রহ হয় চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

এ বছর ৯ জানুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় উঠে আসে-বর্তমানে বাংলাদেশে এক কোটি ১০ লাখ মানুষ থ্যালাসেমিয়ার বাহক। এ রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ৬০ হাজার। প্রতি বছর থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সাত হাজার নতুন শিশু জন্ম নেয়।

(কালের কণ্ঠ, ১০ জানুয়ারি ২০১৮)

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত এই রোগীদের রক্তের চাহিদা থাকে বছর জুড়েই। রমজান মাসেও কোয়ান্টাম ল্যাভে রক্তগ্রহীতারা ভিড় করেন অন্যান্য সময়ের মতোই। বরং অন্য কোথাও রক্ত না পেয়ে নিয়মিতরা ছাড়াও অনেক রোগীর আত্মীয়স্বজন ছুটে আসেন ল্যাভে।

রমজানে রক্তদান সম্পর্কে দ্বিমত নেই আলেমদের মাঝেও। তারা একমত যে, রমজানে রক্ত দিলে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। আর রমজানে প্রতিটি সৎকর্মের সওয়াব ৭০ গুণ বেশি। তাই অন্য মাসে এক ব্যাগ রক্ত দিয়ে যদি চার জনের জীবন বাঁচানোর সওয়াব পাওয়া যায়, তাহলে রমজানে ৭০ গুণ হিসেবে পাওয়া যাবে ২৮০ জনের জীবন বাঁচানোর সওয়াব।

তাই আপনার রক্তদানের সময় হলে রমজানে ল্যাভে এসে রক্ত দিন। মুর্মূষকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন মানবিক এ আহ্বানে।

খোলা থাকছে ৩৬৫ দিন, ২৪ ঘণ্টা

কোয়ান্টাম ল্যাভ ঈদের দিনসহ সারা বছর দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকছে সর্বস্তরের মানুষের জন্যে। নিয়মিত রক্তের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের যে-কোনো দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনে মানুষের পাশে আছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

গোটা দুনিয়াই এখন কমবেশি পুঁজিবাদের দখলে। ফলে সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে প্রায় সবকিছুরই। চিরায়ত ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোও আজ পড়েছে হুমকির মুখে। এখানেও কোনোভাবে ছাড় দিতে রাজি নয় মুনাফালিপ্সু বেনিয়াগোষ্ঠী। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতেও তারা ঠিকই খুঁজে নিয়েছে ব্যবসার রসদ। যে কারণে বিশ্বজুড়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি পবিত্র ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ মাস রমজানকে পর্যন্ত তারা বানিয়েছে তাদের আত্মসী বাণিজ্যের হাতিয়ার। আর আমরাও না বুঝে পা দিয়ে বসে আছি ওদের পাতা ফাঁদে।

পাশ্চাত্যে এ অপসংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে আরো আগেই, দিনে দিনে তা আরো বাড়ছে। এর একখানা দশাসই নামও দিয়েছে তারা-রমজান অর্থনীতি।

রমজানে বিশেষ ছাড় ও ঈদ প্যাকেজ ৥

শুধু কেনো, কেনো আর কেনো

পৃথিবীজুড়ে ধর্মসচেতন মুসলিমরা রমজানে খাওয়াদাওয়া, কেনাকাটা ও দৈনন্দিন আচার-আচরণে সংযমী হওয়ার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ মুসলিমরাও এর ব্যতিক্রম নন। তবে তাদের সংযম প্রচেষ্টায় ভীষণ এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে যুক্তরাজ্যের সুপারমার্কেট ও ব্র্যান্ডশপগুলো। রমজান মাসে মুসলিমদের বৈহিসেবী কেনাকাটা ও পণ্যসজ্জিতে প্রলুব্ধ করতে ওখানকার ব্যবসায়ীরা এঁটেছে নানা ফন্দি।

এর ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে যুক্তরাজ্যে রমজান মাসে খাবার ও উপহার সামগ্রীর পেছনে ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমান সময়ে সে-দেশে রমজান অর্থনীতির আকার কমপক্ষে ২০ কোটি পাউন্ড (আমাদের মূল্যমানে প্রায় দুই হাজার তিনশ কোটি টাকা)।

ব্রিটিশ চেইন সুপারশপ টেসকো, আজদা, স্যান্ডবুরিস' ও মরিসস হরেক রকম পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে। শুধু তা-ই নয়, তারা মুসলিমদের পছন্দের খাবারের ওপর দিচ্ছে বিশেষ ছাড়। যেমন, এ বছর মরিসস শিশুদের আকৃষ্ট করতে দেদারসে বিক্রি করছে 'রামাদান কাউন্টডাউন ক্যালেন্ডার'।

পিছিয়ে নেই বডি শপ ও গোডিভা চকলেটসের মতো কসমেটিকস আর চকলেট বিক্রয়কারী ব্র্যান্ডগুলোও। মুসলিম ক্রেতাদের টানতে তারা ঘোষণা করেছে বিশেষ 'ঈদ উপহার প্যাকেজ'।

উদ্দেশ্য কেবলই মুনাফা

ব্রিটিশ সুপারচেইনগুলো মুসলিম ক্রেতাদের প্রতি হঠাৎ করে যে এত মনোযোগী হয়ে উঠেছে, তার পেছনে নেই কোনো উদার ধর্মীয় সহনশীলতার বালাই। বরং ব্যবসায়ীসুলভ লাভ-ক্ষতির হিসাব কষে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা চিহ্নিত করেছে, পণ্য বিক্রির জন্যে এখন সবচেয়ে লোভনীয় ও কাঙ্ক্ষিত বাজার হলো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো।

এ কারণেই আগামী জুন মাসে প্রথমবারের মতো ঈদ উৎসবের আয়োজন করেছে ইউরোপের বৃহত্তম শপিং সেন্টার ওয়েস্টফিল্ড লন্ডন। সেখানে ক্রেতাদের মনোরঞ্জনর জন্যে লাইভ ক্যাটওয়াক শো থেকে শুরু

সাবধান! রমজানে মুনাফালিপ্সু বেনিয়াগোষ্ঠীর ফাঁদে পড়বেন না



করে ফুড স্টল, বিশেষ অফার ও প্রদর্শনী সবকিছুরই ব্যবস্থা থাকবে। উৎসব আয়োজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তারা খোলামেলাভাবে জানিয়ে দিয়েছে নিজেদের বিজ্ঞাপনেই। যাতে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে সবচেয়ে মূল্যবান এবং এখনো পর্যন্ত অধরা সুযোগ হলো মুসলিম পাউন্ড'।

বেনিয়াদের নতুন কারসাজি : হালাল ট্রেড

স্টেট অব দ্য গ্লোবাল ইকোনমি রিপোর্ট অনুসারে, ২০২১ সাল নাগাদ বৈশ্বিক ইসলামিক অর্থনীতির পরিমাণ দাঁড়াবে তিন ট্রিলিয়ন ডলারে। এর নেপথ্যে আছে বেনিয়াগোষ্ঠীর নতুন চাল 'হালাল ট্রেড'। আর এই হালাল সংস্কৃতির আওতায় রয়েছে খাবার, ভ্রমণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, গুয়ুধ, কসমেটিকস, ইসলামিক ফিন্যান্স; এমনকি হালাল মিডিয়া, বিনোদন ও ফ্যাশন!

হালাল পণ্যের এই রমরমা বাণিজ্যের তোড়ে একদিকে সাধারণ মানুষ কিনছেন, কিনছেন আর কিনছেন; অন্যদিকে ফুলেফেঁপে উঠছে গুটিকয় মুনাফালোভীর পকেট।

এসব বিবেচনায় সচেতন হওয়ার সময় এসেছে আমাদেরও। পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই রমজানকে ঘিরে শুরু হয়েছে হরেক রকম প্রলোভন আর অপসংস্কৃতি। যা রমজানের মূল লক্ষ্য ও চেতনা থেকে আমাদের কেবল দূরে সরিয়েই দেয় না; বরং করে তোলে অপচয়কারী বা শয়তানের ভাই। অতএব সচেতন হোন। মহিমাম্বিত রমজানে বেনিয়াগোষ্ঠীর ফাঁদ থেকে নিজে বাঁচুন। বাঁচান আপনার আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনদের।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ানে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন
ফান, ফ্যাশন অ্যান্ড হালাল লিপস্টিক: রিটেইলার্স ক্যাশ
ইন অন টু হান্ড্রেড মিলিয়ন রামাদান ইকোনমি,
২৯ এপ্রিল ২০১৮

ঈদ কেনাকাটায় করণীয়

- আবেগবশত বা চাকচিক্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়; শুধু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই কেনাকাটা করুন।
- কম সময়ে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে দ্রব্যসামগ্রীর লিস্ট ও সম্ভাব্য বাজেট নির্ধারণ করে নিন।
- ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, ঋণ হলো একটি ফাঁদ যা থেকে সৃষ্ট মানসিক চাপ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, দুরারোগ্য ব্যাধি এমনকি মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
- আপনাকে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটায় উদ্বুদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম সুপারশপ। মানুষ যখন সুপারশপে থরে থরে সাজানো পণ্য দেখে, তখন সে প্রয়োজন ছাড়াই বেশি বেশি কেনে।
- ফ্রি ও ডিসকাউন্টের ফাঁদে পা দেবেন না। প্রয়োজনীয় পণ্যটি মানসম্পন্ন কিনা তা দেখে কিনুন।
- দোকান/ মার্কেট বন্ধ হওয়ার সময়সীমা খেয়াল রাখুন। শেষ সময়ে তাড়াহুড়ো করবেন না।
- অন্যের পছন্দ নিয়ে মন্তব্য করবেন না। নিজেও কেনার পর দামে ঠেকেছি, দেখতে ভালো হয় নি, মানাবে না-এ ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকুন।
- কেনার মোহগ্রস্ততা ও প্রতারণা থেকে রেহাই পেতে দান করুন। সম্ভব হলে শিথিলায়ন মেডিটেশন করে বাসা থেকে বের হোন।



কোয়ান্টাম বুলেটিন

জুলাই ২০১৮

সমমর্মিতা, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচারের সূতিকাগার হোক আমাদের পরিবার

ভার্চুয়াল ভাইরাসের এন্টিভাইরাস

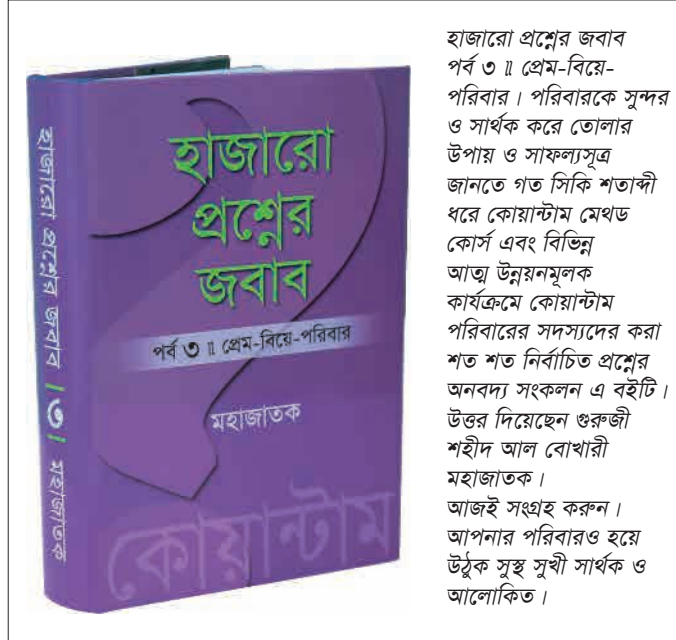
কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

পরিবার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের একক। ব্যক্তির জীবনও বিকশিত এবং পূর্ণ হয়ে ওঠে পরিবারকে কেন্দ্র করে। প্রতিটি মানুষের আবেগ-অনুভূতির একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে তার পরিবার ও পরিবারের মানুষগুলো। জীবনের প্রথম পাঠ, সুস্থ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা মানুষ সর্বপ্রথম লাভ করে তার পরিবার থেকেই। জীবনকে দেখতে শেখা আর পৃথিবীকে চেনার শুরু এখান থেকেই। সব মিলিয়ে বলা যায়-পরিবার হচ্ছে মানুষের শিকড়, জীবনের উৎসমূল। পরিবার থেকে অর্জিত শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি চিরদিনের। তাই আমাদের পরিবারগুলোকেই হয়ে উঠতে হবে সমমর্মিতা, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচারের সূতিকাগার।

বিশ্বজুড়ে আজ যেখানে যত অসহিষ্ণুতা, হানাহানি, হিংসা, সন্ত্রাস-সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা-অনুসন্ধান উঠে এসেছে যে, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এর সাথে সংযোগ রয়েছে পরিবারের। হিংসা-সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো যাদের দ্বারা ঘটে চলেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা হয় পরিবার-বিচ্ছিন্ন নয়তো তারা বেড়ে উঠেছে কলহপূর্ণ পারিবারিক আবহে। পারিবারিক অশান্তি-অস্থিরতা দিনের পর দিন তাদের করে তুলেছে অসহিষ্ণু ও আত্মসী।

এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে সর্বগ্রাসী পণ্যদাসত্ব ও লাগামহীন চাহিদা, নিত্যনতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার আর মিডিয়ার মরীচিকা। মানুষের আনন্দ-উপলক্ষগুলোও ক্রমশ হয়ে পড়ছে পণ্যনির্ভর।

এদিকে তথাকথিত আধুনিকতার তোড়ে শিশুজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ আজ হুমকির মুখে। গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীব্যাপী প্রতি তিন জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজন শিশু! সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভিডিও গেমস ও ইন্টারনেট আসক্তিকে স্থান দিয়েছে মানসিক রোগের তালিকায়। ফলে দেশ-জাতি নির্বিশেষে কমছে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষরণ, মনোযোগ



হাজারো প্রশ্নের জবাব
পর্ব ৩ ॥ প্রেম-বিয়ে-
পরিবার। পরিবারকে সুন্দর
ও সার্থক করে তোলার
উপায় ও সাফল্যসূত্র
জানতে গত সিকি শতাব্দী
ধরে কোয়ান্টাম মেথড
কোর্স এবং বিভিন্ন
আত্ম উন্নয়নমূলক
কার্যক্রমে কোয়ান্টাম
পরিবারের সদস্যদের করা
শত শত নির্বাচিত প্রশ্নের
অনবদ্য সংকলন এ বইটি।
উত্তর দিয়েছেন গুরুজী
শহীদ আল বোখারী
মহাজাতক।
আজই সংগ্রহ করুন।
আপনার পরিবারও হয়ে
উঠুক সুস্থ সুখী সার্থক ও
আলোকিত।

দেয়ার ক্ষমতা; অন্যদিকে বাড়ছে
সহিংস মনোভাবের প্রকোপ।

এর সাথে যোগ হয়েছে সামাজিক
যোগাযোগ মাধ্যমের নতুন মহামারি।
যার দরুণ মানুষ নিজের অজান্তেই
দিক্ভ্রান্ত হয়ে পড়ছে বায়বীয় সম্পর্কের
কানাগলিতে। গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে
তার বাস্তব, শোভন ও চিরায়ত
সম্পর্কগুলো। অর্থহীন লাইক ও
শেয়ারের স্রোতে ক্রমাগত দূরত্ব বাড়ছে
পরিবারগুলোতে।

মানুষ আজ হন্যে হয়ে জানতে
উৎসুক সারা দুনিয়ার প্রতি মুহূর্তের
খবর। কিন্তু ঠিক ততটাই সে উদাসীন
কাছের মানুষদের ভালো-মন্দ ও
প্রত্যাশার ব্যাপারে। স্বভাবতই তাই
হারিয়ে যাচ্ছে ন্যূনতম সম্প্রীতি,
সৌহার্দ্য, পারস্পরিক সম্মানবোধ ও
সমমর্মিতা। সম্পর্কের উষ্ণতার প্রকাশ
এখন শুধুই বিশেষ কিছু দিবসভিত্তিক।
এখানেও সেই ভোগবাদী বেনিয়াবৃত্তি
ও পণ্য-আগ্রাসনেরই দাপট। পরিবার-

বিচ্ছিন্ন মানুষ এভাবেই আটকে যাচ্ছে
আরো বেশি একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার
মর্মান্তিক ফাঁদে।

এ অবস্থার প্রতিকারে এখন
পৃথিবীজুড়ে প্রচারিত হচ্ছে নানারকম
মতাদর্শ, আইডিয়া ও বিশেষজ্ঞদের
পরামর্শ। যার সারকথা ও নির্যাস গত
দু-যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রতিধ্বনিত
হচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ও
কোয়ান্টামের বিভিন্ন আত্ম উন্নয়নমূলক
কার্যক্রমগুলোতে। সেই শুরু থেকেই
কোয়ান্টাম বলেছে-সুখের একটি বড়
উৎস পরিবার। পরিবার সুস্থ তো ব্যক্তি
সুস্থ, সমাজ সুস্থ, জাতি সুস্থ এবং
রাষ্ট্রও থাকবে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ।
আর এজন্যে দরকার পরিবারে
নৈতিকতা, শুদ্ধাচার ও সমমর্মিতার
চর্চা। সদাচারের পারিবারিক চর্চাই
ক্রমান্বয়ে সঞ্চারিত হবে দেশের
সর্বস্তরে। এর সূত্র ধরেই আমাদের
উত্তরণ ঘটবে এক সুখী সমৃদ্ধ নৈতিক
ও মানবিক মহাসমাজে।

আগামী ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ জুলাই
অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড
কোর্সের ৪৪৮ তম ব্যাচ। ভেন্যু :
ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি
মিলনায়তন। জীবন বদলের এ
অভিযাত্রায় অংশ নিন আপনিও।
ধ্যানশিক্ষার পাশাপাশি এতে রয়েছে
প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য আর সাফল্য
অর্জনের চিরায়ত সূত্রগুলো।

এ কোর্সের শিক্ষা একজন
মানুষকে মুক্তি দিতে পারে এ-কালের
অভিশাপ ভার্চুয়াল ভাইরাস আসক্তি
থেকে। ফেসবুক, ইউটিউব, ভিডিও
গেম ও ইন্টারনেট আসক্তিসহ যাবতীয়
ভার্চুয়াল ভাইরাসকে প্রতিহত করতে
এন্টিভাইরাস হিসেবে কাজ করবে
কোয়ান্টাম মেথড কোর্স।

২৬ বছরের পথ পরিক্রমায়
কোয়ান্টাম পরিবারে যুক্ত হয়েছেন নানা
শ্রেণি-পেশা-বয়সের লাখো মানুষ।
মেডিটেশন চর্চা ও সঠিক জীবনদৃষ্টি
অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ যেমন
উপকৃত হচ্ছেন, তেমনি এর ইতিবাচক
প্রভাব পড়ছে পরিবারে ও সমাজে।
ইতোমধ্যেই সোশ্যাল-মিডিয়া আসক্ত
তরুণরা মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে
সচেতন হয়ে উঠেছে। বেরিয়ে আসছে
প্রযুক্তিপণ্যের আসক্তি থেকে।

সচেতন মানুষ সবসময়ই খুঁজেছে
প্রতিটি সমস্যার কার্যকর সমাধান আর
প্রতিটি যুগযন্ত্রণার প্রতিকার। তবে
প্রতিকার তখনই সম্ভব হয় যখন
একজন মানুষ তার নিজের দায়িত্ব
নিজে গ্রহণ করে। চার দিনের এ
কোর্সে অংশগ্রহণের প্রথম প্রাপ্তি
এটাই। তাই নিজে অংশ নিন এবং
উদ্ধৃত করুন আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনদের।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৪৯ ব্যাচ ॥ ঢাকা

১০, ১১, ১২ ও ১৩ আগস্ট
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা



১৫/১০/১৮

জানতে হবে নিজের দেশ, মানুষ ও সংস্কৃতিকে রফিকুন্ নবী

আমি তখন বেশ ছোট। প্রতিবেশী দারোগা সাহেবের বাচ্চাদের সাথে খেলতাম। আমরা ছিলাম প্রায় একই বয়সী। হঠাৎ একদিন দেখি এ হিন্দু পরিবারটি নেই। তারা ভারতে চলে গেছে। আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল সেদিন।

ভারতে চলে গেল কেন? আর কোনোদিন ফিরবে না? এমনই কত প্রশ্ন তখন আমার মনে। ওই বাসাতেই নতুন দারোগা এলেন ভারত থেকে। এ পরিবারটি মুসলমান। তাদের ছোট বাচ্চাটি আমারই বয়সী। তারপরও মানুষগুলো এক নয়। ছোটবেলায় ঘটনাটি সাংঘাতিক দাগ কেটেছিল আমার মনে।

সেসময় আমরা গ্রামের বাড়িতে যেতাম ব্রডগেজ ট্রেনে। যাওয়া-আসার পথে দেখতাম অগণিত মানুষের ভিড়। মুসলমান পরিবারগুলো ভারত থেকে চলে আসছে আমাদের দেশে। আর হিন্দু পরিবারগুলো চলে যাচ্ছে ভারতে। তখন দেশভাগ কী আর কেনই-বা হলো এসব আমি কিছুই বুঝি না।

১৯৪৭-এ দেশভাগের আগের ঘটনা মনে পড়ে। আমার বাবা তখন পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন ফতুল্লা থানায়। আমার তখন চার বছর বয়স। সেসময় আমাদের গ্রামের সব মানুষ একাট্টা হয়ে নাটক দেখত। ব্রিটিশবিরোধী নাটক সিরাজউদ্দৌলা। দেখতাম সিরাজউদ্দৌলা ভূমিকায় অভিনয় করছেন একজন হিন্দু ভদ্রলোক। হিন্দু-মুসলমান বৈরিতার কথা আমরা পরবর্তীকালে শুনেছি কিন্তু এগুলো কিছুই দেখি নি।

আমার দাদাও ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পারিবারিক চাপের মুখে আমার বাবা চাকরিতে ঢুকতে বাধ্য হলেন। অথচ বাবার ছিল ছবি আঁকার শখ। কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করেও ভর্তি হতে পারলেন না। কিন্তু সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তিনি ছবি আঁকতেন। বাবা স্টেট-পেন্সিল দিয়ে আমাকে দেখাতেন হাতী কীভাবে আঁকতে হয়, পাখি কীভাবে আঁকতে হয়। আমি বাবার মতো সুন্দর করে আঁকতে চেষ্টা করতাম। এই থেকে ছবি আঁকার প্রতি আমার আগ্রহ তৈরি হতে থাকল।

আঁকার প্রতি ভালোলাগা থেকেই আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। তবে আমার চেয়েও এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহ বাবারই ছিল। ১৯৬৪ সালে আমি ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম এবং আমার রেজাল্ট বেশ ভালো হলো। রেজাল্টের দিনই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমাকে চারুকলায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে বললেন। কিন্তু থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়েই আমি

খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী ও কার্টুনিস্ট
রফিকুন্ নবী। বহুমুখী সৃজন
প্রতিভা ও অর্ধশতাব্দী-কালব্যাপী
শিল্পসাধনায় তিনি সমৃদ্ধ করেছেন
বাংলাদেশের চিত্রকলার ভুবনকে।
দীর্ঘ পাঁচ দশকের
শিক্ষকতা-জীবনে তিনি ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা
ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং
চারুকলা অনুষ্ঠানের ডিন হিসেবে
দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে
চারুকলার ড্রইং এন্ড পেইন্টিং
বিভাগের সুপারনিউমেরারি
অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত
আছেন তিনি। ৭ মে কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসিক
মুক্ত আলোচনায় তার
বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ
এখানে তুলে ধরা হলো।



অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশনস-এ পার্ট টাইমে কাজ শুরু করি। ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা শেষে এখানেই কাজ করব, বড় প্রচ্ছদশিল্পী হবো। তবে শেষ পর্যন্ত আবেদিন স্যারের কথা এবং বাবার কথা আমি ফেলতে পারি নি। বৃহস্পতিবার রেজাল্ট হলো আর সোমবার আমি চারুকলায় যোগদান করলাম।

ছাত্রজীবন থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত নানান কিছু দেখেছি। দেশ নিয়ে আমাদের মধ্যে তখন নানান অনুভূতি-উপলব্ধি তৈরি হচ্ছে। কেন মানুষ মুক্তি চায় তা যেন আমরা একটু একটু করে বুঝতে পারছি। ১৯৫২-তে ভাষা আন্দোলনের পর আমাদের দেশে একটার পর একটা রাজনৈতিক আন্দোলন হচ্ছিল, তার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে শিল্পীদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। আমরা তখন মিছিল সাজানোর জন্যে কার্টুন পোস্টার আঁকছি। আমাদের ভাবনা ছিল-৫০০ জন মানুষ মিছিলে থাকবে, প্রত্যেকের হাতে যেন একটা করে ব্যানার থাকে, ফেস্টুন থাকে, পোস্টার থাকে। এসব আয়োজন নিয়ে চারুকলা তখন সাংঘাতিক ব্যস্ত। আমরা ছড়ার বই বের করলাম ৬৯-এর ছড়া। বিখ্যাত হয়ে গেল ছড়ার বইটি। এই কাজগুলো আর্টিস্টরাই করেছিল। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে এসব আন্দোলন ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এসে দাঁড়াল।

এভাবেই আমাদের একেকটা ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। একটা বৈরী সময়ের মধ্য দিয়ে শিল্পকলা চর্চা করতে হয়েছে, যা সহজ ছিল না মোটেই।

শিল্পী হিসেবে আমি ভাবতাম-রোমান্টিক ছবি আঁকব, প্রকৃতি আঁকব, মানুষ আঁকব। কার্টুন আঁকতে হবে এমন কথা কখনো ভাবি নি। দেশ, কাল এবং চারপাশের অবস্থা চিন্তা করে কার্টুনচর্চার সাথে আমার সম্পৃক্ততা। মিছিলের জন্যে কার্টুন আঁকা শুরু হয়েছিল। করতে করতে স্বাধীনতার পরে পত্রিকায় কার্টুন করা। হঠাৎ আমার মনে হলো যে, অনেক আগে ছোট পথশিগুকে নিয়ে আমি এমনই কার্টুন করতাম। হাস্যরসাত্মক কার্টুন। ভাবলাম ওদের মধ্য থেকে একটা চরিত্র ঠিক করি এবং তার একটা নাম দিয়ে দেই।

শুরু করলাম টোকাই নাম দিয়ে। টোকাই একসময় আমার চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সবকিছুই উঠে আসত টোকাই-এর বুদ্ধিদীপ্ত ও সরস মন্তব্যে।

আমরা শিল্পীরা কি আমাদের দেশকে ভুলে কিছু করতে পারব? অন্য কিছু ভাবতে পারব? পারব না। অতএব আমাদের দেশকে নিয়ে ভাবতে হবে।

দীর্ঘ শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি, শিল্পী হওয়াটা আসলে দুরকমের। ট্যালেন্ট নিয়ে জন্মালে একরকম। আবার তথাকথিত ট্যালেন্ট নেই, অথচ শিল্পী হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে আর্ট কলেজে এসেছে-তাকে দিয়েও হবে। তবে তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, নিজেকে তৈরি করতে হবে।

শিল্পী হিসেবে আমারও নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে। আমাকে সহযোগিতা করেছে পরিবেশকে

দেখা, শোনা ও জানার আগ্রহ। একজন শিল্পীকে তার দেশ, দেশের মানুষ-সংস্কৃতি-পরিবেশ সবকিছু সম্পর্কে জানতে হবে। চারপাশকে গভীরভাবে দেখা ও শোনার দক্ষতা তাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেননা সর্বমিলিয়েই আমাদের জীবন। আর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

অনুলিখিত

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন শিক্ষক। অটিজম নিয়ে কাজ করছি। আমার এক ছাত্রের বয়স চার বছর। সে অটিস্টিক। শিশুটি কথা বলতে পারে না। ওর মা-বাবা দুজনই উচ্চশিক্ষিত।

শিশুটিকে আমি গত একবছর ধরে অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপি দিচ্ছি। এর আগে যত চাইল্ড সাইকোলজিস্ট ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানো হয়েছে, সবাই এককথায় বলেছেন-ওর সমস্যা তৈরি হয়েছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে।

পরবর্তীতে আমিও দেখলাম, ওদের বাসায় সর্বক্ষণ ওয়াইফাই সংযোগ রয়েছে এবং তিনটি ট্যাব, চারটি স্মার্টফোন আর স্মার্ট টিভি প্রায় ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে। ওর মাকে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেছেন-নয় মাস বয়স থেকেই বাচ্চাকে ট্যাব দিয়ে শান্ত করা হতো, খাওয়ানো হতো। বাচ্চাদের সামলানো এবং ঘরের অন্যান্য কাজ, সবমিলিয়ে তার জন্যে খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। তাই তিনি ট্যাবে ভিডিও চালিয়ে সন্তানকে বসিয়ে রাখতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে আপনার আলোচনা শুনে আমি ভার্সুয়াল ভাইরাসের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। গত ডিসেম্বরে শিশুটির মা-বাবাকে আমি ভার্সুয়াল ভাইরাস বুলেটিন এবং স্টিকারগুলো দেই। আপনার আলোচনার কিছু পয়েন্টও তাদের সাথে শেয়ার করি। এরপর তারা এ বিষয়ে সচেতন হন এবং বাসায় ট্যাব, স্মার্টফোন, স্মার্ট টিভি এবং ওয়াইফাই বন্ধ করে দেন। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

শিশুটি এখন কথা বলতে পারছে। সে এখন ওর মাকে বলে, ‘আই লাভ ইউ মাম্মি।’ ওর আচরণেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। সে এখন অনেক শান্ত এবং তাকে খাবার খাওয়াতেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

গুরুজী, আপনার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার যে পেশা, তাতে আমি প্রতিনিয়ত ভাবছিলাম-এ ধরনের বাচ্চাদের মা-বাবাকে আমি স্মার্টফোন, স্মার্ট টিভির ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে কীভাবে বুঝাব। ভার্সুয়াল ভাইরাস নিয়ে কোয়ান্টাম যে কাজগুলো করছে এবং যে প্রকাশনাগুলো বের করেছে, এতে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

আমি বর্তমানে ১১টি শিশুকে থেরাপি দিচ্ছি। এর মধ্যে দুই জন হলো জেনেটিক্যালি ডিজঅ্যাবল আর বাকি নয় জনের সমস্যাই তৈরি হয়েছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে।

আমার জন্যে দোয়া করবেন যেন আজীবন কোয়ান্টামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

শামীমা আক্তার মুন্নি
শিক্ষক
৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আমার সালাম নিবেন। এবছর আমার কোয়ান্টামে অনুষ্ঠিত আর্ডেন্টারিয়ার ওয়ার্কশপে আপনি ভার্সুয়াল ভাইরাস নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন। এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং এ আসক্তি থেকে মুক্তির জন্যে আমাদের করণীয়-সবই ছিল আপনার আলোচনায়।

এতে অংশ নিয়ে উপলব্ধি করলাম, আমার এন্ড্রয়েড ফোনটির কোনো দরকার নেই। কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অনলাইনে যতটা যুক্ত থাকতে হয়, তা আমি অফিসে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপেই করে নিতে পারি। তাছাড়া কথা বলার জন্যে শুরু থেকেই আমি সাধারণ ফোন ব্যবহার করি।

এর মধ্যে একদিন রাতে আজিমপুর থেকে মিরপুরে বাসায় যাচ্ছিলাম। এন্ড্রয়েড ফোনটি আমার পাঞ্জাবীর পকেটে ছিল। বাস থেকে নামতে গিয়ে দেখি ফোনটি আর নেই। বুঝতে পারলাম পকেটমার নিয়ে গেছে। এত দামি মোবাইল ফোনটা হারিয়ে ফেলেও বেশ আনন্দিত হলাম। জিনিস হারানোর পর এরকম অনুভূতি জীবনে এই প্রথম। কেমন যেন ভারমুক্ত লাগছিল।

আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই। প্রয়োজন ফুরাল আর সাথে সাথে বর্জন করে দেয়াও হলো।

কাজী মিজানুল ইসলাম
অধ্যক্ষ
সৈয়দ বজলুল হক কলেজ, বাইশারী, বরিশাল
১৩৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।
ফেসবুকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আপনার এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ভূমিকায় আমরা গর্বিত। সাম্প্রতিক সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ঘটে যাওয়া এ ধরনের একটি ঘটনা আপনাকে জানাতে চাই।

সম্প্রতি হযরানির শিকার হওয়া আইন বিভাগের ৩০-৪০ জন ছাত্রীর মধ্যে ১১ জন সম্মিলিতভাবে আবেদন করে যে, আইন বিভাগের ২য় বর্ষের একটি ছাত্র তার ফেক আইডি থেকে তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে অন্ত্রীল ছবি, মেসেজ ও ভিডিও পাঠিয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় এ ছাত্রীদের পরীক্ষা খারাপ হয় এবং তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

থানায় অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ২০ মার্চ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মেসেজ প্রেরণরত অবস্থায় তার মেস থেকে হাতে-নাতে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। ছেলেটি তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে এবং পরদিন ২১ মার্চ মুচলেকা নিয়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়।

পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে তদন্তকালে লিখিত জবাবে সে বলে, অন্য

কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বা কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে কাজটি করে নি। শুধু ‘ফান’ করার জন্যে এ-কাজটি সে করেছে এবং এখন সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত। তদন্ত কমিটিকে আরো জানায়, শুধু দুজনকে সে খারাপ মেসেজ দিয়েছে। বাকিদের ক্ষেত্রে ভুলে চাপ লেগে মেসেজ চলে গেছে।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হলে একজন ছাত্রী জানায়, এরকম বাজে ছেলের সাথে কোনোভাবে একই কাম্পাসে পড়ালেখা করা সম্ভব নয়। আরেকজন জানায়, মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেয়ার পর ছেলেটি তার নামে আজীবন কথ্য বলছে। সে ভীত কারণ আসামি তার ক্ষতি করবে। কোনো কোনো ছাত্রীর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও সে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে। অধিকাংশ ছাত্রীরই ভাষ্য, ইচ্ছাকৃতভাবে পরীক্ষার আগের রাতে সেই ছেলে মেসেজ দিত এবং পরবর্তীতে তাদেরকে ফোন করে হুমকি দেয় এবং থানা থেকে অভিযোগ তুলে নিতে বলে।

গুরুজী, সমাজের প্রত্যাশা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা একজন ছাত্র সুনামগরিব হিসেবে গড়ে উঠবে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রের দ্বারা অনেক ছাত্রী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং হযরানির শিকার হয়েছে। এ নির্যাতন চলেছে অনেকের সাথে এবং দীর্ঘদিন।

যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন একজন শিক্ষার্থীর পড়ালেখা ও স্বাভাবিক জীবনকে বিঘ্নিত করে এবং এ ধরনের ঘটনা স্থায়ী শারীরিক ক্ষতির কারণও হতে পারে। সম্মানহানির ফলে কেউ বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ।

গুরুজী, ইতোমধ্যেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ছেলেটির ছাত্রত্ব বাতিল করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি আবাসিক হলে ওয়াইফাই ফ্রি থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা সারা রাত জেগে ইন্টারনেট ব্যবহার করে আর ঘুমাতে যায় ভোরবেলা। সকালে ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো ক্লাসও করতে পারে না। একজন শিক্ষক এবং অভিভাবক হিসেবে আমি মনে করি, ইন্টারনেটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার।

আপনি দোয়া করবেন, ভার্সুয়াল ভাইরাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমরা যেন নিজেরা মুক্ত থাকতে পারি এবং অন্যদের সচেতন করতে পারি।

ড. আব্দুল আলীম
সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি আবাসিক হলে
ওয়াইফাই ফ্রি থাকার কারণে
ছাত্রছাত্রীরা সারা রাত জেগে
ইন্টারনেট ব্যবহার করে
আর ঘুমাতে যায় ভোরবেলা।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৯ গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স—নিজের জীবন নিজে গড়তে পারার এক বৈজ্ঞানিক পথ নির্দেশনা। ২৬ বছর ধরে এ কোর্সের ৪৪৭টি ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। অংশগ্রহণ করেছেন লাখে মানুষ। মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে বদলে ফেলেছেন তাদের পুরনো অভ্যাসচক্র। অর্জন করেছেন সুস্থ সফল সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব। চার দিনের এ কোর্স সম্পন্নকারীরাই হলেন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। এবারের আয়োজনে রয়েছে তাদেরই কয়েকজনের কোর্সে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা—

শিক্ষা কারিকুলামে কোর্সের বিষয়গুলো থাকা উচিত

অধ্যাপক ড. বশির আহমেদ



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমার চেতনাগত যে রূপান্তর ঘটেছে, এতে আমি আনন্দিত। ধ্যানের শিক্ষা আমাকে নিজের শক্তি, কাজ ও সম্ভাব্যে খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। ২০০০ সালে গুরুজীর

একঘণ্টার একটি কোয়ান্টাম সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখান থেকেও আমি অনেক কিছু জেনেছি। এরপর উচ্চতর ডিগ্রির জন্যে বিদেশে যাই এবং নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এখন মনে হচ্ছে, ১৭ বছর আগে কোর্সটি করলে জীবনে আমি আরো পরিবর্তন আনতে পারতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আমরা যে সিলেবাস অনুযায়ী পড়াই, তাতে অনুপ্রাণিত করার মতো তেমন কিছু থাকে না। শুধু তাত্ত্বিক বিষয়গুলো পড়ানো হয়। কিন্তু এগুলো তাদের ব্যক্তিজীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কীভাবে কাজে লাগতে হবে তা পড়ানো হয় না।

গুরুজী এ চার দিন আত্ম উপলব্ধি ও আত্ম উন্নয়নের যে কৌশল শেখালেন, এগুলো অনুসরণ করলে আমাদের দেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। সেইসাথে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামে এ কোর্সের শিক্ষাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হলে বাংলাদেশে জগৎ উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

[অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৩৭ ব্যাচ]

ব্যাকপেইন ও পায়ের ব্যথা থেকে আমি এখন মুক্ত

তপতী রানী সাহা



সাত বছর ধরে আমার খুব ব্যাকপেইনের সমস্যা। তখন থেকেই ডাক্তার আমাকে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি একটানা আধা ঘণ্টার বেশি দাঁড়িয়ে বা বসে থাকাও নিষেধ ছিল।

ডাক্তার বলেছিলেন, ব্যাকপেইন থাকবে সবসময়।

ব্যাকপেইনের জন্যে কোর্সে প্রথম দুদিন আমি মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে পারি নি। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে কোনো ব্যথা ছাড়াই আমি মেরুদণ্ড সোজা রেখে মেডিটেশন করেছি। সিঁড়ি বেয়েও আমি ওঠা-নামা করতে পারছি।

এ-ছাড়া স্নায়বিক জটিলতার কারণে আমার পায়ের বেশ ব্যথা ছিল। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে বা একটু হাঁটলে তা আরো বেড়ে যেত। কিন্তু কোর্সে এসে মেডিটেশন করে আমার পায়ের ব্যথাটা নেই।

কোর্সের প্রতিটি মেডিটেশনই আমার জন্যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা। কোর্সের তৃতীয় দিন নিরাময়ের মেডিটেশন করে আমার মাইগ্রেনের ব্যথাও চলে গেছে। অথচ ১৬ বছর ধরে আমার মাইগ্রেনের প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। এখন আমি কোনো স্ট্রেস বা ক্লান্তি বোধ করছি না। কোয়ান্টামে এসে আমি জীবনের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছি।

[সিনিয়র স্টাফ নার্স, বক্ষব্যাপি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা। ৪৩৭ ব্যাচ]

জীবন বদলের বিজ্ঞান শেখানো হয়েছে এ কোর্সে

মো. মনিরুল ইসলাম

সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি, বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে যে সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। তাহলেই মানুষ যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। এ সমস্যামুক্তির কথাগুলোই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে বলা হয়েছে।

এখানে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে সমাজ পরিবর্তনের কথা। অন্যের অসুবিধা না করে নিজেকে বদলানোর মাধ্যমেই আসলে সমাজকে বদলানো সম্ভব। কীভাবে নিজের ভেতরে এ পরিবর্তন আনা সম্ভব, সেই পদ্ধতিই শেখানো হয়েছে কোর্সের চার দিন। কথাগুলো আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছি।

আর আমার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিশুদের দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমাদের নিজের সন্তানদের আর এসব বঞ্চিত শিশুদের লালনপালনে কোনো পার্থক্য নেই। আমি সত্যিই অভিভূত!

[সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৩৮ ব্যাচ]

মনছবি নির্ধারণ করেছি

অর্পিতা সাহা



টিভি দেখার প্রতি আমার আসক্তি ছিল। পড়াশোনার জন্যে টিভি দেখার সময় পেতাম না বলে আমি সবসময় সুযোগ খুঁজতাম, কীভাবে টিভি দেখব। তাই খাবার সময় আমার পুরো মনোযোগ থাকত

টিভির দিকে।

কিন্তু কোর্সের এই চার দিন আমি টিভি দেখা ছাড়াই খেয়েছি। এখানে এসে আমি বুঝতে পেরেছি, খাবারের সময় খাবারের প্রতিই মনোযোগী হওয়া উচিত, অন্যদিকে নয়।

আমার ধারণা ছিল যে, পড়ালেখা নিয়ে বেশি টেনশন করলে রেজাল্ট ভালো হয়। কিন্তু এখন জানতে পারলাম, ভালো রেজাল্ট করার জন্যে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং নিয়মিত পড়াশোনা করাই যথেষ্ট।

আগে কোনোকিছু পড়ে মনে হতো, পরীক্ষার হল পর্যন্ত মনে থাকবে তো? দেখা যেত পরীক্ষার হলে গিয়ে ঠিকই ভুলে যেতাম। কিন্তু এখন আত্মবিশ্বাসী হয়েছি যে, আমি যা পড়েছি প্রয়োজনে তা অনায়াসে মনে করতে পারব।

আমার লক্ষ্য স্থির ছিল না। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে মনছবির মেডিটেশনে আমি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পেরেছি।

[ব্যবসায়ী। ৪৩৮ ব্যাচ]

রাগ কমাতে পেরেছি, পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে

জাফর চৌধুরী



আলোচনায় গুরুজী বলেছেন, মোবাইল ফোন শয়তানের বাস। আমি বলি, এটা দোজখের বাস। এই মোবাইল ফোন আমার ডান কানের শ্রবণশক্তিই নিয়ে নিয়েছে। পেশাগত প্রয়োজনে ফোন বেশি ব্যবহার করতাম। একদিন ফোনে কথা বলতে বলতে খেয়াল করলাম, আমি কোনো শব্দ শুনতে পারছি না। ডাক্তার আমাকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। সাথে কিছু ওষুধও দিলেন। ধীরে ধীরে কানের অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলেও আগের মতো স্পষ্ট শুনতে পেতাম না। কিন্তু মেডিটেশন করে এখন আর কানের সমস্যাটা হচ্ছে না।

২০ বছর ধরে আমার ঘুমের সমস্যা। আর সবসময় মাথা গরম হয়ে থাকত। পরিবারের কারো সাথে আমি ভালোভাবে কথা বলতাম না। তাই ভারতে চিকিৎসার জন্যে গেলাম। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আমাকে নিয়মিত একটি ওষুধ

খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। শুধু এটা খেলেই আমি ভালোমতো কাজ করতে পারতাম এবং রাতে ঘুম হতো।

এর মধ্যে এক বন্ধু আমাকে কোয়ান্টামের সাদাকায়ন প্রোগ্রামে নিয়ে এলো। এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগল এবং সিদ্ধান্ত নিলাম আমি মেডিটেশন কোর্সটি করব। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! কোর্সে মেডিটেশন করে এখন আমি কোনো ওষুধ ছাড়াই রাতে ঘুমাতে পারছি। আমার রাগও নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পরিবারে সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারছি।

[ব্যবসায়ী। ৪৩৮ ব্যাচ]

কোর্সের শিক্ষাটা একজন মানুষের খুব দরকার

জাকিয়া কামরুন নাহার



বড় বড় একাডেমিক ডিগ্রি, বেতনের পরিমাণ, গয়না-টাকা, স্টাটা স - এ বিষয়গুলোর গুরুত্ব সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি। কিন্তু কোর্সে এসে অনুভব করলাম - জীবনের জন্যে কোন জিনিসটি

কতটুকু প্রয়োজন তা বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের থাকে না। অথচ একজন মানুষের জীবনে এ শিক্ষা খুব দরকার।

আমি সবসময় একজন শুদ্ধ মানুষ হতে চেয়েছি। আমার সামনে অনেক পথও ছিল। কিন্তু সে পথের যাত্রা কেমন হওয়া উচিত তা কোয়ান্টামে আসার আগে আমি জানতাম না।

ছোটবেলা থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। কিন্তু জীবনযাপনের বিজ্ঞান কখনো শিখি নি। চার দিনের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার আগে আমি বুঝতে পারি নি, এ কোর্সের বিশালতা এবং মেডিটেশনের গুরুত্ব এত বেশি। এখন মনে হচ্ছে, কত কিছু আমার অজানা ছিল!

[গবেষক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৩৭ ব্যাচ]

সময়মতো ঘুমাতে পারি ও ঘুম থেকে উঠতে পারি

সামিত রহমান



ঘড়িতে এলার্ম না দিলে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারতাম না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের প্রথম দিন গুরুজী শেখালেন, মনের বাড়িতে গিয়ে মনের ঘড়িতে কীভাবে এলার্ম দিতে হয়।

সেদিনই বাসায় গিয়ে আমি রাতে ঘুমানোর আগে নিয়মমতো মনের বাড়িতে গেলাম এবং সকালে আমি কয়টায় জেগে উঠতে চাই তা নির্ধারণ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! নির্ধারিত সময়েই আমি ঘুম থেকে উঠতে পেরেছি।

আগে আমি রাতে ঘুমাতেও দেরি করতাম। বিছানায় শোয়ার পরে এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় চলে যেত। কোর্সের দ্রুত ঘুম আসার পদ্ধতি-আয় ঘুম আয় অনুসরণ করায় এখন আমি দ্রুত ঘুমাতে পারি।

এ কোর্সে অংশ নেয়ার আগে কারো সাথে কথা বলতে অনেক সংকোচ হতো। কিন্তু এখন আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। সহজেই সবার সাথে কথা বলতে পারছি। কারণ আমি মনে মনে অটোসাজেশন দেই, আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী। আমি পারি আমি করব। আমার জীবন আমি গড়ব।

[চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট জ্যাকব স্কুল, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ৪৩৭ ব্যাচ]

আমার জীবন আবার শুরু করতে পারব

নাজমুন নাহার রোজিয়া

গত ২০ বছর ধরে আমি মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছিলাম। এজন্যে অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। কোনো লাভ হয় নি। প্রচণ্ড মাইগ্রেনের ব্যথায় আমার বমি হতো এবং আমাকে শুয়ে থাকতে হতো।

কোর্সের দ্বিতীয় দিনও আমার খুব মাইগ্রেনের ব্যথা ছিল। গুরুজী আলোচনায় বললেন, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে এ সমস্যাগুলো দূর করা সম্ভব। তখন আমি মেডিটেশনে নিজেকে বললাম, মাইগ্রেনের ব্যথা থেকে আমি মুক্ত। সত্যি সত্যি এক পর্যায়ে দেখলাম আমার মাথাব্যথা নেই। আমাকে আর কোনো ওষুধও খেতে হচ্ছে না।

মন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি শিখে এখন আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। এতদিন আমি হতাশায় ডুবে ছিলাম। পরিবারে স্বামী ও সন্তানের সাথে রাগারাগি করতাম। কিন্তু কোর্স থেকে বাসায় গিয়ে আমার সন্তানদের সাথে গুরুজীর শোনানো গল্পগুলো বললাম। আমার সন্তান বলছে, 'মা তুমি হাসছ!' আমি এখানে এসে আবার হাসতে পারছি। নিজের ভেতরে একটা শক্তি পেয়েছি। এখন আমি আমার জীবন আবার শুরু করতে পারব।

[শিক্ষক, রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। ৪৩৮ ব্যাচ]



এ জ্ঞান আমার রোগীদেরও উপকার করবে

ডা. মো. আবুল হোসেন

এ কোর্সে অংশ নিতে কোর্স ফি যা দিয়েছি, তা-তো হিসাব করে দিয়েছি। কিন্তু এখান থেকে যা নিয়ে যাচ্ছি তা আসলে অমূল্য।

আমি মনে করেছিলাম, এ কোর্সে হয়তো মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে কিছু বলা হবে না। কিন্তু এখানে রোগ এবং সুস্থতা নিয়ে

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অসংক্রামক রোগের কথাও আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এই অসংক্রামক রোগের গবেষণা ও চিকিৎসার জন্যে বর্তমানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু কোর্সে এসে উপলব্ধি করলাম, অসংক্রামক রোগের হাত থেকে বাঁচতে ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানসম্মত একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি এই কোয়ান্টাম মেথড। আমার মনে হয়, সর্বমহলে এ মেথড চর্চা করলে মানুষের রোগ কমে যাবে এবং গড় আয়ুও বেড়ে যাবে।

এ কোর্সের কিছু কথা আমার খুব ভালো লেগেছে। যেমন : কুল দ্যা ব্রেন এন্ড ক্লিন দ্যা হার্ট। কোর্সে যা শিখলাম, তা আমার জীবনে চর্চা করব। আমার সাথে আমার রোগীরাও এতে উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

[প্রধান গবেষক, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব মেডিসিন, এগ্রিকালচার এন্ড নিউট্রিশন, মিরপুর, ঢাকা। ৪৩৮ ব্যাচ]



সুস্থ হওয়ার আত্মবিশ্বাস পেয়েছি

ফাতেমা সুলতানা



পাঁচ বছর ধরে আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। ২০১৬ সালে চিকিৎসকরা জানালেন আমার দুটো পা-ই কেটে ফেলতে হবে। কারণ আমার পা ফেটে পানি বের হতো। এমন দুঃসময়ে আমার একজন কোয়ান্টাম

থ্রাজুয়েট আত্মীয় মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দানের এবং মেডিটেশন চর্চার পরামর্শ দিলেন।

আমি নিয়মিত দান করতে শুরু করলাম। সেইসাথে অডিও শুনে মেডিটেশন করতে লাগলাম। লক্ষ করলাম, ধীরে ধীরে আমার মাঝে সুস্থ হওয়ার আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। কিছুদিন পর পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে চিকিৎসকদের কাছে গেলাম। তারা অবাক হয়ে বললেন, ইনফেকশন কমতে শুরু করেছে, আমার পা কাটার কোনো প্রয়োজন নেই।

এখন আমি সিঁড়ি বেয়ে দিব্যি ওঠা-নামা করছি। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। মেডিটেশন করে আমি অনেক ভালো আছি।

[গৃহিণী। ৪৩৭ ব্যাচ]

বিশ্বাস করি—আমি পারব

সুলতানুল আরেফীন ইয়ালিদ

তুমি কিছু পারবে না, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না—এসব নেতিবাচক কথায় আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলাম। ছোটখাটো অসুখেও আমি উচ্চমাত্রার এন্টিবায়োটিক ওষুধ খেতাম। কিন্তু কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে উপলব্ধি করেছি, আমাদের শরীরের নিজস্ব যে নিরাময় ক্ষমতা আছে তা ওষুধের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

ছয় মাস আগে আমি কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট থেকে মেডিটেশনের অডিও ট্র্যাক ডাউনলোড করি। এবং নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা শুরু করি। এরপরই আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি এখানে এসেছিলাম বিষণ্ণ ও ক্লান্ত একজন মানুষ হিসেবে। ফিরে যাচ্ছি একজন সৎ সাহসী ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী একজন মানুষ হয়ে। এখানে না এলে আমি নিজেকে চিনতে পারতাম না। এখন আমি বিশ্বাস করি—আমি পারব।

[বিবিএস (২য় বর্ষ), সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর। ৪৩৭ ব্যাচ]



প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : আমি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রোগে ভুগছি। যেমন, আইবিএস দুশ্চিন্তা পেরেশানি ভয় অনিদ্রা, প্রস্রাবে সমস্যা, পেটে সমস্যা, সবসময় পাতলা পায়খানা এবং প্রচণ্ড মাথাব্যথা। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : বোঝা যাচ্ছে, আপনার মধ্যে টেনশন কাজ করছে। আপনি নিয়মিত শিথিলায়ন করছেন না। আপনার সবগুলো সমস্যাই হচ্ছে মনোদৈহিক। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর ও মনকে শিথিল করতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যাগুলো থাকবে। সুস্থতার জন্যে কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করবেন। কোয়ান্টাম ইয়োগা অনুশীলন করবেন এবং দুইবেলা শিথিল প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন করবেন।

শারীরিক পরিশ্রমও দরকার। সুযোগ থাকলে ৪০ দিন লামাতে গিয়ে খেদমতায়ন করে আসুন। সেখানে সকাল থেকে একটা রুটিন অনুসারে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক হবে, মেন্টাল ওয়ার্ক হবে। ইনশাল্লাহ আপনার সমস্যাগুলো থাকবে না।

সাধারণত এই রোগগুলো হয় অলস লোকদের। যাদের শারীরিক কোনো পরিশ্রম নেই এবং পরিবারের ওপর নির্ভরশীল, এ রোগগুলো তাদের হয়। তাই যে বিষয়গুলো বললাম, সেগুলো অনুসরণ করুন। শুধু বসে বসে আপনি ভালো হবেন না, আপনাকে কর্মব্যস্ত থাকতে হবে। নিজেকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে।

প্রশ্ন : আমার স্বামী অত্যন্ত স্বাস্থ্য-সচেতন ছিলেন। নিয়মিত হাঁটতেন, খাওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট নিয়ম মেনে চলেছেন। সদাচারী মানুষ ছিলেন। তারপর হঠাৎ করে কোনো লক্ষণ ছাড়াই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র একমাসের মধ্যেই মারা গেলেন। বয়স ৬২ বছর। এরপর আমি হতাশ হয়ে পড়েছি—এত নিয়ম পালন করেও তো তিনি বাঁচলেন না। আমি ইতিবাচক থাকতে পারছি না। দোয়া করবেন।

উত্তর : আপনি তো খুব সৌভাগ্যবতী মহিলা। কারণ আপনার স্বামী বছরের পর বছর বিছানায় শয্যাশায়ী থাকেন নি। অসুস্থ হয়ে তিনিও কষ্ট পান নি এবং আপনাকেও বছরের পর বছর স্বামীর অসুস্থতা দেখতে হয় নি।

আর মৃত্যু তো যে-কোনো সময় হতে পারে। যতদিন আয়ু আছে, আপনি ততদিনই বাঁচবেন। তবুও তো আপনি এই একমাস আপনার স্বামীর যত্ন নিতে পেরেছেন, যা খেতে চায় খাওয়াতে পেরেছেন। অনেকের ক্ষেত্রে তো এমনও হয় যে, আপনজন হয়তো বাইরে বেরিয়েছেন, দুর্ঘটনায় আর ঘরে ফিরে আসেন নি।

রসুলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের সময় বয়স ছিল ৬৩ বছর। তিনি আল্লাহর হাবিব ছিলেন এবং প্রতিটি সৎকর্মে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। তারপরও তো তিনি আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। অতএব যে-কোনো সময় যে-কারণো মৃত্যু হতে পারে। রোগের চিকিৎসা আছে কিন্তু মৃত্যুর কোনো চিকিৎসা নেই।

আপনার স্বামী যে ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত সুস্থ ছিলেন কর্মক্ষম ছিলেন, সেটা সম্ভব হয়েছে তার নিয়মিত হাঁটা ও স্বাস্থ্য-সচেতনতার জন্যে। অতএব তাকে যে বিছানায় পড়ে থাকতে হয় নি, এজন্যে

শোকরগোজার হোন। আর প্রার্থনা করুন যে, আল্লাহ আমাকেও তুমি বিছানায় শুইয়ে রেখো না। আমি কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় এবং কারো বোঝা না হয়ে যেন মারা যেতে পারি।

প্রশ্ন : আমার নেতিবাচকতা দূর করার জন্যে আমি অনেকবারই প্রার্থনাসহ অন্যান্য যা যা লাগে তা করেছি। কিন্তু যার সাথে আমার ঝগড়া-বিবাদ থাকে, তার সাথে আমি কথাও বলি না। এ-ক্ষেত্রে নেতিবাচকতা দূর করার উপায় কী?

উত্তর : খুব সহজ। তার সাথে কথা বলবেন। যার সাথে ঝগড়া-বিবাদ তাকে দেখলেই আগে সালাম দেবেন। এই সালামের রেজাল্ট আমরা কিন্তু পেয়েছি। লামাতে এক প্রতিবেশী খুব ঝগড়া করত আমাদের সাথে। দেখলেই গালিগালাজ-বকাবকি।

আমরা আমাদের অর্গানিয়ারকে বললাম যে, দেখা হলে সে কিছু বলার আগেই ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলতে হবে। অর্গানিয়ার আমাকে বলল, সে-তো সালামের কোনো জবাব দেয় না। আমি বললাম, আপনি সবসময় অন্তর থেকে সালাম দেবেন যতদিন পর্যন্ত জবাব না দেয়।

কয়েক বছর লাগল। তারপর সেই প্রতিবেশী বলল যে, ‘এরকম বেহায়া! সালামের জবাব দেই না তারপরও সালাম দেয়। এই বেহায়ার সাথে আর পারা গেল না।’ এরপর সে সালামের জবাব দিতে শুরু করল এবং সম্পর্ক ভালো হয়ে গেল।

আসলে সাধারণ মানুষ ঝগড়া জিইয়ে রাখে বলেই পারস্পরিক সম্পর্কে এত ঝগড়া-বিবাদ আর নেতিবাচকতা। অতএব যার সাথে বিবাদ, তাকে সালাম দেবেন সবচেয়ে বেশি এবং সবার আগে। তাহলে দেখবেন ঝগড়া থাকবে না।

প্রশ্ন : গুরুজী, আমি আপনার মতামতের জন্যে অপেক্ষা করছি। একটি প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পর আমি জানতে পারি যে, এটি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এবং এমএলএম। কয়েকজন কোয়ান্টামের মানুষ রয়েছে সেখানে। সারা অফিসে কোয়ান্টামের স্টিকার দেখে আমি ভেবে নিয়েছি এরা ভালো।

উত্তর : এই বিষয়টি আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত—কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলেই কেউ কোয়ান্টামের মানুষ হয়ে যায় না। কোয়ান্টামের মানুষ হয় তখন, যখন তার আচার-আচরণ সবকিছু কোয়ান্টাম দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়।

কোয়ান্টামের চেতনা যার মধ্যে রয়েছে তিনিই কোয়ান্টামের মানুষ। বাকিরা হচ্ছে কপট অর্থাৎ যার মধ্যে চেতনা কাজ করে না, মুখে একটা বলবে কাজ করবে আরেকটা। সারা পৃথিবীতে কপট মানুষের সংখ্যা কম নয়। যখন যে-রকম সুবিধা এরা তখন সে-রকম করে। কল্যাণ চেতনায় উদ্ভুক্ত হওয়া মানুষ আর পরিচয় দেয়া মানুষ আলাদা।

কোয়ান্টামের স্টিকার আর সাইনবোর্ড দেখলেই ভালো মনে করবেন না। আপনি দেখবেন তাদের আচরণ ও কাজের সাথে কোয়ান্টামের চিন্তাভাবনার মিল আছে কিনা। সাধারণ মানুষ কোয়ান্টামকে ভালো মনে করে এবং এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তাই এরা কোয়ান্টামের নাম ব্যবহার করছে যাতে আপনি প্রতারিত হন।

প্রশ্ন : এমএলএম কোম্পানির জন্যে সফটওয়্যার বানানো বা সরবরাহ করা অন্যায়ের মধ্যে পড়ে কিনা জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : অন্যায়ের সহযোগী হওয়া আর অন্যায় করার মধ্যে কোনো তফাত নেই। আপনি যখন অন্যায়ের সহযোগী হচ্ছেন, আপনিও অন্যায়কারীদের একজন হচ্ছেন। মানুষের বিবেক সবচেয়ে বড় বিচারক। যখনই মনে প্রশ্ন জাগবে, এ-কাজটা অন্যায় হচ্ছে কিনা, তখনই বুঝবেন এর মধ্যে অন্যায় আছে বলেই আপনার মন সায় দিচ্ছে না।

আর কোনোকিছু নিয়ে মনে যখন প্রশ্ন জাগে, তখন গভীরভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। আপনার বিচারবুদ্ধি যদি সঠিকভাবে কাজ করে, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবেক যেটা বলে সেটা ঠিক হয়। অতএব সংশয় যখন জেগেছে, তখন অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকা উচিত।

আবারও বলছি, অন্যায়কারীকে আপনি যে পর্যায়ে যতটুকু সহযোগিতা করবেন ততটুকু পাপ বা গুনাহ আপনার হবে। অন্যায়ের জন্যে যদি আল্লাহ মাফ না করেন এবং যার প্রতি অন্যায় করলেন তার কাছ থেকে মাফ না পান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।

প্রশ্ন : দুই মাস পর আমার বিবিএ কমপ্লিট হবে, আমরা কয়েকজন আত্মীয় মিলে পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে চাচ্ছি। আমরা মৎস্য দিয়ে শুরু করব। এরপর ধীরে ধীরে এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করব। কিন্তু বাসা থেকে রাজি হচ্ছে না। বাবা-মাও বলেন, পড়াশোনা করে চাকরি করো। আমার করণীয় কী?

উত্তর : বিবিএ করলেই ব্যবসা করা যায় না। বড়জোর ব্যবসায়ীর এমপ্লয়ি হওয়া যায়। কারণ ব্যবসার জন্যে বিবিএ সম্পন্ন করাটা কোনো গুণ নয়। আপনি মৎস্য দিয়ে শুরু করবেন। কীভাবে করবেন? কে দেবে টাকা? আপনি ভাবছেন, মৎস্য মারিব খাইব সুখে। কিন্তু আপনার তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই, জমি নেই পুকুর নেই। জমি পুকুর যদি থাকেও, তাহলে সেটা কোনো আত্মীয়ের বা আপনার বাবার।

মনে রাখবেন, অন্যের ওপর নির্ভর করে কেউ কখনো ব্যবসা করতে পারে না। ব্যবসা করতে হয় নিজের প্রচেষ্টায় এবং শুরু করতে হয় যা আছে তা নিয়ে। রাস্তায় যদি দাঁড়াতে পারেন, তাহলে একদিন আপনি বড় ব্যবসায়ী হতে পারবেন। কারণ ব্যবসা করার জন্যে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস এবং লেগে থাকার মানসিকতা। বিবিএ বা এসব ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব কী ব্যবসা করবেন, তা ঠিক করুন এবং সেভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন।

এ মাসের অটোসাজেশন

অনন্য মানুষের পোশাক হলো শৃঙ্খলা। আমি সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিটি কাজ করব।

নিয়মিত সাদাকায়ন ও আলোকায়নে আসুন গড়ে তুলুন সুস্থ সফল সুখী জীবন

আব্দুল মান্নান একজন সফল ব্যবসায়ী ও শওকত জাহান গৃহিণী। এই দম্পতি থাকেন ঢাকার মতিঝিলে। সুখী পরিবার হিসেবে তারা প্রতিবেশী-আত্মীয় সবার কাছে পরিচিত। সাপ্তাহিক সাদাকায়ন ও আলোকায়ন কার্যক্রমে দুই সন্তানসহ নিয়মিত অংশ নেন তারা। একান্ত জরুরি কিছু ছাড়া সাদাকায়ন বা আলোকায়নে অংশ নেয়ার সুযোগ ছাড়েন না।

কেন আসেন নিয়মিত? আলোচনা শোনার আর যৌথ মেডিটেশনে অংশ নেয়ার এই আকৃতির কারণ কী? জানতে চাইলে তারা শোনান তাদের জীবন বদলের গল্প। শুরু থেকেই এমন ছিল না তাদের পরিবারের অবস্থা। ২০১৩-তে নিদারুণ আর্থিক কষ্ট আর পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিরোধের কারণে চরম সংকটে পড়েন তারা। একপর্যায়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার মতো আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না। সেই অবস্থা থেকে এখন তারা নিজস্ব বাড়ি ও গাড়ির মালিক। কল্যাণমূলক কাজে দান করতে পারেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বেড়েছে তাদের শারীরিক সুস্থতা ও প্রাণপ্রাচুর্য।

জানতে চাওয়া হলো, নিয়মিত সাদাকায়ন ও আলোকায়নে অংশ নিয়ে তারা এমন কী পেয়েছেন যার মাধ্যমে প্রাচুর্যের পথে আসতে পেরেছেন? তারা অকপটে জবাব দিলেন, সজ্ঞাশক্তি। বিপদে পড়েও তারা কখনো হতাশ হয়ে যান না। কারণ প্রতি সপ্তাহে এ প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণের ফলে তারা সবসময় বিশ্বাস করেন, তারা একা নন। তারা একটি বড় পরিবারের অংশ।



সাদাকায়ন ও আলোকায়নে অংশগ্রহণকারীরা লাভ করেন সমন্বিতপনোয়গী ও জীবনঘনিষ্ঠ দিক-নির্দেশনা

তাই যে-কোনো বিপদে তারা ধৈর্য ধরতে পারেন, দোয়া চাইতে পারেন, নিতে পারেন পরামর্শ সেবা। প্রোগ্রামে জীবনঘনিষ্ঠ আলোচনা শুনে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন বঞ্চিতের কল্যাণে নিয়মিত দানে ও করসেবায় অংশ নিতে। ফলে প্রশান্তি আর প্রাচুর্য হয়েছে তাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। শুকরিয়া হয়েছে অন্তরের ধ্বনি।

দেশজুড়ে কোয়ান্টামের লাখো সদস্যের রয়েছে সুখী পরিবার গড়ে তোলার এমনই অগণিত ঘটনা। পরিবারকে সুখী করতে তাদের এ প্রয়াসের বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি আছে কি?

২০১০ সালে তিন হাজারের বেশি মানুষের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় উঠে আসে-যে

পরিবারগুলো কোনো কল্যাণমূলক সজ্ঞার সাথে যুক্ত, তারা গড়পড়তা পরিবারগুলোর চেয়ে অনেক সুখী। তাদের এই সুখের রহস্য খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা দেখেছেন, একই সজ্ঞার মধ্যে অন্তত ১০টি পরিবারের সাথে বন্ধুত্ব রয়েছে, এমন পরিবারগুলোর সুখ ও সাফল্য অন্যদের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। তাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তাবোধও প্রবল। (টাইম ম্যাগাজিন, ১৬ মার্চ ২০১৪)

সজ্ঞাশক্তি মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে সামাজিক নিরাপত্তাবোধ। তাই সংসঙ্গে একাত্ম হতে আপনিও সপরিবারে নিয়মিত অংশ নিন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উন্মুক্ত কার্যক্রম সাদাকায়ন ও আলোকায়নে। গড়ুন সুস্থ সফল ও সুখী জীবন।

সদকা হিলিং ॥

স্রষ্টার করুণায় বিপদমুক্তি

সাদাকায়ন ও আলোকায়নে পরস্পরের জন্যে দোয়া করেন অংশগ্রহণকারীরা। এতে বাড়ি পারস্পরিক হৃদয়তা ও সমর্মিতা। এ-ছাড়াও সমস্যামুক্তি ও সর্বঙ্গীণ কল্যাণের জন্যে সদকা হিলিংয়ে নাম দিতে পারেন যে-কেউ। কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন সম্পন্নকারী সদস্যরা ধ্যানের স্তরে প্রার্থনা করেন তাদের জন্যে। দোয়াপ্রার্থী ও দোয়াকারী উভয়েই উপকৃত হন কল্যাণকর এ প্রক্রিয়ায়।

কাউন্সেলিং সেবা ॥

সৎ পরামর্শ বদলে দেয় জীবন

উন্মুক্ত কার্যক্রমে আরো থাকে কাউন্সেলিং সেবা নেয়ার সুযোগ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত, শিক্ষা-সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ সেবা নিতে পারেন অংশগ্রহণকারীরা।

সপরিবারে আপনিও অংশ নিন প্রতি শুক্রবার সাদাকায়ন ও প্রতি মঙ্গলবার আলোকায়ন কার্যক্রমে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নিকটস্থ অফিসের ঠিকানা জেনে নিন : quantummethod.org.bd/findus

শিশু সাদাকায়ন

নতুন প্রজন্ম হোক দক্ষতা ও নৈতিকতায় অনন্য

লামিয়াকে নিয়ে মা-বাবা ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। সবসময় যেন রেগে আছে সে। পড়ালেখাতেও আগ্রহ নেই তার। ২০১৬-এর আগস্টে কাজীর দেউড়ি শাখায় শিশু সাদাকায়ন শুরু হলে নিয়মিত তাকে নিয়ে আসতেন মা-বাবা।

সাদাকায়নে আলোচনা, মেডিটেশন আর শুদ্ধাচার চর্চার মধ্য দিয়ে বদলে গেছে সে। লামিয়া এখন সবাইকে সালাম দিয়ে কথা শুরু করে। সুন্দর ভাষা আর হাসিমুখের কারণে সে সবার প্রিয়। এবছর ভালো রেজাল্টও করেছে।

২০১৬ সালে কাজীর দেউড়ি সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী অংশ নিতে শুরু করে সাদাকায়নে। মাত্র একবছরের মাথায় ২০১৭-তে চট্টগ্রামে বিজয় দিবসের প্যারেডে অংশ নিয়ে এই শিক্ষার্থীরাই অর্জন করে দ্বিতীয় স্থান। বিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিজয় দিবস প্যারেডে এটিই প্রথম পদক।

এ সাফল্যের কারণ জানতে চাওয়া হলে তারা জানায়, সাদাকায়নে দলবদ্ধভাবে আমি পারি, আমি করব, আমার জীবন, আমি গড়ব-এ অটোসাজেশন চর্চার ফলেই তাদের মধ্যে এসেছে



চট্টগ্রামে শিশু সাদাকায়ন। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে পড়ালেখাসহ সবকিছুতেই ভালো করছে তারা।

জীবনে প্রথম হওয়ার বিশ্বাস।

এভাবেই শিশুরা হয়ে উঠছে মনোযোগী, সদাচারী ও আত্মপ্রত্যয়ী। শিশু সাদাকায়ন অনুষ্ঠিত হচ্ছে চট্টগ্রামের চারটি স্থানে এবং ঢাকার মিরপুর সেন্টার ও যাত্রাবাড়ী শাখায়। এখানে মেডিটেশন ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে শিশুরা শিখছে শুদ্ধাচার, সহিষ্ণুতা, সমর্মিতা ও সজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কাজ করার গুরুত্ব।

উপ-সচিবদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভারে কোয়ান্টাম ওয়ার্কশপ



২৬ ও ২৭ মে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভারে (বিপিএটিসি) কোয়ান্টাম লাইফস্টাইল নিয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৩২ জন উপ-সচিব দুদিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে অংশ নেন।

কোয়ান্টাম জীবনচারণ চর্চা করে লাখো মানুষ হয়েছেন সুখী জীবনের অধিকারী। তাই কোয়ান্টাম লাইফস্টাইল নিয়ে দিন দিন বাড়ছে মানুষের আগ্রহ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে বিসিএস ক্যাডারদের ফাউন্ডেশন কোর্সে যুক্ত হয়েছে কোয়ান্টাম ইয়োগা। এরই ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হয় দুদিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপ।

ওয়ার্কশপ সঞ্চালনা করেন কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রমের কো-অর্ডিনেটর মো. মকবুল আহমেদ। তিনটি আলোচনা এবং দুটি মেডিটেশন দিয়ে সাজানো হয়েছিল প্রথমদিনের কার্যক্রম।

মেডিটেশন কী এবং কেন বিষয়ে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের অর্গানিয়ার এম মাকসুদ হোসাইন। দৈনন্দিন জীবনে স্ট্রেসের ক্ষতিকর প্রভাব ও মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর ডা. মনিরুজ্জামান।

ভার্চুয়াল ভাইরাস আসক্তি এবং এ থেকে মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে আলোচনা করেন মো. মকবুল আহমেদ।

দ্বিতীয়দিন প্রিভেনশন এন্ড রিভার্সাল অব লাইফস্টাইল ডিজিজস নিয়ে আলোচনা করেন ডা. মনিরুজ্জামান। সুখী পরিবার গঠনে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অর্গানিয়ার বনানী তানজিমা রহমান। ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ভার্চুয়াল ভাইরাস ভিডিও ডকুমেন্টারি দেখানো হয় এ ওয়ার্কশপে।

ওয়ার্কশপের সমাপনী সেশনে উপ-সচিববৃন্দ ব্যক্ত করেন তাদের অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা। এ-ছাড়াও বিসিএস ক্যাডারদের ফাউন্ডেশন কোর্সে কোয়ান্টামের শিক্ষাগুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে তারা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

সমমর্মিতার অনন্য দৃষ্টান্ত রমজানে ব্লাড ক্যাম্পে সংগ্রহ ৬১০ ইউনিট রক্ত

সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস

চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৮

কোয়ান্টা উহাইমং-এর সাফল্য



৪ জুন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান রিভ গ্রুপের উদ্যোগে তাদের ঢাকাস্থ কার্যালয়ে ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় এ ক্যাম্পে রক্তদান করেন প্রতিষ্ঠানটির ৮৬ জন নির্বাহী কর্মকর্তা। রিভ গ্রুপের সিইও এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার এম রেজাউল হাসানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ব্লাড ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছর রমজানে ব্লাড ক্যাম্পের পাশাপাশি কোয়ান্টাম ল্যাবেও সংগ্রহের পরিমাণ ছিল গত বছরের চেয়ে বেশি।

আপনার এলাকায় বা প্রতিষ্ঠানে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

৩১/ভি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ০১৭১৪-০৪৭৬৩৬

বিস্তারিত : blood.quantummethod.org.bd

রক্তদান করছেন রিভ গ্রুপের কর্মকর্তাবৃন্দ

রমজান মাসজুড়ে ঢাকার বিভিন্ন সেন্টার-শাখা-সেল ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করে। রক্তদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মাসজুড়ে ব্লাড ক্যাম্প ও মোবাইল ক্যাম্প থেকে সংগ্রহের পরিমাণ ৬১০ ইউনিট রক্ত।

৩০ মে ২০১৮ সিঙ্গাপুরে শুরু হওয়া সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ-এ বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কোয়ান্টা উহাইমং মার্মা। ১২-১৪ বছর বয়সের ক্যাটাগরিতে ভলিউং টেবিল ইভেন্টে উহাইমং ৯.২৫ পয়েন্ট পেয়ে ব্রোঞ্জ পদক (৩য় স্থান) অর্জন করে। ভলিউং টেবিল, ফ্লোর, প্যারালাল বার, রিং, হরাইজনটাল বার, পোমেল হর্স-ছ্যাটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে এ টুর্নামেন্টে সে ৬ষ্ঠ হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে পিইসি পরীক্ষায় সে এ গ্লাস পেয়েছে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জুলাই ২০১৮ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা

Phone : 9341441, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ॥ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd

ছাত্রদের বলতে চাই তোমরা সবাই কোয়ান্টামে যাও

অধ্যাপক মোহা: আলগুগীন



তিন বছর ধরে আমার গলায় একটি সমস্যা ছিল। দেশে-বিদেশে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই নিরাময় হচ্ছিল না। সবশেষে সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে গেলাম। পরীক্ষানিরীক্ষা করে চিকিৎসক আমাকে সামান্য ওষুধ দিলেন আর বললেন, মেডিটেশন করুন। কীভাবে করতে হবে তা-ও তিনি শিখিয়ে দিলেন।

কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে যখন শিখিলায়ন মেডিটেশন করলাম, আমার উপলব্ধি হলো, তা সিঙ্গাপুরে শেখানো মেডিটেশনের তুলনায় বেশি কার্যকর। এটা করে অনেক বেশি রিল্যাক্সড হওয়া যায়।

আমার গলার সমস্যাটাও আর নেই। আগে কথা বলতে অসুবিধা হতো। কিন্তু এখন স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারছি। আমার মনে হয়, কোয়ান্টামে যে মেডিটেশন করানো হয় তা আমাদের শারীরিক অনেক উপকার করলেও এর মূল লক্ষ্য হলো, সামগ্রিকভাবে মানবতার কল্যাণ করা। এটি অনেক বড় বিষয়।

সমাজের প্রতিটি জায়গায় যেভাবে অনৈতিকতা মানবতার চরম অবমাননা আমরা দেখছি, সেখানে কোয়ান্টাম নিঃসন্দেহে আশার আলো জাগাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস।

বিচ্ছিন্নভাবে আমরা অনেকেই মানবকল্যাণের চেষ্টা করেছি। বেশিদূর এগোতে পারি নি। কিন্তু কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তা করতে পারছে, কারণ তারা সজ্ঞবদ্ধ। এ কোর্সে সেই প্রক্রিয়াই শেখানো হয়েছে।

সারা পৃথিবীতে কোয়ান্টামের বাণী ছড়িয়ে যাক, এটাই আমার চাওয়া। আমার ছাত্রদেরও বলতে চাই, তোমরা সবাই কোয়ান্টামে যাও। ওখানে তোমরা নিশ্চিতভাবেই পাবে মানবতা ও কল্যাণের পথ।

[অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৪৭ ব্যাচ]



হাজারো প্রশ্নের জবাব : পর্ব ৩ প্রেম-বিয়ে-পরিবার পৌঁছে দিন প্রতিটি পরিবারে

মানুষের প্রথম আশ্রয় তার পরিবার। শেষ পর্যন্ত পরিবারই আমাদের চিরন্তন ঠিকানা। পরিবারকে সুন্দর রাখতে চাই আমরা সবাই। পরিবারে শান্তি ও স্বস্তি তাই আমাদের সর্বগ্রহে কাম্য। কিন্তু গত কয়েক দশকের ভোগবাদী পণ্য-আত্মসন ও নিত্যনতুন প্রযুক্তি-প্রভাবিত ভুল জীবনদৃষ্টি আজ আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধকেই করেছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্বব্যাপী যার পরিণাম কোনো না কোনোভাবে ভোগ করতে হচ্ছে একাধারে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে। ক্রমাগত বাড়ছে মনোদৈহিক নানা রোগ-জটিলতায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা।

এ সর্বনাশা দুর্দশার কবল থেকে বাঁচতে আমাদের চাই জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিরায়ত জ্ঞান, যা মানুষকে অবিদ্যামুক্ত করে, উদ্ধৃত যে-কোনো পরিস্থিতিতে দেয় সঠিক পথের সন্ধান এবং

প্রচলিত স্রোতের বাইরে গিয়ে সত্যপথে চলার দুরন্ত সাহস। আধুনিক মানুষের জীবন ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে পরিবার-বিষয়ক এ জ্ঞানই সংকলিত হয়েছে হাজারো প্রশ্নের জবাব : পর্ব ৩ ॥ প্রেম-বিয়ে-পরিবার বইটিতে।

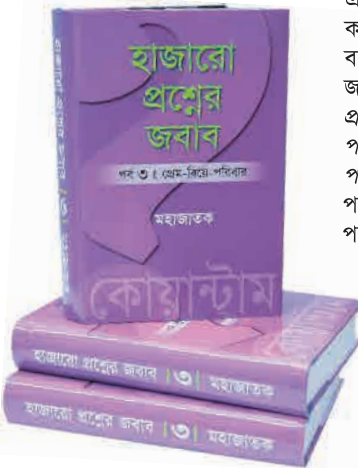
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত এ বইয়ের মোট

৬৩টি পরিচ্ছেদে উঠে এসেছে প্রেম, বিয়ে ও পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা-সংকট সম্পর্কিত হাজারো প্রশ্ন। গত ২৫ বছর ধরে ফাউন্ডেশনের নানা অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জানতে চাওয়া বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। হাজার বছরের সাধকদের জ্ঞানের নির্যাস আর আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে উপস্থাপিত এসব উত্তরের রয়েছে নৈতিকতা, ধৈর্য ও সুবিবেচনার সাথে পারিবারিক যে-কোনো সমস্যা-সংকট উত্তরণের উপায়। পাশাপাশি নিজ নিজ পরিবারকে সুখী ও সফল করে তোলার কার্যকর পথনির্দেশনা।

আমরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান-পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার উপায় আমরা জেনেছি, এর চর্চাও করতে পারছি সাধ্যমতো।

এখন প্রয়োজন এ কল্যাণজ্ঞান আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদেরও জানানো। হাজারো প্রশ্নের জবাব : পর্ব ৩ ॥ প্রেম-বিয়ে-পরিবার বইটি তাই পরিচিত প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে দিন।

আমাদের সবার সজ্ঞবদ্ধ উদ্যম আর চেষ্টায় শতধারায় বিকশিত হোক ও বহমান থাকুক আমাদের চিরায়ত পারিবারিক মূল্যবোধ।



প্রকাশের প্রথমদিন থেকেই সর্বস্তরের পাঠকের কাছে এ বইটি পেয়েছে দারুণ জনপ্রিয়তা। ইতোমধ্যেই এটি পৌঁছে গেছে হাজার হাজার পাঠকের কাছে। ফ্রি ডাউনলোড : publication.quantummethord.org.bd

পবিত্র ঈদুল আজহা

এ শুদ্ধাচারগুলো অনুসরণে সচেতন হোন

- কারো কাছে কোরবানির পশুর দাম জিজ্ঞেস করবেন না। কোরবানির পশুর কোনো দাম হয় না। কারণ কোরবানির পশু কোনো পণ্য নয়। এটি পরম করুণাময়ের নির্দেশ পালনের একটি অনুশঙ্গ মাত্র।
- কেউ পশুর দাম জানতে চাইলে বলুন, আল্লাহ যা সামর্থ্য দিয়েছেন তার মধ্যেই কেনার চেষ্টা করছি।
- কোরবানির পশুর দাম ও আকার নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকুন।
- কোরবানির গোশতের ওজন ও পরিমাণ নিয়ে কথা বলবেন না।
- কোরবানির পশু কেনার পর বাজারদর যাচাই করে এ নিয়ে অহেতুক আলাপে যাবেন না। 'দামে ঠকে গেছি'-এ ধরনের আফসোস করবেন না।
- কোরবানির গোশত যথাযথভাবে বিতরণ করুন। কোরবানির গোশত সংরক্ষণ করতে হবে, শুধু এই উদ্দেশ্যে ফ্রিজ কেনার ভ্রান্ত মানসিকতা পরিহার করুন।
- কয়দিন পর কোরবানি করব-এই ভেবে কোরবানির পশুকে অযত্নে রাখবেন না।
- কোরবানির পশুর সাথে সেলফি তুলবেন না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ-সম্পর্কিত প্রচার থেকে পুরোপুরি বিরত থাকুন।
- খাদ্য উৎসবে মেতে উঠবেন না। খাবারে পরিমিত বজায় রাখুন।
- আপনার কোরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য নিজ উদ্যোগে পরিষ্কার করুন। এ-ক্ষেত্রে নগর কর্তৃপক্ষের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে যথাসম্ভব সাহায্য করুন।
- ঈদের ছুটিতে পরিবারকে সময় দিন। টিভি ইন্টারনেট ফেসবুক ইউটিউব আসক্তিসহ সকল ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকুন।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৪৯ তম ব্যাচ ॥ ঢাকা

১০, ১১, ১২ ও ১৩ আগস্ট
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

সঙ্গে একাত্মতাই আমার সাফল্যের রহস্য

এম রেজাউল হাসান

২০০৯ সালে একবার আন্তর্জাতিক বাজারে ইসরায়েলিদের সাথে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল। প্রযুক্তি জগতে ইসরায়েলিরাই সবচেয়ে দক্ষ। কিন্তু যে সফটওয়্যার প্রোগ্রামটি লিখতে ওদের ৩০০ কিলোবাইট জায়গার প্রয়োজন হয়েছিল, আমরা সেটা লিখেছিলাম মাত্র ৮০ কিলোবাইটে! ফলে আয়োজক প্রতিষ্ঠান আমাদের পণ্যটিই বেছে নেয়। এটি আমার জীবনের অন্যতম অর্জন। কারণ আমরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছি এবং জয়ী হয়েছি।

আজ আমরা শুক্রিয়া আদায় করি, ৭৮টি দেশের ২৫০০ অপারেটর আমাদের পণ্য ব্যবহার করছে। মোবাইল ভিওআইপি ও আইপি কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে রিভ সিস্টেম বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম টেলিকম কোম্পানি এরারটেল-এর আইপি কল সফটওয়্যার ও পুরো প্রক্রিয়াটি রিভ সিস্টেমের তৈরি।

বাংলাদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান যে আইপি যোগাযোগ প্রযুক্তিতে একদিন বিশ্ব পরিসরে নেতৃত্ব দিতে পারে, তা মাত্র দেড় দশক আগেও অনেকেই এমনকি এদেশের প্রযুক্তি নীতি-নির্ধারকরাও কল্পনা করতে পারেন নি।

শুরু করেছিলাম শূন্য থেকে

২০০৩-এ মাত্র ছয় জন কর্মী নিয়ে রিভ সিস্টেমের যাত্রা শুরু করেছিলাম আমরা, ঢাকার খিলগাঁওতে আমার বাবার গ্যারেজ থেকে। এ ছয় জনের মধ্যে দুজন আবার বাবুচি ও ড্রাইভার। আজ রিভ গ্রুপের হেড অফিস সিঙ্গাপুরের মতো ব্যয়বহুল একটি দেশে! আর আমাদের কোম্পানিতে রয়েছেন ১৭টি ভিন্ন ভাষাভাষী সহকর্মী। এর পাশাপাশি আমাদের ফ্যাশন হাউজ (লা রিভ) এবং প্রোপার্টিজের ব্যবসাও রয়েছে।

উদ্যোক্তা হিসেবে জীবন শুরু করার আগে আমি ভালো বেতনের একটি চাকরি করতাম। তখন দেশে আইসিটি বলতে ছিল আউটসোর্সিং অর্থাৎ সাদা চামড়ার একজন একটা প্রোডাক্ট চিন্তা করবে আর আমাদের দক্ষতা দিয়ে তার সৃজনশীলতাকে আমরা বাস্তব রূপ দেবো। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করেছি, এই সৃজনশীলতা আমাদেরও আছে। এই বিশ্বাস আমরা পেয়েছি কোয়ান্টাম থেকে। কারণ কোয়ান্টামে আমরা চর্চা করি-আমি পারি আমি করব, আমার জীবন আমি গড়ব। আমাদের আত্মবিশ্বাসের উৎস ছিল এটাই।

কোয়ান্টামের শিক্ষা : সর্বাবস্থায় শুক্রিয়া

শুক্রিয়া কীভাবে একজন মানুষকে বা একটি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তার একটি বাস্তব উদাহরণ দেই। ২০০৭ পর্যন্ত আমরা কাজ করতাম শুধু বিলিং সফটওয়্যার নিয়ে। আইপি কমিউনিকেশন, যে প্রোডাক্টে আমরা এখন বিশ্বসেরা, সেটা নিয়ে আমরা তখন কাজ শুরু করেছি মাত্র। সেসময় আমাদের প্রচণ্ড আর্থিক চাপ। আমি রীতিমতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে, ন্যূনতম দাম পেলে কোম্পানির ৫০ শতাংশ মালিকানা বিক্রি করে দেবো।

২০০৮-এ বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা দেন, আইজিডব্লিউ লাইসেন্স দেয়া হবে। অর্থাৎ দেশে যত আন্তর্জাতিক কল আসবে-যাবে তার গোটগুয়ে নিয়ন্ত্রণের ব্যবসা। আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্যে এটা ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ। আমরা অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে নিলামে অংশ নিয়েছিলাম। কারণ নিলামে অংশ নিতে যে ১৫ কোটি টাকা মূলধন দেখাতে হয় তা আমাদের ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিলামে আমরা হেরে গেলাম। ছোট একটা কারণ দেখানো হলো, যদিও সেটা আসলে হেরে যাওয়ার মতো বড় কোনো ভুল ছিল না।

নিলামের পরদিন পুরো অফিস একেবারে থমথমে। এমন সুযোগ হাতছাড়া হওয়াতে সবাই হতাশ। আমাদের কর্মীরা এটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। কেননা আমাদের মতো তিন বছর আন্তর্জাতিক বাজারে কাজের অভিজ্ঞতা ও আইপি ক্ষেত্রে দক্ষতা, বাংলাদেশে সেসময় আর কোনো প্রতিষ্ঠানের ছিল না। তাই এটা পাওয়ার যোগ্যতা আমাদেরই ছিল সবচেয়ে বেশি।

আমি তখন সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম। বললাম, শোকর আলহামদুলিল্লাহ, আমরা লাইসেন্স পাই নি! তার চেয়ে আমরা যা নিয়ে কাজ করছি, তাতে মনোযোগ দেই। লাইসেন্স হলে আমরা এই ব্যবসার সুযোগ পেতাম ঠিকই, কিন্তু দেশের গণ্ডিতেই আটকে থাকতাম। কিন্তু এখন আমাদের সুযোগ আছে- আন্তর্জাতিক পরিসরে আমাদের পণ্য নিয়ে বিশ্বসেরা হওয়ার। চলুন আজ থেকে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি। মিটিংয়ের পর সহকর্মীদের সবাইকে নিয়ে সেদিন



বিশিষ্ট প্রযুক্তি-উদ্যোক্তা ও রিভ গ্রুপের সিইও এম রেজাউল হাসান। ২০০৩ সালে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রিভ সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে আজ এ প্রতিষ্ঠান বিশ্ব পরিসরে উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করছে। এ সাফল্যযাত্রার গল্পই তিনি শুনিয়েছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাপ্তাহিক আলোকায়ন কার্যক্রমে। উল্লেখ্য, জনাব রেজাউল হাসান ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ৪৬ ব্যাচের কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট।

একসাথে বাইরে ডিনার করলাম।

আজ উপলব্ধি করি, সেই চ্যালেঞ্জিং সময়ে আমরা যদি শোকরগোজার হতে না পারতাম কিংবা হাল ছেড়ে দিতাম, তাহলে কিছুতেই আজকের অবস্থানে আমরা আসতে পারতাম না। ২০০৮-এর মে মাসে আমরা নিজেদের তৈরি আইপি সফটওয়্যার বাজারজাত শুরু করি। প্রক্রিয়াধীন অবস্থাতেই আমাদের পণ্য সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করে।

উদ্যোক্তা হতে পারেন যে-কেউ

আমার খুব প্রিয় একজন উদ্যোক্তা হচ্ছেন ডেল কোম্পানির মাইকেল ডেল। তিনি পড়াশোনা করেছেন ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। তার প্রযুক্তিজ্ঞান যে খুব বেশি ছিল, তা কিন্তু নয়। তিনি তার জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি কাজে লাগিয়ে ডেল কোম্পানিকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন।

একাডেমিক জীবনে আমিও কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র নই। কিন্তু গুরুজী সবসময় বলেন, ব্যাকগ্রাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজন মানুষ যে-কোনো অবস্থান থেকেই জীবন শুরু করতে পারেন। আমিও সেটাই বিশ্বাস করেছি। কম্পিউটার সম্পর্কে আমি অল্প যেটুকু জানতাম সেটা দিয়েই একটু একটু করে শুরু করেছি।

সংসঙ্গে একাত্মতা : আমার সাফল্যের রহস্য

আমাদের প্রতিষ্ঠানের আজকের সাফল্যের মূল রহস্যটা কী? এই দীর্ঘ সময় ধরে সংসঙ্গে একাত্ম থাকতে পারা। আমাদের যাত্রাপথে স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। আর এজন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি ও দিক-নির্দেশনা আমরা বরাবরই পেয়েছি কোয়ান্টাম থেকে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানেও আমরা চেষ্টা করেছি কোয়ান্টামের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করতে। আমাদের অফিসে প্রতিদিনের কাজ আমরা শুরু করি মেডিটেশন দিয়ে। কোয়ান্টামের মতোই আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা ছোট-বড় সবাইকেই সম্মানের সাথে 'আপনি' সম্বোধন করে কথা বলি।

ব্যবসায় সফল হওয়ার জন্যে শুধু ভালো একটি পণ্য থাকলেই হয় না। অনেক কিছু মিলেই আসলে একটি প্রতিষ্ঠান সফল হয়। দেশে-বিদেশে নানা সময় আমার মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম থেকে পাওয়া বিনয়ের শিক্ষাটা করপোরেট জগতে ক্লায়েন্টদের মন জয় করতে আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।

নিয়মিত মেডিটেশন : কাজের তুলনায় বেশি অর্জন

২০০৭ সাল পর্যন্ত যতদিন আমি ঢাকায় থাকতাম কখনো শুক্রবার সাদাকায়ন মিস করি নি। আমি মনে করি, সাপ্তাহিক সাদাকায়ন-আলোকায়ন প্রোগ্রামগুলোতে নিয়মিত অংশ নেয়া একজন মানুষের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে খুব জরুরি।

একবার একটি প্রোগ্রামে গুরুজী আমাকে বলেছিলেন, 'মেডিটেশন নিয়মিত করবেন। কাজের তুলনায় অর্জন অনেক বেশি হবে।' আরেকটি কথা আমি বিশ্বাস করি, দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্ছৃতি আমাদের হয়ই। কিন্তু সংসঙ্গে থাকার সুবিধা হচ্ছে, নিজের ত্রুটি-বিচ্ছৃতিগুলো বুঝতে পারা যায়। পাওয়া যায় সেগুলো সমাধানের পথও।

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী, সালাম নিবেন। কয়েকমাস আগে একদিন পানি খাওয়ার সময় আমার মাড়িতে লাগানো নকল দাঁতটি খুলে আসে। নিজের অজান্তেই আমি ওটা গিলে ফেলি। দাঁতটির দুই দিকে বড়শির মতো স্টিলের হুক ছিল।

রাতে আমার পেটে ব্যথা শুরু হয় এবং খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। আমি দোয়া ইউনুস পাঠ করতে থাকি। স্থানীয় একটি ক্লিনিকের ডাক্তার বললেন, রোগীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আমার বাসা থেকে যা প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে।

ঢাকা মেডিকেলের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে পাঁচ দিনের অগ্রিম দান মাটির ব্যাংকে রাখলাম। বিপদমুক্তির নিয়তে আরো দান করলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর আমার প্রচণ্ড যানজটে পড়লাম। ড্রাইভার বিকল্প রাস্তায় গাড়ি ঢোকালেন। ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে চলতে গিয়ে আমার শরীর খুব খারাপ লাগছিল। প্রচণ্ড বেগে দুবার বমি হলো। বমির সাথে সেই দাঁতটিও বের হয়ে এলো! আস্তে আস্তে আমি সুস্থ অনুভব করতে লাগলাম। হাসপাতালে আর যেতে হলো না।

আল্লাহর প্রতি অশেষ শুকরিয়া জানাই। গুরুজী, আপনিই আমাদের দানের গুরুত্ব শিখিয়েছেন। দোয়া করবেন সারাজীবন যেন নিজে দান করার পাশাপাশি অন্যদেরও দানে উদ্বুদ্ধ করতে পারি।

নার্গিস নাহার শামসের
গৃহিণী, ৩৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



গুরুজী, আসসালামু আলাইকুম। আপনি হয়তো ইতোমধ্যেই জেনেছেন যে, এবছর ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবসে ভারতীয় হাইকমিশন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে র্যাফেল ড্র-তে আমি একটি গাড়ি পুরস্কার পেয়েছি। পরম করুণাময়ের কাছে আমি শুকরিয়া জানাই। একইসাথে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য হিসেবে গাড়িটি উপহার পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

তবে এ পুরস্কারের পেছনে একটি রহস্য লুকিয়ে আছে তা হয়তো অনেকেই জানেন না। ২০১৭ সালে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে যখন মেডিটেশনের ওপর ভ্যট আরোপ করা হয়, তখন ভ্যট প্রত্যাহারে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করতে হচ্ছিল। ফাউন্ডেশনের এ কাজগুলোতে আমার ব্যক্তিগত পুরনো গাড়িটি তখন একমাসের জন্যে দিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস, এর ফলেই আল্লাহ তায়ালা একটি নতুন গাড়ি উপহার হিসেবে আমাকে দিয়েছেন।

গুরুজী, আমাকে ফাউন্ডেশনের কাজে সহযোগিতা করার সুযোগ দেয়ার জন্যে আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। দোয়া করবেন।

মো. খাইরুল হাসান খান
ব্যবসায়ী, ২১৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ও অতিথিদের কাছ থেকে পুরস্কার নিয়েছেন মো. খাইরুল হাসান খান ও তার ছেলে



অ্যাপভিত্তিক যানবাহন ৥ সচেতন হোন

রাত ১১টা। বিয়ের দাওয়াত খেয়ে বের হয়েছেন। এ এলাকায় যানবাহন পাওয়া রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার। রাত ১২টায় আবার বাসার গেট বন্ধ করে দেবে, ফেরার তাড়াও বেশ। এর মধ্যেই একটি মোটর সাইকেল আপনার সামনে এসে থামল। চালক আপনাকে বাসা পর্যন্ত নামিয়ে দিতে রাজিও হলো। বিনিময়ে আপনাকে কিছু সম্মানী গুণতে হবে।

কিছুদিন আগেও নিরাপত্তার কথা ভেবে কোনো অপরিচিতের বাইকে উঠে পড়া ছিল কল্পনার বাইরে। অথচ অ্যাপভিত্তিক যানবাহন-সেবার কল্যাণে এটা এখন আমাদের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা। যানবাহন এখন হাতের নাগালে এবং যে-কেউ স্মার্টফোনে অ্যাপ ইনস্টল করে এ সেবা নিতে পারেন।

অ্যাপভিত্তিক পরিবহনগুলো আমাদের জীবনযাত্রা সহজ করেছে। তাই আগে যে পদক্ষেপ নিতে আমরা কয়েকবার চিন্তা করতাম তা এখন অবলীলায় করছি। তবে প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে বাড়তে হবে সচেতনতা। কারণ এসব কোম্পানি ও চালকের কাছে চলে যাচ্ছে আপনার টেলিফোন নম্বর, বাসা ও কর্মক্ষেত্রের ঠিকানার মতো ব্যক্তিগত তথ্যগুলো।

আবার ‘নো অফিস নো বস’-এ ধরনের স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুবিধামতো সময়ে কাজ করতে পারবেন ভেবে অনেকেই পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন এ কাজগুলো। আপনি মনে করছেন, কোম্পানির প্রতি আপনার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ভেবে দেখুন, আপনার প্রতিও সেই কোম্পানির দায়িত্ব কতটুকু।

বসের সামনে না বুঁকলেও স্মার্টফোনের সামনে আপনাকে বুঁকে থাকতে হবে, কাজের সময় নির্দিষ্ট না থাকলেও ন্যূনতম আয় করার অদৃশ্য দায়ে আপনাকে ঠিকই রাতদিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এ যেন মধ্যযুগীয় সামন্তবাদেরই এক আধুনিক রূপ।

উপরি আয়ের আশায় ব্যক্তিগত যানবাহন অনেকেই তুলে দিচ্ছেন অ্যাপের হাতে। যানবাহনের ট্যাক্স, রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করতে হয় মালিককেই। সাময়িকভাবে লাভবান হলেও সার্বিকভাবে কতটা লাভ হচ্ছে তা ভাবার বিষয়। তবে অ্যাপ কোম্পানি লাভবান হচ্ছে ঠিকই।

যুক্তরাষ্ট্রে এমআইটি সেন্টার ফর এনার্জি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল পলিসি রিসার্চ-এর আওতায় ১১০০ জন অ্যাপভিত্তিক চালকের ওপর করা সার্ভে অনুযায়ী ৫৪% চালকের আয় সে দেশের ন্যূনতম আয়ের চেয়েও কম, ৮% রীতিমতো ভর্তুকি দিয়ে এ পেশায় আছেন। যানবাহনের ইনস্যুরেন্স, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানিসহ অন্যান্য খরচ এই সার্ভেতে বিবেচনায় আনা হয়। (দ্য গার্ডিয়ান, ৬ মার্চ ২০১৮)

বাইকের নম্বর প্লেটে বিভিন্ন অঞ্চলের নাম দেখে বোঝা যায় ঢাকার বাইরে থেকেও এই কাজের জন্যে আসছেন অনেকে। কিন্তু বাহনের চালক হিসেবে ড্রাইভিং দক্ষতা এবং পথঘাট চেনা দুটোই প্রয়োজন।

জীবনকে সহজ ও গতিময় করতে নিত্যনতুন অনেক কিছুই আসবে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ ও সচেতনতা।

অ্যাপভিত্তিক যানবাহনে আপনার করণীয়

যাত্রী হিসেবে

- সবসময় অ্যাপ-এ লগইন করেই যানবাহন ডাকুন। চালকের সাথে পরিচয়ের সূত্র ধরে তাকে ব্যক্তিগতভাবে ডাকবেন না। আপনার নিরাপত্তার স্বার্থেই এটি জরুরি।
- ব্যবহারের আগে তাদের সার্ভিস ও শর্তসমূহ জেনে নিন।
- যাকে কল করেছেন, সেই চালকই এসেছেন কিনা, নিশ্চিত হয়ে যানবাহনে উঠুন।
- চালককে দ্রুত গাড়ি চালাতে ও ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘন করতে উদ্বুদ্ধ করবেন না।
- চলন্ত গাড়ির চালকের সঙ্গে গল্প করবেন না।
- চালকের কোনো আচরণে খটকা লাগলে কল বাতিল করতে বা যানবাহন থেকে নেমে পড়তে দ্বিধা করবেন না।

চালক হিসেবে

- যাত্রীর নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিন। ওঠানো-নামানোর জন্যে মাঝ রাস্তায় গাড়ি না থামিয়ে নিরাপদ জায়গায় থামান।
- ড্রাইভ করার সময় সবার আগে যাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নামবেন না।
- নজের ও যাত্রীর হেলমেট, সিটবেল্টসহ অন্যান্য নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতন হোন।
- ‘এত কম দূরত্বের জন্যে গাড়ি ডেকেছেন কেন?’-এমন অবাস্তব ও নেতিবাচক মন্তব্য পরিহার করুন।
- টিপস চাইবেন না। ‘খুচরা নেই’ বলে অতিরিক্ত ভাড়া নেয়া থেকে বিরত থাকুন।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স—নিজের জীবন নিজে গড়তে পারার এক বৈজ্ঞানিক পথনির্দেশনা। ২৬ বছরের সাফল্য পরিক্রমায় সম্পন্ন হয়েছে এ কোর্সের ৪৪৮টি ব্যাচ। অংশগ্রহণ করেছেন লাখে মানুষ। মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে বদলে ফেলেছেন তাদের পুরনো অভ্যাসচক্র। অর্জন করেছেন সুস্থ সফল সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব। চার দিনের এ কোর্স সম্পন্নকারীরাই হলেন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। এবারের আয়োজনে রয়েছে তাদেরই কয়েকজনের কোর্সে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা—

কল্পনাশক্তিকে ভালো কাজে ব্যবহার করা ধর্মসম্মত

মুফতি মো. আবুল কালাম কাছেমী

কোয়ান্টাম মেথডের সাফল্য ও কার্যকারিতা দেখে মনে হচ্ছে, ১০ বছর আগে কোর্সটি করলে জীবন থেকে এতটা সময় নষ্ট হতো না। কারণ অনেক আগেই দেশের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক আমাকে এ কোর্সটি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেসময় তা বিশ্বাস করি নি।



অথচ এখানে এসে আমি উপলব্ধি করেছি, কোর্সের প্রতিটি বক্তব্য এবং মেডিটেশনের পেছনে রয়েছে সঠিক যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, যা কল্পনার শক্তিকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য করেছে। এজন্যই আল্লাহ রাক্বুল আলামিন এ কোর্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী অনেকের মনোদৈহিক সমস্যাগুলো দূর করেছেন।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ইসলামসম্মত কিনা তা নিয়ে অনেকে আলেম-ওলামার মাঝে দ্বিধা দেখেছি। আমি তাদের বলতে চাই, মনের কল্পনাশক্তিকে ভালো কাজে ব্যবহার করা শরিয়তে জায়েজ।

[মুফতি ও শাইখুল হাদীস, ফাতেমাতুজ্জাহরা মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া। ৪৪৪ ব্যাচ]

দেশের প্রতিটি শিশু-কিশোর যেন এ কোর্স করতে পারে

সেলিম আউয়াল



গত ১৫ বছর ধরে আমার নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছিল না। অথচ আগে সবসময় আমি লক্ষ্যে অবিরল ছিলাম। এই কবছর ধরে শুধু মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় বাঁচব না। সবসময় এক ধরনের দুশ্চিন্তা আর মৃত্যুভয়

আমার মধ্যে কাজ করত। আমি আমার বন্ধুদের বলে দিয়েছিলাম, আগামী পাঁচ বছর যদি বাঁচি, তাহলে আমার কাজগুলো শেষ করতে পারব।

কোর্সে এসে মেডিটেশনে করে আমি মনে জোর পেয়েছি। এখন আমার ভেতরে আত্মবিশ্বাস কাজ করেছে যে, নির্ধারিত কাজগুলো আমি ঠিকমতো শেষ করে আরো নতুন কাজ শুরু করতে পারব। জীবনের এ পর্যায়ে এসে যেভাবে আমি মনছবি নির্ধারণ করলাম, আমি চাই এ কোর্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু-কিশোর যেন জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে।

এ-ছাড়া কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের আলোচনা শুনে কোল্ড ড্রিংকস বা সফট ড্রিংকসের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কেও আমি সচেতন হয়েছি। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সাধারণ মানুষকে যেভাবে শোষণ করেছে তা-ও অকপটে বলা হয়েছে।

[সহকারী সম্পাদক, সিলেট এক্সপ্রেস। ৪৪৬ ব্যাচ]

কোয়ান্টাম মেথড একটি সমৃদ্ধ জীবন দর্শন

অধ্যাপক ড. মো. শহীদুর রহমান



আমার কানাডা প্রবাসী ছোট ছেলেটি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। আমাকে সে বহুদিন আগে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু আমার তা করা হয়ে ওঠে নি।

কিছুদিন আগে আমার বাসার কাছেই লক্ষ করলাম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একটি অফিস। ভাবলাম, গিয়ে একটু দেখি—কী কাজ হয়। এরপর এক শুক্রবার সাদাকায়ন

প্রোগ্রামে গেলাম। সেখানে তারা আমাকে যেভাবে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন, তা দেখে আমি মুগ্ধ হই। সেদিনই সিদ্ধান্ত নিই—কোর্সটি আমি করব। আমি মনে করি, বিনয় ও আন্তরিকতার যে শিক্ষা কোয়ান্টাম দিচ্ছে তা শুধু আমাদের রাষ্ট্রে নয়; বরং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন।

চার দিনের এ কোর্সে অংশ নিয়ে মনে হচ্ছে, আমার পরিবারের ও সমাজের সবার এখানে আসা উচিত। কারণ আমাদের মহামূল্যবান যে মস্তিষ্কটি আছে, তার সঠিক ব্যবহার আমরা করছি না। এখানে মেডিটেশনের মাধ্যমে দেহ-মন-মস্তিষ্ক এই তিনের অভূতপূর্ব সমন্বয় করা হয়েছে। আমাদেরকে মস্তিষ্ক ব্যবহারের সর্বোত্তম প্রক্রিয়াও শেখানো হয়েছে।

আমার শিক্ষকতার ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, জীবনে কীভাবে সফল হতে হয়, তার সম্পূর্ণ ধারণা কোয়ান্টামে দেয়া হয়েছে। এজন্যে আমি বলব, এ কোর্স একটি সমৃদ্ধ জীবন দর্শন।

[বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। ৪৪৪ ব্যাচ]

দূর হয়েছে সাইনুসাইটিস ও ঘুমের সমস্যা

সাবিয়া পারভীন



আমার বড় ছেলে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। সে দেশের বাইরে থাকে। ছেলেকে নিয়ে আমি সবসময় খুব টেনশন করতাম। প্রায় আট বছর আমি ঘুমাতে পারি নি। এ-ছাড়া প্রায় ২০ বছর ধরে আমার সাইনুসাইটিসের

সমস্যা ছিল। প্রতিবার ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে ওঠার পরে হাঁচি-কাশি শুরু হতো।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে এটা কমতে শুরু করেছে। আগে এসি রুমে থাকতে আমার কষ্ট হতো। অথচ এখানে এসি রুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে প্রোগ্রাম করলাম, কোনো অসুবিধা হয় নি।

কোর্সে শেখানো দমচর্চা ও মেডিটেশন করে রাতে ভালো ঘুমাচ্ছি, সাইনুসাইটিসের সমস্যাটাও নেই। এখানে এসে আমি অনেক সফলতা পেয়েছি।

কোর্সের শেষ দিন সকালে পারিবারিক মেডিটেশনে আমার পরিবারের সবাইকে অনুভব করেছি। আমি মনে করি, একজন গৃহিণী তখনই সফল যখন পরিবারের সবাইকে সে অনুভব করতে পারে এবং সবাইকে নিয়ে এক হয়ে থাকতে পারে। আর এজন্যে প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। কোর্সে এসে আমি ইতিবাচক হতে শিখেছি।

[গৃহিণী। ৪৪৫ ব্যাচ]

ফেসবুকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জেনেছি

শুভ্রতা কুড়ু

ফেসবুক আমি খুব পছন্দ করতাম। নিয়মিত ফেসবুকে ফটো আপলোড করতাম এবং অপেক্ষায় থাকতাম কখন সবাই লাইক দেবে, কমেন্ট করবে!

কিন্তু এ কোর্সে এসে ভার্চুয়াল ভাইরাস

এবং এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জেনে ফেসবুকের প্রতি আমার আগ্রহ অনেকটাই কমে গেছে।

আমি এখন বুঝতে পেরেছি, আমার মা-বাবা ভাইবোনের সাথে সময় কাটানো ফেসবুকে ব্যয় করা প্রত্যেক মুহূর্তের চেয়ে অনেক মূল্যবান। কারণ পরিবারের এসব ভালো স্মৃতিই আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগে আমি নেতিবাচক চিন্তা করতাম। যেমন একটা কাজের ভালো বা মন্দ যে-কোনো ফলাফল হতে পারে। আমি মন্দটি নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করতাম। এতে পড়াশোনায় অসুবিধা হতো। কিন্তু কোর্সের আলোচনা শুনে বুঝতে পারলাম, নিজের ওপর যদি বিশ্বাস রাখি এবং সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করি, তাহলে যে-কোনো কাজেই সাফল্য আসবে। আর স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কেও জানতে পেরেছি, যা আমাকে নীরোগ থাকতে সাহায্য করবে।

[একাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, ভিকারুননিসা নুন কলেজ। ৪৪৫ ব্যাচ]

জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে সচেতন হলাম

মোহাম্মদ মোরাদ হোসেন



অফিসে কাজের ফাঁকে বার বার স্মার্টফোন চেক করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এটা থেকে বেশিক্ষণ বিরত থাকতে পারতাম না। কখন নোটিফিকেশন আসে, কে লাইক দেয় বা কमेंট করে—

সেদিকে মন চলে যেত। এভাবে ফেসবুকের পেছনে আমার অনেকটা সময় ব্যয় হতো।

অফিস শেষে বাসায় ফিরে দেখতাম, আমার ছেলের হাতে একটা ট্যাব আর মেয়ের হাতে একটা এন্ড্রয়েড ফোন। তারা ভিডিও গেম খেলছে এবং স্ত্রী হয়তো ইউটিউবে রান্নার অনুষ্ঠান দেখছেন।

এতদিন বুঝতে পারি নি আমরা ভার্সুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলাম। অথচ এ কোর্সে এসে উপলব্ধি করেছি, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স হলো এর এন্টি-ভাইরাস। চার দিনের এ কোর্সে আমি ভার্সুয়াল ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। আশা করি, আমার পরিবারেও এ সচেতনতা গড়ে উঠবে এবং তারাও এ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

পণ্য আগ্রাসন নিয়েও গুরুজী আলোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে আমার পেশাজীবনের ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলি। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়েও মাস শেষে আমার বেতনের টাকা শেষ হয়ে যায়। একমাত্র কারণ হলো, আমি প্রচুর কেনাকাটা করি।

পরবর্তীতে বুঝতে পারি, অনেক অপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনে ফেলেছি। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। এ কোর্সের আলোচনা শুনে এখন বিশ্বাস করি, আমিও মিতব্যয়ী হতে পারব ইনশাল্লাহ! কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি নতুনভাবে আমাকে জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তুলল।

[সিনিয়র জেনারেল ম্যানোজার, এলিট পেইন্ট এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি। ৪৪৩ ব্যাচ]

স্মার্টফোন ব্যবহার এখন অনেকটাই কমে গেছে

দুর্দানা নুখাত মাহমুদ



আমি অনেক বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার করতাম এবং ফেসবুক চালাতাম। পড়তে বসলেই মনে হতো, ১০ মিনিট ফেসবুক চালাই তারপর না হয় পড়া শুরু করব। কিন্তু ১০ মিনিটের নাম করে ফেসবুক চালাতে

চালাতে কখন যে একঘণ্টারও বেশি সময় পার করে ফেলেছি, বুঝতে পারতাম না। এতে দিন দিন পড়াশোনায় আমার মনোযোগ কমে যাচ্ছিল।

বাবা আমার এ অবস্থা দেখে কোনোরকম

মেডিটেশন আমাকে দিয়েছে নতুন জীবন

মমতাজ বেগম



আমার যে সমস্যাটি ছিল, তা হলো শুচিবায়ু। আমার স্বামী এবং সাত বছরের মেয়েটি এজন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। মেয়েকে বার বার গোসল করাতাম। প্রতিদিন দুই বার ঘরের মেঝে মোছা

হতো। তবুও আমার সন্দেহ থেকে যেত। স্বামী ঘরে ফিরলে তার গায়ে যদি ময়লা লেগে থাকে, এই ভয়ে এমনও মনে হয়েছে—সে যেন বাসায় না ফেরে!

বাথরুমে ঢোকান আগে কাঁদতাম—আমি বের হয়ে আসতে পারব তো! কখনো দিনে পাঁচ-ছয় বার গোসল করেছি। বাসা থেকে বের হতে চাইতাম না, যদি ময়লা লাগে এই কারণে।

এ সমস্যা যে-কারো হতে পারে। কিন্তু বলতে পারে না। আমার স্বামীকে জানালাম, এটা আমার রোগে পরিণত হয়েছে। এমনকি ধীরে ধীরে আমার মেয়ের মধ্যেও এ সমস্যাটি দেখা দিচ্ছিল। ডাক্তারের কাছে গেলাম। ওষুধ খেয়ে সমস্যা কিছুটা কমল, কিন্তু সারাদিন শুধু ঘুম পেত। মেয়েকে নিয়ে স্কুলেও যেতে পারতাম না।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের তৃতীয় দিন থেকে আমার অবস্থার উন্নতি শুরু হয়। রাতে বাসায় গিয়ে মাত্র ১৫ মিনিটে গোসল করে বের হয়েছি। সত্যিই অবিশ্বাস্য! আগে এটা সম্ভবই ছিল না। আমাকে ওষুধও আর খেতে হচ্ছে না। ময়লা লাগার ভয়টাও দূর হয়েছে। নিজেকে উৎফুল্ল মনে হচ্ছে।

আমি এখন বুঝতে পেরেছি পুরো বিষয়টি ছিল আমার অবচেতন মনের সমস্যা, যা মেডিটেশনের মাধ্যমে দূর হয়েছে। এখানে এসে মনে হচ্ছে, মেডিটেশন আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে।

[ব্যবসায়ী। ৪৪৩ ব্যাচ]

রাগারাগি না করে আমাকে বোঝাতে শুরু করলেন। মেডিটেশনের এ কোর্সটি করতে বললেন। এবং কোর্সের এই চার দিন আমি একটি রুটিনের মধ্যে ছিলাম। প্রয়োজন ছাড়া স্মার্টফোনটি একবারের জন্যেও ব্যাগ থেকে বের করি নি। প্রোথাম শেষে সন্ধ্যায় বাসায় গিয়ে আমি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করেছি। আর সময়মতো ঘুমিয়ে পড়ায় স্মার্টফোন ব্যবহারের অভ্যাস অনেকটা কমে গেছে।

এটা সম্ভব হয়েছে কোর্সের আলোচনা এবং মেডিটেশনের জন্যে। স্মার্টফোনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আগেও জানতাম, কিন্তু মানতাম না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এটা থেকে বের হওয়ার পথ এবং প্রক্রিয়া দুটোই দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ-ছাড়া মনছবি করার মাধ্যমে জীবনের লক্ষ্য আরো পরিষ্কার করতে পেরেছি। লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছাব সেই পরিকল্পনাও করতে পেরেছি।

[অনার্স (৩য় বর্ষ), আইন বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। ৪৪৭ ব্যাচ]

আমি পেয়েছি সুস্থতার বিশ্বাস

মো. আমিরুল ইসলাম

২০১৭ সালের শুরু থেকেই আমার ডান পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। এমন কোনো ব্যথার ওষুধ নেই যা আমি খাই নি। আমার এভাস্কুলার নিউরোসিস নামক একটি অসুখ ধরা পড়ে। ফলে কোমরের দিকে হাড় ক্ষয়ে যেতে শুরু হয়েছে।



অর্থোপেডিক সার্জন বললেন, অপারেশন করে আমার শরীরে স্টিলের দুটো ডিস্ক বসাতে হবে। আমার এ অবস্থা দেখে পরিচিত একজন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট আমাকে অটোসাজেশন চর্চার পরামর্শ দিলেন। আমিও নিয়মিত অটোসাজেশন চর্চা শুরু করলাম এবং কিছুদিনের মধ্যে আমি অনেকটা সুস্থও হয়ে গেলাম। আর এ কোর্সে চার দিন মেডিটেশন করে নিজেকে এতটাই সুস্থ মনে হচ্ছে যে, এখন আমি ব্যাডমিন্টন খেলতে পারব। আমি সুস্থতার বিশ্বাস পেয়েছি।

এ-ছাড়া পারিবারিক মেডিটেশনের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে ভালো রাখা যায়, তা-ও জানলাম।

[কনসাল্ট্যান্ট, এম. এইচ. হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ। ৪৪৭ ব্যাচ]

অনুপ্রাণিত হয়েছি, পেয়েছি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

রতন কুমার চক্রবর্তী



এসিডিটির সমস্যার জন্যে আমার দিনে দুবেলা ওষুধ খেতে হতো। ব্যাকপেইন ও থাইরয়েডের সমস্যাও ছিল। নিজেকে সবসময় রোগী ভাবতাম। অথচ স্বভাবগতভাবে আমি প্রাণচঞ্চল মানুষ। কিন্তু

কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছিলাম।

এ কোর্সে এসে মেডিটেশন সম্পর্কে জানলাম এবং চর্চাও করলাম। আমার এসিডিটির সমস্যা আর নেই। আমি এখন কোনো ওষুধ ছাড়াই সুস্থ আছি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করার জন্যে প্রতিদিন আমাকে মুগ্ধিগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। কিন্তু আমার কোনো সমস্যা হয় নি, ব্যাকপেইনও অনুভব করছি না। এ কোর্সের মাধ্যমে আমার আত্ম উন্নয়ন ঘটেছে। আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি, পেয়েছি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আগে মনে হতো, কোনো উপলক্ষে পরিবার-পরিজন বা বন্ধুদের দামি উপহার দিলেই তাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায়। অথচ এসব উপহারের কোনো মূল্য নেই। যদি আমি সত্যিই কারো মঙ্গল চাই, তাহলে এখন থেকে তাকে কোয়ান্টামে আসার জন্যে উদ্বুদ্ধ করব।

[সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, মুগ্ধিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়। ৪৪৭ ব্যাচ]

প্রশ্নোত্তর : আজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি চাকরি করি, বেতন মোটামুটি। পরিবারে বেশ কজন ভাইবোন। নিজের কোনো বাড়ি নেই, সেক্ষেত্রে আমার কি এখন বিয়ে করা উচিত? নাকি নতুন বাড়ি করে কিংবা একটা ফ্ল্যাট কেনার পর বিয়ে করা উচিত? আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর : আপনার আয় মোটামুটি, নতুন বাড়ি করে বা ফ্ল্যাট কিনে আপনি বিয়ে করতে চান। তাহলে তো আপনাকে অন্তত ১৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিনে আপনার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবে।

আসলে এই যে বাড়ি করা বা ফ্ল্যাট কেনা, এটা এক ধরনের নেশায় পরিণত হয়েছে। আগে বাড়ির চিন্তা ছিল, এখন ফ্ল্যাটের চিন্তা। সমাজের অধিকাংশ মানুষই মনে করে, সে যদি একটা ফ্ল্যাট কিনতে বা বুকিং দিতে না পারে তাহলে তার জীবনটাই বৃথা। এ সুযোগে ফ্ল্যাট ব্যবসায়ীরাও জমজমাট ব্যবসা করছে এবং অনেকেই তাদের খপ্পরে পড়ে গেছেন।

এই যে ফ্ল্যাট বুকিং দেয়া বা ফ্ল্যাট কেনা, এটা আসলেই বোকামি। যারা বাড়ি বানায় তাদের জায়গার মালিকানা অন্তত থাকে। কারণ আপনি যে ফ্ল্যাট কিনলেন, ৩০ বছর পর তো ওটার কিছুই থাকবে না। জরাজীর্ণ হয়ে যাবে। আর ঢাকা শহরের যে অবস্থা, যে গরম পড়ছে, যদি একবার ভূমিকম্প হয় তাহলে আপনার ফ্ল্যাট একেবারে মাটির সাথে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। কারণ বেশিরভাগ ফ্ল্যাটেরই নির্মাণ সামগ্রী খুব নিম্নমানের।

একথা আমি আজ বলছি না, যখন এস্ট্রলজার ছিলাম, তখনও ক্লায়েন্টদের বলতাম—এই বোকামিটা করবেন না। হুজুগে পড়ে ফ্ল্যাট কিনবেন না।

কারণ ৭০/৮০ লক্ষ থেকে এক/দেড় কোটি টাকা খরচ করে আপনি একটা ফ্ল্যাট কেনার সিদ্ধান্ত নিলেন, এরপর কিস্তি দেয়া শুরু করলেন। এর মধ্যে আপনার নিজের হয়তো ৫-১০ লাখ টাকা। বাকিটা বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনের কাছে ঋণ অথবা শ্বশুরবাড়ি থেকে নয়তো ব্যাংক ঋণ।

রিয়েল স্টেট কোম্পানিগুলো আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে যে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিন। কারণ ব্যাংকের সাথে তাদের আবার যোগাযোগ থাকে। আপনাকে বড়িশিতে আটকাতে পারলে তাদের সবার জন্যেই তো লাভ। কিস্তি পরিশোধ করতে আপনি একদিকে ঋণ নিচ্ছেন, আবার ব্যাংক সুদও দিতে হচ্ছে।

রসুলুল্লাহ (স) সবসময় ঋণ থেকে পানাহ চেয়েছেন। কিন্তু আপনি যে ঘরের মালিক হতে যাচ্ছেন, সেটার মধ্যে ঋণ ঢুকল, সুদও ঢুকল। সুদ যখন ঢোকে তার মধ্যে কোনো বরকত থাকে না আর ঋণ সবসময় পেরেশানি সৃষ্টি করে।

আপনি হয়তো ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন ৩০ লক্ষ বা ৫০ লক্ষ টাকা। সুদসহ এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল ৮০ লাখ টাকা। আর ব্যাংক যখন কিস্তি কেটে নেয়, তখন আসল যদি ১৫ শতাংশ কাটে, সুদ কেটে নেয় ৮৫ শতাংশ! তারা সুদ আগে কাটতে থাকে অর্ধেক সময় পর্যন্ত। সুদ শোধ হলো ৮০ শতাংশ এবং আপনি সাত/আট বছর কিস্তি শোধ করার পর দেখলেন, আসল সেই আসলের মতোই রয়ে গেছে!

এটা কিন্তু আপনাকে দিতেই হবে। যতদিন যাবে চাপ বাড়তে থাকবে, টেনশন বাড়তে থাকবে। এত

টাকা কোথেকে আসবে? ব্যস, আপনার শান্তি শেষ হয়ে গেল।

আর আপনি যদি কোনো প্রতারক রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ীর পাল্লায় পড়েন, তাহলে তো আম-ছালা সবই গেল। কারণ অনেকে আছেন, যারা বহু বছর ধরে কিস্তির টাকা দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ফ্ল্যাট বুঝে পাচ্ছেন না। ফ্ল্যাট কিছুদূর হয়ে আটকে আছে নয়তো দখল বুঝিয়ে দিচ্ছে না—এরকম ঘটনাও কম নয়।

আমরা ধরে নিলাম, আপনি খুব সৌভাগ্যবান, ফ্ল্যাট বুকিং দিলেন এবং পেয়েও গেলেন। কিন্তু কোথায় কিনলেন? আজকাল এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ফ্ল্যাট হচ্ছে না। অমুক গলির কোনো এক পাঁচ তলার অমুক কোণায় আপনার ফ্ল্যাট হলো কিন্তু কিছুদিন পর আপনার আর পছন্দ হচ্ছে না। যে দামে আপনি কিনেছিলেন, বিক্রি করতে গেলে দাম পাবেন তার অর্ধেক। তাই সেটাও পারছেন না। এজন্যেই বোধহয় কথায় বলে—কিনতে গেলে পাগল, বেচতে গেলে ছাগল।

আবার হয়তো দেখা গেল, আপনি যে ফ্ল্যাট নিয়েছেন তার পাশের ফ্ল্যাটের মালিক এক সম্ভ্রাসী। সে রাত ৩ টার সময় বাসায় ফেরে আর দরজায় লাথি মারতে থাকে। ঘুম ভেঙে আপনার হয়তো মনে হয়, আপনার দরজাই ভেঙে ফেলবে কিনা। কিংবা দেখলেন, আপনার প্রতিবেশী এক মাতাল এবং সে প্রতিরাতে বউকে পেটায়।

অথচ ভাড়া বাসা হলে আপনি কিন্তু অন্যত্র চলে যেতে পারতেন। নতুন বাসা ভাড়া নিতে পারতেন। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই। আগে অন্তত এক্ষেত্রে আপনি ছিলেন স্বাধীন। কিন্তু ফ্ল্যাটের মালিক হওয়ার পর সেই স্বাধীনতাকুও হারালেন। আর সোয়া কোটি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনলেন, ভাড়া দিতে গেলে মাসে ৩০ হাজার টাকার বেশি ভাড়া পাবেন না।

অর্থাৎ ফ্ল্যাট বুকিং দিচ্ছেন আপনি কিন্তু লাভটা হচ্ছে রিয়েল স্টেট কোম্পানিগুলোর। তারা বুলাচ্ছে কলা আর বিক্রি করছে মূলা। আপনিও কলা ভেবে

আসলে মূলাই নিচ্ছেন।

অতএব সবসময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। আল্লাহ যে মস্তিষ্কটা দিয়েছেন সেটা একটু ব্যবহার করবেন। টাকা সঞ্চয় করুন। ফ্ল্যাটে যে টাকা বিনিয়োগ করবেন, তা ব্যাংকে রাখলেও তার চেয়ে বেশি টাকা আসবে।

আরেকটি বিষয় হলো, আগে আপনি যে পরিমাণ দান করতেন, যাকাত দিতে পারতেন, ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে সেই সুযোগ আর আপনার থাকবে না। কারণ আপনার হাতে তো নগদ অর্থ নেই। প্রতি মাসের কিস্তি শোধ করতেই তো আপনার হিমশিম অবস্থা। আর যখন যাকাত নেই, দান নেই তখন আপনার জীবনে শান্তি আসবে কোথেকে? তাই জীবনে যদি শান্তি চান তবে কখনোই কোনো ব্যাপারে প্ররোচনায় প্রলোভনে ও হুজুগে গা ভাসিয়ে দেবেন না।

আগে একসময় বলা হতো যে, ঢাকা শহরে কেউ বাড়ি বানাতে গেলে তার হাট অ্যাটাক হয়। এখন শুনি যে, যারা ফ্ল্যাট কিনতে যাচ্ছেন, তাদেরও নাকি একই অবস্থা।

এবার আসি আরো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে। অনেকে মনে করেন, বাড়ি বানাতে বা ফ্ল্যাট কিনলে সম্ভ্রানরা অন্তত ভালো থাকবে। ওদের জন্যে একটা আর্থিক নিরাপত্তা থাকবে। কিন্তু ততদিনে ফ্ল্যাটের টাইলস জায়গায় জায়গায় খসে পড়তে শুরু করবে। পিলারগুলো সব দুর্বল হয়ে রানা প্লাজার মতো ধসে পড়ার অবস্থা হবে।

সবচেয়ে বড় কথা, আপনার রেখে যাওয়া ফ্ল্যাটে আপনার সম্ভ্রান তখনই থাকবে, ওইটুকু গণির মধ্যেই তার জীবন পার করবে—যদি সে হতভাগা হয়। এর মানে সম্ভ্রানকে আপনি উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারেন নি, সম্ভ্রান আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। সম্ভ্রানকে যথার্থ জ্ঞানী ও আলোকিত মানুষ হিসেবে এবং দক্ষতা ও যোগ্যতায় উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পর্যন্তই মা-বাবার দায়িত্ব। বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিকানা বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া নয়।

তাই ফ্ল্যাট নামক চোরাবালির মধ্যে পড়বেন না। জীবনটাকে অহেতুক জটিল করবেন না। চেষ্টা করুন জীবনটাকে যতটা সম্ভব সহজ করতে। যত সহজ করবেন, তত শান্তিতে থাকবেন। স্বস্তিতে থাকবেন।

আর আপনাকে কেন নতুন বাড়ি বানিয়ে বিয়ে করতে হবে? নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ছাড়া কেউ কি বিয়ে করছে না? একটা কথা মনে রাখবেন, যদি বিয়ে করার প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে সময়মতো বিয়ে করবেন এবং পারেন তো পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকবেন। একান্তই যদি স্থান সংকুলান না হয় তো বউ নিয়ে সাবলেটে গিয়ে উঠবেন। এটাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এ মাসের অটোসাজেশন

সম্ভ্রানের সামনে নিজেকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করব।
মমতা ও সঠিক জীবনদৃষ্টি দিয়ে তাকে বড় করে তুলব।



এতিম অসহায় শিশুর দায়িত্ব নিন স্রষ্টা আপনার দায়িত্ব নেবেন

একজন অনাথ-এতিমের পক্ষে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগ্রাম সবসময়ই কঠিন। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ পেলে তারাও হয়ে উঠতে পারে দেশ ও জাতির সম্পদ।

কয়েক বছর আগেও যদি কেউ বলত, একদিন দেশের সেরা স্কুল হবে বঞ্চিত-এতিমদের নিয়ে গড়ে ওঠা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তা-ও আবার ক্রীড়ানৈপুণ্যে! তবে তাকে কল্পনাবিলাসী বলাই ছিল অধিকাংশের মতামত। কারণ আমাদের দেশে এতিমখানা বলতেই চোখে ভেসে ওঠে রঙচটা ছেঁড়া জামা পরিহিত দুর্বল কিছু শিশুর ছবি। কিন্তু ২০১৭ সালে ক্রীড়ায় দেশের সব স্কুলগুলোকে ছাড়িয়ে সেরা স্কুল হয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। এমনকি পরের বছর ২০১৮-তেও!

বান্দরবান জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে ২০০১ সালে সাত জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে নিয়ে শুরু হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। এদেরই একজন সুমথঃ মুরং। খুলনা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করে এখন সে ডাক্তার। বর্তমানে কসমো স্কুল এন্ড কলেজে ২০টি জাতিগোষ্ঠীর ১৭ শতাব্দিক

শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। ২০১৭ সালে এইচএসসি উত্তীর্ণ ১৪ জনের সাত জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ছয় জন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে।

কোনো কোটা ছাড়াই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ও ক্রীড়াক্ষেত্রে সেরা হয়ে এই শিশুরা প্রমাণ করেছে মেধার কোনো জাতপাত নেই, ধর্মবর্ণগোত্র নেই। চাই শুধু মেধা বিকাশের সুযোগ।

দেড় যুগ ধরে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সম্ভবদ্ব দানে পরিচালিত হচ্ছে এ শিশুদের পড়াশোনা-খেলাধুলা-চিকিৎসাসহ সার্বিক খরচ।

প্রতিটি ধর্মেই সমাজকে সুন্দর করার জন্যে সামর্থ্যবানদের সুবিধাবঞ্চিত ও এতিমদের দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দানের ফলে দাতার জীবনে আসে প্রশান্তি ও প্রাচুর্য।

পবিত্র কোরআনে সূরা বালাদের ১২-১৮ আয়াত অনুসারে, ধর্মের দুর্গে স্রষ্টার আশ্রয় পাওয়ার একটি উপায় হচ্ছে এতিমের লালনপালন করা। অর্থাৎ এতিমকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিলে আপনার দায়িত্ব নেবেন স্বয়ং স্রষ্টা। তাই আপনিও দায়িত্ব নিন একটি এতিম শিশুর, শরিক হোন সৃষ্টির সেবায়।

এতিমান ফান্ড ॥ আপনিও শরিক হোন

শুরুটা হয়েছিল বান্দরবান লামার বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে, এখন সারা দেশের যে-কোনো জায়গার সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে চায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এতে অংশ নিতে পারেন আপনিও। আপনার দানের অর্থে এই শিশুরা গড়বে আলোকিত জীবন।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের জনপ্রতি মাসিক খরচ আট হাজার টাকা। আপনার সামর্থ্য অনুসারে এক বা একাধিক শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নিন। পরিচিতরা কয়েকজন মিলেও একজন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নিতে পারেন। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন : ০২-৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩



১৮ জুলাই
কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা
রক্তদান
কার্যক্রমের
উদ্যোগে ঢাকার
ইস্ট ওয়েস্ট
বিশ্ববিদ্যালয়ে
আয়োজিত ব্লাড
ক্যাম্পে
রক্তদান করেন
বিশ্ববিদ্যালয়ের
১৬৪ জন শিক্ষক
ও শিক্ষার্থী।



২৪, ২৫ ও ২৬ জুলাই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশাল সার্ভিস ক্লাব ব্লাড ক্যাম্প আয়োজন করে। প্রতি বছরের মতো এবারও কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় তিন দিনব্যাপী এ ক্যাম্প আয়োজিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলিয়ে ৫১১ জন রক্তদান করেন। ২৪ জুলাই ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম।

২ জুলাই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনার ৭৭ তম আসরে আমন্ত্রিত হন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। উক্ত অনুষ্ঠানে তারা যে আলোচনা উপস্থাপন করেন তার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।



বিশিষ্ট ব্যাংকার ও আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদেরও চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি তিনি একজন কলামিস্ট ও লেখক।

ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততা জীবনকে করে তোলে অর্থবহ

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পর ২০১০ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির চিফ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লেখালেখিতেও তিনি সিন্ধুহস্ত।

শোকরগোজার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

নদী পার হতে নৌকার প্রয়োজন হয়। তবে যদি নৌকার ভেতরে পানি ঢুকতে শুরু করে তবে নৌকা চলবে না, পানিতে ভাসার পরিবর্তে ডুবে যাবে। তেমনি দুনিয়াতে আমাদের দেহটা হলো নৌকা। এর ভেতরে যেন দুনিয়া প্রবেশ না করে, করলেই বিপত্তি। এটা বলে গেছেন মহাকবি শেখ সাদী।

ব্যাপারটা আমরা আরেকটি ঘটনার মাধ্যমে বুঝতে পারি। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র)-এর ঘটনা। একবার তার এক খাদেম এসে জানালেন-হুজুর একটা দুঃসংবাদ! আমাদের মালপত্র বোঝাই জাহাজ সাগরে ডুবে গেছে, বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। শুনে তিনি বললেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

দুদিন পর আবার খবর এলো-ঝড় উঠেছিল ঠিকই কিন্তু জাহাজ ডুবে ডুবে বেঁচে গেছে। এবারও তিনি বললেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ। খাদেম বিস্ময় ভরে বললেন, হুজুর আজ ভালো খবর দিলাম আপনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। ঐদিন খারাপ খবরেও শোকরগোজার ছিলেন। আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) বললেন, তুমি যখন একটা খারাপ সংবাদ দিলে তখন আমি মনকে জিজ্ঞেস করলাম-মন, তুই কী কষ্ট পেয়েছিস? মন বলল, না। তারপর ভালো খবর শুনে আবার জিজ্ঞেস করলাম-মন, তুই কী খুশি হয়েছিস? বলল, না। অর্থাৎ লোকসান হলেও আলহামদুলিল্লাহ, লাভ হলেও আলহামদুলিল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ায় শোকরগোজার দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়।

পরশ-পাথর কবিতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক দরিদ্র পরিবারের কথা বলেছেন। স্ত্রী স্বামীকে বলল, পরশ-পাথর বলে একটা পাথর আছে যার স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়। দেখ তো খুঁজে পাও কিনা। তো সে কোথাও খুঁজে পায় না। একদিন মরণভূমির মাঝে দেখল এক সাধু তপস্যা করছে। সে বলল, বাবা আমার পরশ-পাথর দরকার। এটা কোথায় পাব? শুনে সাধু তার থলে থেকে একটা পাথর বের করে বললেন যে, এটা?

সত্যিই দেখা গেল, পাথরটি যেই লোহাতে লাগানো হলো অমনি ওটা সোনা হয়ে গেছে। সে মহাখুশিতে এক দোঁড়। কিছুদূর গিয়ে তার মনে হলো-আমাকে পরশ-পাথর এমনি এমনি দিয়ে দিল? তার কাছে নিশ্চয়ই আরো মূল্যবান কিছু আছে। সে আবার গেল সেই সাধুর কাছে। সাধু আত্মনিমগ্নতার মধ্য দিয়ে সত্যিই পরশ-পাথরের চেয়েও মূল্যবান কিছু পেয়েছিলেন। তা হলো সত্যজ্ঞান।

তাই জ্ঞান ও শিক্ষা এক নয়। প্রচলিত শিক্ষা না পেয়েও একজন মানুষ জ্ঞানী হতে পারেন। আত্মনিমগ্নতার পথ ধরেই মুনি-ঋষি, সুফিসাধক সন্ন্যাসীরা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রকৃত মানুষ হতে হলে প্রয়োজন এই আত্মনিমগ্নতা।

সেনাবাহিনী যখন যুদ্ধে যায় তখন হেডকোয়ার্টারের সাথে তাদের যোগাযোগ রাখতে হয়। যদি হেডকোয়ার্টারের সাথে তাদের যোগাযোগ না থাকে তাহলে যুদ্ধের মাঠে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তারা ঠিকমতো রসদ পায় না, নির্দেশনা পায় না এবং শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

তেমনি আমাদের এ আত্মার যদি হেডকোয়ার্টারের সাথে অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে যোগাযোগ ভালো থাকে তবেই আমরা ভালো থাকব। যেমন, স্বচ্ছ আয়নায় যদি মরিচা ধরে যায় তাহলে তাতে আলোর প্রতিফলন হয় না। তেমনি এই আত্মাটা যখন দুনিয়াদারি ও নানাভাবে ময়লাযুক্ত হয়ে যায় তখন পরমাত্মা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং আত্মাকে পরিষ্কার রাখতে হবে।

আধুনিক যুগেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একজন সুস্থ ব্যক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ থাকার সাথে সাথে আত্মিক সুস্থতার কথাও উল্লেখ করেছে। কেন করেছে? একজন লোক হয়তো-বা দৈহিকভাবে দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু মনে তার সবসময় অশান্তি। হেডকোয়ার্টারের সাথে অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে যোগাযোগ না থাকায় সে বিভ্রান্ত। পার্থিব মোহে সে ঘুরছে। নিজেকে চিনতেই পারছে না। তাহলে আত্মিকভাবে সে কতটা সুস্থ?

ধর্মের সাথে কর্মের সম্পর্কটা আমাদের বুঝতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। সংসার ধর্ম ফেলে বনে গিয়ে বসে থাকাটাই সাধনা নয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক খান বাহাদুর আব্বাছানউল্লাহ বলে গেছেন-সৃষ্টির সেবা স্রষ্টার ইবাদত। স্বামী বিবেকানন্দও একই কথা বলেছেন, জীবের প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। অর্থাৎ কেউ যদি সেবা করে সৃষ্টিকে ওটাই স্রষ্টার ইবাদত। সৃষ্টির সেবাই আমাদের মূল কর্ম।

ধর্ম অর্থবহ হবে যদি কর্ম থাকে। আবার ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততা জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। অর্থাৎ এই জীবনযাপন অর্থহীন হবে যদি ধর্মের আদর্শ না থাকে, নৈতিকতা না থাকে।

নৈতিকতা একটা শক্তি। এটা মনের ভেতর থেকে আসে। আপনি যদি নীতি ও নৈতিকতা মেনে চলেন আপনার রাতে ভালো ঘুম হবে। আপনার কোনো ভয় থাকবে না। আজকে আপনার একটা সমস্যা থাকলেও সহজ সত্য হচ্ছে, জীবনে নৈতিকতা থাকলে আপনার আজকের সমস্যা কাল আর থাকবে না। থাকে না। যখন আপনি দুঃখে থাকবেন তখন ভাবতে হবে যে, সুখ আসছে।

আমরা আসলে বিশ্বাসের বিশ্বাসে বাস করি। বিশ্বাস যদি না থাকে, পরস্পরের প্রতি আস্থা যদি না থাকে তাহলে এ পৃথিবী বসবাসযোগ্য হতো না। আমি যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভালোভাবে বুঝি, নিজের ওপর এবং স্রষ্টার ওপর আমার বিশ্বাস থাকে তাহলে কোনো বাধাই আর বাধা নয়।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : আগস্ট ২০১৮ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক
৩১/৩১ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethord.org.bd



বিশেষ বুলেটিন ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮

সাক্ষ্যের সরলপথ

কোয়ান্টাম মেথড

দেহ-মন সুরক্ষায়

কোয়ান্টামে আসুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে, চিকিৎসাব্যয় মেটাতে বাংলাদেশে প্রতিবছর নিঃশ্বাস হয়ে পড়ছে সাড়ে ৫২ লক্ষ মানুষ। এর পাশাপাশি বাড়ি ধরনের আকস্মিক স্বাস্থ্যব্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে আরো সোয়া দুই কোটি মানুষ। আশঙ্কার কথা, প্রতিবছরই এটি বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, বিপুল চিকিৎসাব্যয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ষষ্ঠ! গবেষকদের মতে, চিকিৎসাব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে রোগের ধরনও। দ্রুত জীবন-অভ্যাসের ফলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে অসংক্রামক রোগব্যাদি। বাড়ছে হরেক রকমের মনোদৈহিক জটিলতা, অশান্তি ও সামাজিক অস্থিরতা।

এর কারণ উঠে এসেছে গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে। তারা বলছেন, গত কয়েক দশকে দৃশ্যমান ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থায়। সেইসাথে আছে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা প্রযুক্তির আশ্রয়। তাই বলা যায়, ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের সুস্থ জীবনধারা, নৈতিক জীবনদৃষ্টি ও শাস্ত্রত মূল্যবোধ। একটু একটু করে চিড় ধরতে শুরু করেছে আমাদের

হাজার বছরের ঐতিহ্য-পারিবারিক রুন ও সামাজিক সম্প্রীতিতে।

এই ধারাবাহিকতায় অধিকাংশ মানুষের জীবনই এখন আবর্তিত হচ্ছে স্বাস্থ্যঘাতী জীবনচারণের পঙ্কিলচক্রে। তারা ঘুরপাক খাচ্ছে জীবনধর্মসৌ নেতিবাচকতার বুকে, যা ক্রমাগত ক্লান্ত অবসন্ন ও বিষণ্ণ করে তুলছে তাদের দেহ-মন। আর এরই ফলাফল এই সর্বগ্রাসী অসুস্থতা ও বিপুল চিকিৎসাব্যয়, যা ক্রমান্বয়ে আক্রান্ত করছে ব্যক্তির জীবন, হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে পারিবারিক স্বস্তি-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকেও।

এখন উপায়?

সমাধান একটাই। মানবিক ও নৈতিক জীবনদৃষ্টি অনুসরণ এবং বিজ্ঞানসম্মত ও সুস্থ জীবনচার চর্চা। আমরা বলতে পারি, এটি একদিকে যেমন সকল ধর্মের চিরায়ত শিক্ষা, তেমনি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে সুস্থ জীবনধারা সংক্রান্ত হাজারো গবেষণা-ফলাফলের সারকথাও তা-ই। আর সেটাই সময়োপযোগী ভাষায় ও অত্যন্ত সহজ আঙ্গিকে সমন্বিত হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে।

১৯৯৩ সাল। ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনে আশাহীনতাই ছিল যখন ঘুরেফিরে সব আলোচনার বিষয়বস্তু, কোয়ান্টাম সেদিন বলেছে পরিবর্তনের কথা; সমস্ত অন্ধকারকে উপেক্ষা করে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে আলোর সম্ভাবনা। সবিস্থাসে বলেছে, আপনিও পারবেন হতাশাকে আশায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, রোগকে সুস্থতায় আর সব ধরনের অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপ দিতে। মানুষ যা পেরেছে, যা অর্জন করেছে, যা জয় করেছে-তার সবকিছু আপনিও পারবেন। এ শক্তি

আপনার মধ্যেই আছে। চাই শুধু অটল প্রত্যয়, অবিচল লক্ষ্য এবং নিরন্তর পরিশ্রমের মাধ্যমে লেগে থাকা।

তারপর পেরিয়ে গেছে সিকি শতাব্দীরও বেশি সময়। সেদিনের কথাগুলোই আজ পরিণত হয়েছে অগণিত বাস্তব উদাহরণে। সময়ের পথ ধরে দেশের লাখো মানুষ উদ্ধৃত হয়েছেন এ আত্মজয়ী চেতনায়। সুদৃঢ় বিশ্বাসে তারা অনুসরণ করে গেছেন কোয়ান্টাম জীবনচর্চা। এবং নিজেরাই একসময় হয়ে উঠেছেন চারপাশের রোগপীড়িত, হতাশাজর্জর ও দুর্দশাগ্রস্ত বহু মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস।

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনচার অনুসরণের মধ্য দিয়ে তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছেন সুস্বাস্থ্য, সাফল্য ও প্রশান্তির পথে। নৈতিক উদ্দীপনায় মুক্ত হয়েছেন ভার্চুয়াল ভাইরাস (ফেসবুক, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, ইউটিউব ইত্যাদি) ও সবরকম আসক্তি থেকে। স্বতঃস্ফূর্ত গতিময়তায় বদলে গেছে তাদের জীবন। ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি সজ্ঞাবদ্ধ ও সমমর্মী প্রচেষ্টায় তারা চালিয়ে যাচ্ছেন একাধিক অনন্য সেবা-উদ্যোগ। দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে যা নীরবে রেখে চলেছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রচারের আলো এড়িয়ে এভাবেই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম পরিবার।

বদলে যাচ্ছে মানুষ, এগিয়ে যাচ্ছে প্রিয় বাংলাদেশ।

প্রিয় সুহৃদ, আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন? আত্মজয়ের পাশাপাশি নিজের দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নেয়ার এ অভিযাত্রায় शामिल হোন আপনিও। সক্রিয় অংশীদার হোন এ মানবিক অগ্রযাত্রার। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৪৫০ ব্যাচে অংশ নিন। পুঁজিবাদী পণ্য-আশ্রয়, ভোগাসক্তি ও যাবতীয় ভার্চুয়াল বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকুক আপনার দেহ-মন। নিরাপদ থাকুক আপনার সন্তান, আপনার পরিবার।

আমাদের সম্মিলিত জাগরণে সূচিত হোক এক সমৃদ্ধ আগামী।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৫০ তম ব্যাচ ৯ ডাকা

২১, ২২, ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা



গুণীজন দৃষ্টিতে কোয়ান্টাম



ডা. আব্দুল মালিক

ড. আনিসুজ্জামান

ড. এম শমশের আলী



ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

এম. আমীর-উল ইসলাম

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

‘বড় হতে হলে দরকার বড় স্বপ্ন। বান্দরবান লামার মতো একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুস্থ ও বঞ্চিত পরিবারের শিশুদের যেভাবে বড় স্বপ্নে কোয়ান্টাম উদ্বুদ্ধ করছে ও তাদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়তে আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এজন্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে আমি ধন্যবাদ জানাই।’

জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক

‘অন্তরের ধ্বনি শুনতে হলে চাই নীরবতা, আত্মনিমগ্নতা ও ব্রেনে আলফা ওয়েভ। এজন্যেই মেডিটেশন গুরুত্বপূর্ণ। ধ্যানের নীরবতায় আমরা ভেতরের ডাক শুনতে পাই।’

ড. এম শমশের আলী। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী, গবেষক ও লেখক

‘আমাদের প্রত্যেকের মনের একটা শক্তি আছে। সে শক্তির জাগরণ ঘটানো প্রয়োজন। মেডিটেশন মানুষের মধ্যে এই জাগরণ ঘটায়।’

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। শিক্ষাবিদ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা

‘এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সেই উদ্যোগ ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে চলেছে।’

জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর উপাচার্য

‘জাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে চাই মানবিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজ-সচেতন মানুষ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তাদের কাজের মধ্য দিয়ে সেই সমাজ-সচেতন মানুষই তৈরি করছে।’

ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম। বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা

‘ব্যক্তিমানুষের উপকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মানুষকে সামষ্টিক কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করছে। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতের বাংলাদেশ একদিন অবশ্যই এ-কাজের মূল্যায়ন করবে।’

আনোয়ারা সৈয়দ হক। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও মনোচিকিৎসক

‘আমরা যদি সম্ভব হতে পারি তাহলে আমাদের সুস্থতা, প্রশান্তি, কর্মব্যস্ততা ও সুখী জীবন-এ চারটি বিষয় অর্জন করা খুব সহজ। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের জাগ্রত করার চেষ্টা করছি।’

কামাল লোহানী। বরেন্দ্র সাংবাদিক ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

‘সুস্থ থাকতে চাইলে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই। আর পরিপূর্ণ সুখী হতে হলে আত্মাকেও সুস্থ রাখতে হবে। আত্মার সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন ধর্মের মূল শিক্ষার অনুশীলন, নিয়মিত প্রার্থনা ও মেডিটেশন। এটি রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে চমৎকার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ জন্যেই কোয়ান্টামের শিক্ষা বয়স-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে সব মানুষের জন্যেই প্রয়োজন।’

জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে (অব) ডা. আব্দুল মালিক। বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ

‘মেডিটেশন করলে শরীর শিথিল হয়। মনে প্রশান্তি আসে। টেনশন দূর হয়। হার্টবিট ও রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। তাই মেডিটেশন করুন, সুস্থ থাকুন।’

অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ। বিভাগীয় প্রধান, প্যাণিয়েটিভ মেডিসিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

‘নীরব কাজই শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়। মানবকল্যাণে কোয়ান্টামের কর্মপ্রয়াস দেখে আমি অভিভূত! নীরব কাজই কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় শক্তি।’

সৈয়দ আবুল মকসুদ। কলামিস্ট, লেখক ও গবেষক

‘মানুষকে কর্মময় জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ করে কোয়ান্টাম। যারা জীবনকে সুন্দর দেখতে চান, জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করতে চান, তারা কোয়ান্টাম থেকে জীবনযাপনের বিজ্ঞান শিখতে পারেন। আমি মনে করি, আমাদের সন্তানদের জন্যে এ কোর্স অবশ্য কর্তব্য।’

মুস্তাফা জামান আব্বাসী। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সংগীতজ্ঞ ও লেখক

‘যে-কোনো পরিস্থিতিতে মনের সাহস রাখাই কোয়ান্টামের মূল সুর। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর সার্বজনীন আবেদন। সকল ধর্মের সকল মানুষের জন্যে গ্রহণযোগ্য এ কোর্স।’

ফেরদৌসী মজুমদার। নাট্যব্যক্তিত্ব

‘আমাদের নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা দরকার-যারা সমাজের উন্নতি নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিন্তা করবে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সমাজের মানুষের মধ্যে এ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করছে, যা দেশ ও জাতির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ। শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়



কামাল লোহানী

আনোয়ারা সৈয়দ হক

সৈয়দ আবুল মকসুদ

মুস্তাফা জামান আব্বাসী

ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

ফেরদৌসী মজুমদার

ব্যক্তির বিকাশ ও জাতিগত সমৃদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে অবিদ্যা। সত্যিকারের স্বাধীনতা, কল্যাণ ও মুক্তিচিন্তার পথেও অন্যতম প্রতিবন্ধক এটি। সাধারণভাবে বলা যায়, ক্ষতিকর যে-কোনো তথ্য ধারণা জ্ঞান ও সংস্কার-এসব অবিদ্যা।

মানুষকে অবিদ্যার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ২৬ বছর ধরে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম। আজ সমাজের সর্বস্তরে দেখা মিলছে ইতিবাচক পরিবর্তন, বদলে যাচ্ছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। তুলে ধরা হলো এমনই কিছু পরিবর্তনের খণ্ডচিত্র।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

বেশ ভালো আছি

‘কেমন আছেন?’ প্রশ্নের জবাবে বেশিরভাগ মানুষই বলতেন, ‘এই তো আছি’ বা ‘কোনোরকম কেটে যাচ্ছে’। বহু বছরের এই নেতিবাচকতা ছিন্ন করে কোয়ান্টাম সূচনা করে নতুন ধারা-‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বেশ ভালো আছি’।

নবীজী (স)-এর শিক্ষাও হচ্ছে, কুশল জিজ্ঞাসায় সবসময় শুকরিয়ার প্রকাশ। কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের চর্চা ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। এখন কুশল জিজ্ঞাসায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর-শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বেশ ভালো আছি।

সালামের চর্চা ৯ শান্তিময় ও সমমর্মী পরিমণ্ডল

২০১৪ সাল থেকে কোয়ান্টাম সদস্যরা দৈনন্দিন জীবনে দেখা হলেই ছোট-বড় নির্বিশেষে পরিবার, প্রতিবেশী, কর্মক্ষেত্র, সামাজিক অনুষ্ঠানসহ সবখানে সবাইকে সালাম দেয়ার চর্চা শুরু করেন।

পারস্পরিক শান্তি কামনার এ রীতি অনুসরণের ফলে ঘরে-বাইরে সর্বত্র সম্পর্কগুলো হয়ে উঠছে আগের চেয়ে সহজ ও সমমর্মী, চারপাশ হয়ে উঠছে আরো শান্তিময়।

ইতিবাচক প্রত্যয়ের অনুরণনে মুখরিত চারপাশ

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন, সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন, আমি পারি আমি করব আমার জীবন আমি গড়ব-কোয়ান্টামের এই সহজ সাবলীল কথাগুলো সমাজের সর্বস্তরের মানুষ গ্রহণ করেছে সাগ্রহে।

কারণ ইতিবাচক এ শব্দগুলো উচ্চারণের মধ্য দিয়ে জাগ্রত হচ্ছে ব্যক্তির অন্তর্গত শক্তি। কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে, এভাবেই ব্যক্তির পরিবর্তনের সূত্র ধরে গড়ে উঠবে এক মানবিক মহাসমাজ; নৈতিকতা ও সেবায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে আমাদের প্রিয় স্বদেশ।

সামাজিক গিফট নামক ব্যাধি ৯

গড়ে উঠছে সচেতনতা

বিয়ে, বৌভাত, জন্মদিন, আকিকা, সুনতে খতনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গিফট দেয়া একটি সামাজিক কুপ্রথা, যা সুসম্পর্কের নামে অনভিপ্রেত চাপ সৃষ্টি করে। তাই নীতিগতভাবেই এ ধরনের উপহার দেয়া বা নেয়া দুটোই বর্জন করে আসছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা।

সমাজেও ধীরে ধীরে এ রীতিই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। অনেকেই এখন বিবাহ বা সামাজিক অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্রে লিখে দিচ্ছেন-কোনো পণ্য নয়, আপনার দোয়াই সবচেয়ে বড় উপহার।



সময়ের ছন্দে জীবন ছন্দময়

প্রচলিত ধারণা ছিল, এ দেশে কখনো কোনো অনুষ্ঠান সময়মতো করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোয়ান্টাম বিশ্বাস করেছে, সময়মতো শুরু করা এবং শেষ করা দুটোই সম্ভব। তাই সূচনালগ্ন থেকেই কোয়ান্টামের সব প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কোনো দুর্ভোগও বাধা হয় নি সময়ানুবর্তিতার পথে।

বৈশাখে ও নববর্ষে ইলিশ বর্জন, বেড়েছে ইলিশের আকার ও উৎপাদন

প্রতিবছর বৈশাখ আসার আগেই হু হু করে বাড়তে থাকে ইলিশের দাম। ইলিশের প্রজনন মৌসুমে সোৎসাহে ইলিশ কিনে ক্রেতারা আসলে ইলিশের বিলুপ্তিতেই সহযোগিতা করছিলেন!

এই প্রেক্ষাপটে ২০১৩ সালে বৈশাখে ইলিশ বর্জনের আহ্বান জানায় কোয়ান্টাম। ধীরে ধীরে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করল জাতীয় অঙ্গনে।

২০১৬ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সমাজের সচেতন মহলে পাস্তা-ইলিশের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা দেখা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও নববর্ষের খাদ্যতালিকা থেকে ইলিশ বর্জন করেন। সম্মিলিত এ প্রয়াসের ফলে বেড়েছে আমাদের দেশের ইলিশের আকার এবং বৃদ্ধি পেয়েছে এর উৎপাদন।

কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসকে ‘না’ বলুন

কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস হতে পারে মেদশূলতা, দাঁতক্ষয়, হাড়ক্ষয়, কিডনি বৈকল্য, বন্ধ্যাত্ব, বদহজম, ডায়াবেটিস, অকালে বুড়িয়ে যাওয়া এমনকি ক্যান্সারেরও কারণ। তাই নিজেরা এসব ক্ষতিকর পানীয় গ্রহণ ও পরিবেশন পরিহার করার সাথে সাথে পরিচিতদেরও সচেতন করে আসছে কোয়ান্টাম। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতেও কোমল পানীয় পরিবেশন কমেছে লক্ষণীয়ভাবে।

সুখী পরিবার গঠনে সচেতন প্রয়াস

কোয়ান্টামে বলা হয়, যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না তার মাঝখানে দেয়াল তুলবেন না, সেখানে গড়ে তুলুন মমতার সেতু। পারিবারিক সম্প্রীতি নিয়ে এমনই সব কথা শুনতে শুনতে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা সচেতন হয়ে ওঠেন পরিবারকে সুখী করতে।

সাবধান! ভারুয়াল ভাইরাস

২০০৯ সাল থেকে ফেসবুকসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আধুনিক প্রযুক্তিপণ্যের আসক্তি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করেছে কোয়ান্টাম। এরই ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮-তে শুরু হয় ভারুয়াল ভাইরাস ক্যাম্পেইন। এসময় দেশজুড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজনের পাশাপাশি সর্বত্র পৌছে দেয়া হয় এ-সম্পর্কিত বুলেটিন ফোল্ডার স্টিকার ও ভিডিও।

সুস্থতার জন্যে সুস্থ জীবনদৃষ্টি

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, শতকরা ৭৫ ভাগ রোগের কারণই মনোদৈহিক। মনের দুঃখ কষ্ট ক্ষোভ হতাশা জমে দেহে ব্যথা-বেদনা রূপে প্রকাশ পায়। আর বাকি ২৫ ভাগ রোগের কারণ জীবাণু সংক্রমণ, ভুল খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম না করা, দৈহিক আঘাত, ওষুধ ও অপারেশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। তাই শতকরা ৭৫ ভাগ রোগ নিরাময় হতে পারে সুস্থ জীবনদৃষ্টি গ্রহণের মধ্য দিয়ে। আর দৃষ্টিভঙ্গি বদলের সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে মেডিটেশন।

ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ, পণ্যসত্তি ও অপচয় ৯

বাড়ছে সচেতনতা

ঋণের জালে আবদ্ধ এখন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। উপার্জন ও ঋণের টাকা-সবই বেহিসাব খরচ হয়ে যায় পণ্যসত্তি ও ঠুনকো ফুটানিতে। শ্রেণিভেদে ক্ষুদ্রঋণ অথবা ক্রেডিট কার্ডের ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অগণিত মানুষ। বেনিয়াগোষ্ঠীর এ ফাঁদগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে কোয়ান্টাম। ঋণমুক্ত সচ্ছল জীবন আমার মৌলিক অধিকার-এই বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে সবার মাঝে।

গুদাচার ও সুবচনে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

তরুণ প্রজন্মকে সদাচারী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে কোয়ান্টাম সবসময়ই গুরুত্ব দিয়েছে সুবচন ও গুদাচারের চর্চাকে। এ লক্ষ্যে কোয়ান্টামের নানা উদ্যোগের পাশাপাশি রয়েছে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকাশনা ও অডিও।

স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে সকল সেবাকার্য

বাইরের কোনো সাহায্য বা অনুদান ছাড়া সেবামূলক কাজ করা সম্ভব নয়-এ ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছে কোয়ান্টাম। স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে স্বচ্ছ রক্তদান, মাতৃমঙ্গল, কোয়ান্টাম কসমো স্কুলসহ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম। সজ্জবদ্ধ এ বিশ্বাস ক্রমশ সঞ্চারিত হয়েছে জাতির মাঝে। তরুণরা ক্রমেই বেরিয়ে আসছে কেরানি প্রবৃত্তি থেকে, আগ্রহী হয়ে উঠছে স্বাধীন পেশায়।

মহামতি বুদ্ধ সমস্ত দুঃখের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অবিদ্যাকে। মানবশ্রেষ্ঠ হযরত মুহম্মদ (স) যে চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, যার মধ্যে প্রথমটিই হচ্ছে ক্ষতিকর ইলম অর্থাৎ অবিদ্যা। সিকি শতাব্দী ধরে সমাজ থেকে অবিদ্যা দূর করার এই সজ্জবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে কোয়ান্টাম। এ কল্যাণ প্রয়াসে আপনাকেও স্বাগতম।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি

২৬ বছর ধরে সম্পন্ন হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৪৯টি ব্যাচ, যেখানে অংশ নিয়ে চারপাশের লাখো মানুষ পেয়েছেন সাফল্য এবং সুস্থতার সহজ ও বিজ্ঞানভিত্তিক পথনির্দেশনা।

সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৫০ তম ব্যাচ। আপনিও অংশ নিন। মেডিটেশনের মাধ্যমে আবিষ্কার করুন আপনার মন ও মস্তিষ্কের অপার সম্ভাবনা। হয়ে উঠুন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের অনন্য দৃষ্টান্ত।



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের শিক্ষা আমাকে নিজের শক্তি, কাজ ও সন্তাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। এ চার দিন আত্ম উপলব্ধি ও আত্ম উন্নয়নে যা শিখলাম, তা অনুসরণ করলে আমাদের দেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। আমাদের শিক্ষা কারিকুলামে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করলে বাংলাদেশ জেগে উঠবে।

অধ্যাপক ড. বশির আহমেদ

অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৩৭ ব্যাচ

যোগ-মেডিটেশন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। শহুরে জীবনে প্রযুক্তির উৎকর্ষের মাঝে প্রায় হারিয়ে যাওয়া যোগ-ধ্যান এ যুগে চর্চা করতে পারায় সত্যিই আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। পাশ্চাত্যেও এখন যোগ-ধ্যানের চর্চা হচ্ছে। এখানে যা পেলাম, তা আমার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে।

ড. নির্মল চন্দ্র শীল

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। ৪২৯ ব্যাচ



আমার রাগের পরিমাণটা একটু বেশিই ছিল। এজন্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেতে আমার প্রিয়জনরা। রাগের কারণে আমার ভালো গুণগুলোও চাপা পড়ে যাচ্ছিল। কোর্স করার পর রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি।

অধ্যাপক আফরোজা সুলতানা

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা কলেজ। ৪৩২ ব্যাচ

একজন শিক্ষক হিসেবে আমার মনে হয়, শিক্ষার্থীদের আমরা যা শেখাই তা তাদের জীবিকার জন্যে শেখাই। কিন্তু কোয়ান্টাম যে শিক্ষা দেয়, তা হলো জীবনের জন্যে শিক্ষা। আমি মনে করি, এই কোর্স আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কোর্স।

ড. শামীমা তাসনীম

সহযোগী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ৪২২ ব্যাচ



এই কোর্সে এসে প্রাণায়াম ও দমচর্চার মাধ্যমে দেহ-মনের এনার্জি লেভেল ব্যালেন্স করতে শিখেছি। সফট ড্রিংকস ও ফাস্টফুডের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। নিজস্ব গবেষণাতেও দেখেছি, এসব খাবার অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মো. মমিনুর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক, কেমিক্যাল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৩২ ব্যাচ

বিভেদ-ই পাপ; অভেদ জ্ঞানই পুণ্য-স্বামী বিবেকানন্দের বাণী থেকে শিখেছিলাম। আর এ কোর্সে এসে গুরুজীর সার্বজনীন ভাবনা আমার এই শিক্ষাকে শক্তি যুগিয়েছে। এখানে এসে আমি যা হারিয়েছি, তা হলো আমার রাগ-ক্রোধ।

ড. নিরদ চন্দ্র সরকার

উপ-পরিচালক, মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাতার, ঢাকা। ৪৩২ ব্যাচ



প্রতিদিন আমার অনেকটা সময় চলে যেত ফেসবুকিং করতে। বাসাতেও দেখতাম আমার ছেলেমেয়ে ট্যাব আর স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত। আমার স্ত্রী হয়তো ইউটিউবে রান্নার অনুষ্ঠান দেখছেন। এতদিন বুঝতে পারি নি-আমরা ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলাম। কোর্সে এসে আমি সচেতন হয়েছি এবং উদ্যোগী হয়েছি ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে।

মোহাম্মদ মোরাদ হোসেন

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, এলিট পেইন্ট এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি। ৪৪৩ ব্যাচ

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে বিশ্বাসের কথাই বার বার অনুরণিত হয়েছে। বিশ্বাস এবং ধৈর্য-জীবনে এ দুটো সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও একই কথা বলতে চাই-কখনো বিশ্বাস হারানো যাবে না।



আনোয়ারা বেগম

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী। ৪৩৪ ব্যাচ

আমি আবার কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসব শুধু এই ভালো কথাগুলো শোনার জন্যে। আমাদের দেশটায় ভালো কথা খুব অভাব রয়েছে। কোর্সে যতক্ষণ ছিলাম, মনে হয়েছে, এ কথাগুলো যদি দেশের সব অঞ্চলের সব মানুষকে শোনানো যেত এবং সচেতন করা যেত, খুব ভালো হতো।



আফজাল হোসেন

অভিনেতা, নাট্যকার, নির্মাতা ও লেখক। ৩৯৭ ব্যাচ



কোয়ান্টাম মেথড কোর্স শুধু সায়েন্স অব লিভিং নয়, আমি বলতে চাই এটা আর্ট অব লিভিং-ও। সবকিছু মিলিয়ে এ এক চমৎকার শিল্প, যা আমাদের সবার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই আমি প্রত্যাশা করব, মানুষের কল্যাণে এ প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী বিস্তৃত হোক।

মাহমুদ সাজ্জাদ

অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ৪২৯ ব্যাচ



কোর্সের প্রথমদিন থেকে লক্ষ করছি, আলোচনার প্রতিটি বিষয় খুব সহজভাবে নানা উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, যা আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। এখানে এসে মেডিটেশনের মাধ্যমে সহজেই আমরা নিজের সাথে একাত্ম হতে পেরেছি।

ফাল্গুনী হামিদ

অভিনেত্রী, লেখক এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রাক্তন পরিচালক। ৪৩০ ব্যাচ

ধ্যানের মতো একটি বিষয়কে ধর্মবর্ণ ও মত নির্বিশেষে গুরুজী যেভাবে সার্বজনীন একটি প্ল্যাটফর্মে এনেছেন, তা সত্যিই অসাধারণ। আমরা যে-কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ এখান থেকে উপকৃত হতে পারছি খুব সহজে। এরকম তথ্যসমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত আলোচনা আমি আমার জীবনে কোথাও পাই নি।



মো. পারভেজ সাজ্জাদ

সংগীত শিল্পী। ৪৩৩ ব্যাচ

প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের সূত্র পেয়েছেন লাখো মানুষ



সত্যিকারের সুখী মানুষ ও সুখী পরিবার গড়ার একটি একাডেমি হলো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এখানে বিনয়ের চর্চা দেখে আমি অভিভূত। আমার মনে হচ্ছে, কোর্সটি করতে অনেক দেরি করে ফেলেছি।

ইঞ্জি. কাজী নজরুল ইসলাম

সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ। ৪৪৮ ব্যাচ



২০ বছর ধরে আমার মাইগ্রেনের ব্যথা ছিল। কোয়ান্টামের শিথিলায়ন মেডিটেশন নিয়মিত চর্চা করে আমার মাথাব্যথা আর নেই। এ কোর্সে অংশ নিয়ে আমার সুস্থতা অনেক বেড়েছে।

সৈয়দা নাজমা ইসলাম

গৃহিণী। ৪২৭ ব্যাচ



আগে লক্ষ্যস্থির করতে পারলেও পরিশ্রম করতাম না। কিন্তু এ কোর্সে এসে জানলাম, মাইন্ড সেট যেভাবে হবে মস্তিষ্কও সেভাবেই কাজ করবে। মেডিটেশনে তাই নিজেকে বার বার বলেছি-আমি পারব।

শাহেদা সুলতানা পিথকি

শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, আইইউবি। ৪৩২ ব্যাচ



আমি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং ১০ বছর ধরে আমার কোমরে বেশ ব্যথা ছিল। ব্যথার কারণে কাজে মনোযোগ দিতে পারতাম না। মেডিটেশন চর্চা করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং ব্যথাটাও আর নেই।

মো. মহসীন

ব্যবসায়ী। ৪২৩ ব্যাচ



আগে মাথাব্যথার জন্যে ১০-১৫ মিনিটের বেশি পড়তে পারতাম না। মেডিটেশন করে আমার মাথাব্যথা দূর হয়েছে। পড়ালেখাতেও আমি মনোযোগী হতে পেরেছি। আমার মন অনেক স্থির হয়েছে।

রিয়া দাস

শিক্ষার্থী, এভিয়েশন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট। ৪৩২ ব্যাচ



কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোয়ান্টামে কী পেয়েছেন? আমি বলব, জ্ঞানের একটি শহর পেয়েছি। এই জ্ঞান আমার জীবনকে সুন্দর করবে বলে আমার বিশ্বাস।

মিজানুর রহমান

শিক্ষার্থী, ফাজিল, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা। ৪২২ ব্যাচ



এ কোর্সের প্রতিটি বিষয়ই ধর্মসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত। এখানে সকল ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা ও সম্মানের মনোভাব দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

সৈয়দ ফকরুদ্দিন আল রাজী
খতিব, পুলিশ লাইন জামে মসজিদ, কুমিল্লা। ৪৩১ ব্যাচ



সবার জীবনেই একটি লক্ষ্য থাকা জরুরি এবং এ বিষয়গুলো নিয়েই এ কোর্সে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম।

জিয়া ইসলাম

চিফ ফটো জার্নালিস্ট, দৈনিক প্রথম আলো। ৪৩২ ব্যাচ



এ কোর্স থেকে শেখা জ্ঞান আমাকে পারিবারিক জীবন ও পেশাজীবনে সফল হতে সাহায্য করবে।

তাসনীম তামান্না

এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এবি ব্যাংক লিমিটেড। ৪৩২ ব্যাচ



একজন আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্যে প্রয়োজন সুস্থ দেহ ও মনের সাথে মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। আর এ প্রক্রিয়াটাই শেখানো হয় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে।

জান্নাতুল বাকের খান

পরিচালক, পদ্মা শাটেল আরব ফ্যাশন লি। ৪৪৩ ব্যাচ



যারা হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন, এমন রোগীদের আমরা মেডিটেশন চর্চার পরামর্শ দিয়ে থাকি। চিকিৎসক হিসেবে আমি মনে করি, এ কোর্স তাদেরকে সুস্থতার পথ দেখাবে।

ডা. মোহাম্মদ ফেরদৌস রহমান সরকার

রিসার্চ ফেলো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। ৪২৭ ব্যাচ



কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি যারা চর্চা করছেন, তাদের ইতিবাচক আচরণ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। অন্যান্য মানুষ হওয়ার প্রতিষ্ঠান এটি। আমার সন্তানদেরও এ কোর্সের শিক্ষাগুলো দিতে চাই।

ফকরুল আলম খান কাঞ্চন

চিফ অব করেসপন্ডেন্ট, এনটিভি। ৪৩২ ব্যাচ



এতদিন মনের মধ্যে রাগ-ক্ষোভ বয়ে বেড়াচ্ছিলাম। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমার নেতিবাচক ধারণাগুলো ইতিবাচকতার দিকে ধাবিত হয়েছে। এ কোর্সের শিক্ষা আমার জীবনের পাথেয় হয়ে রইল।

নিত্য গোপাল বিশ্বাস

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ পরিদর্শক। ৪৪৮ ব্যাচ



কোর্সে এসে আমার প্রাপ্তি অনেক বেশি। গুরুজীর ইতিবাচক কথাগুলো আমার কর্মজীবনে অনেক বেশি কাজে লাগবে। আমি আরো ভালো একজন মানুষ হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

নাদিরা কিরণ

চিফ রিপোর্টার, এটিএন বাংলা। ৪৩৩ ব্যাচ



প্রায় ১৫ বছর ধরে আমার কোমরে ব্যথা ছিল। ব্যথার কারণে একটানা ১৫ দিন বিছানায় শুয়ে থাকত হতো। মেডিটেশন করে ব্যথা থেকে নিরাময় লাভ করেছি। মেডিটেশন আমার জীবন বদলে দিয়েছে।

মো. রফিকুল ইসলাম

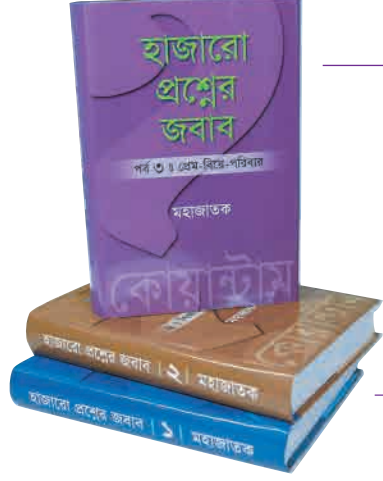
ব্যবসায়ী। ৪৩৩ ব্যাচ



১৪ বছর ধরে আমার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। সবসময় পা ফুলে থাকত। দেশে-বিদেশে অনেক চিকিৎসা করিয়েও কোনো লাভ হয় নি। কোর্সে মেডিটেশন করে আমার ব্যথাটা আর নেই।

রীনা রানী রায়

প্রাক্তন শিক্ষিকা, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। ৪৪৮ ব্যাচ



কোয়ান্টাম মেথড ৯ আপনার যত প্রশ্ন

জীবনের বিচিত্র সমস্যা, বিবিধ প্রশ্ন এবং এর উত্তর নিয়ে এক অনবদ্য সংকলন *হাজারো প্রশ্নের জবাব ৯ পর্ব ১, ২ ও ৩*। এ বই তিনটি পড়ে আপনি লাভ করবেন জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিধা সংশয় অবিদ্যা ভেসে যাবে বাস্তবতা ও বিদ্যার আলোয়। লাখো মানুষের মতো আপনিও বদলাতে পারবেন আপনার জীবন।

সমস্যাযুক্ত যিনি শনাক্ত করতে পারেন, সাফল্যের পথে তিনি এগিয়ে যান অনেকখানি। তবে সমাধান বা প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজতে হবে সঠিক স্থানে। আর এ উদ্যোগ নিতে হবে নিজেকেই। তাই সংগ্রহে রাখুন এবং নিয়মিত পড়ুন হাজারো প্রশ্নের জবাব বইসহ কোয়ান্টামের অন্যান্য প্রকাশনা। মেডিটেশন চর্চায় এবং সঠিক জীবনদৃষ্টি অর্জনে এ প্রকাশনাগুলো আপনার জীবনে হয়ে উঠবে অন্যতম সহায়ক শক্তি।

প্রশ্ন : আমার কোনো সমস্যা বা রোগ নেই, আমি ভালোই আছি। আমি কেন মেডিটেশন করব?

উত্তর : শুধু সমস্যা থাকলেই মেডিটেশন করতে হয়—এটা তো মহা ভুল ধারণা। সফল মানুষেরাই বরং মেডিটেশনের চর্চা বেশি করেন। বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রনায়ক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, শিক্ষার্থী, প্রশাসক, এমনকি পেন্টাগনের জেনারেলরাও মেডিটেশন করছেন প্রশান্তির জন্যে, মস্তিষ্কে আরো বেশি ব্যবহার করার জন্যে।

আমরা সেই ১৯৯৩ সালে বলেছি, মেডিটেশন হচ্ছে বিজ্ঞান। আর ২০০৩ সালে টাইম ম্যাগাজিন প্রচ্ছদ নিবন্ধ করল The Science of meditation. এতে বলা হয়েছে, এক কোটি আমেরিকান এখন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করেন। নব্বই দশকের তুলনায় এ সংখ্যা দ্বিগুণ। মেডিটেশনের এই বিস্তৃতির কারণ হলো, এর প্রক্রিয়া এখন অনেক সহজ ও ফলপ্রসূ।

এ দলে নাম লিখিয়েছেন বিখ্যাতরাও—ফোর্ড মটরসের প্রধান ধনকুবের বিল ফোর্ড, সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর দম্পতি, সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এবং হলিউডের নামী-দামী তারকা। তাদের অর্থ, খ্যাতি, ক্ষমতা কিছুই অভাব নেই। তারপরও কেন মেডিটেশন করেন? প্রশান্তির জন্যে। ব্রেনটাকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্যে। সফলতাকে ধরে রাখার জন্যে।

পিছিয়ে নেই আমাদের দেশও। গত ২৬ বছরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছেন আমাদের দেশের বরং চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, ধর্মবেত্তা, কবি, লেখক, শিল্পীসহ সফল ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও বিভিন্ন অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা।

প্রশ্ন : মেডিটেশন আসলে কী?

উত্তর : তিনটি দিক থেকে আমরা মেডিটেশনকে ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রথমত, সচেতনভাবে পেশি এবং স্নায়ুর শিথিলায়ন।

দ্বিতীয়ত, অস্থির মনকে স্থির করা এবং মনোযোগকে সুচারু করা। সাধারণত আমাদের মন অতীত নিয়ে অনুশোচনা করে অথবা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে। সে বর্তমানে স্থির থাকতে চায় না। মনকে বর্তমানে নিয়ে আসা অর্থাৎ অস্থির মনকে স্থির করা হচ্ছে মেডিটেশনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়ত, আত্মনিমগ্নতা। যখন একজন মানুষ আত্মনিমগ্ন হয়, নিজের আত্মার সাথে, অন্তরতম আমি-র সাথে, field of pure potentialities-এর সাথে সংযুক্ত হয় তখনই সে লাভ করে প্রজ্ঞাপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি। তার দৃষ্টি, তার অনুভবের দরজা খুলে যায়। সে নতুন সত্যকে অনুভব করতে পারে।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম বলে, মেডিটেশন মনকে প্রশান্ত করে। আমি কোরআন-হাদীসের আলোকে জানতে পারলাম একমাত্র নামাজই মনকে প্রশান্ত করতে পারে। এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : মনকে প্রশান্ত করার মতো নামাজ যাতে আপনি পড়তে পারেন এজন্যেই মেডিটেশন দরকার। শুধু ওঠা-বসা, রুকু-সেজদা দিলে নামাজ হয় না। নামাজের সংখ্যা তো কম নয়, কিন্তু যেভাবে আমরা নামাজ পড়ি তাতে যদি প্রশান্তি পাওয়া যেত, তাহলে সমাজে এত অশান্তি থাকত না।

রসুলুল্লাহ (স) নিজেও ধ্যান করেছেন। কিন্তু তিনি তা সবার জন্যে অবশ্য কর্তব্য করেন নি। এ প্রসঙ্গে একাধিক ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, নবীজী (স) যেভাবে ইবাদত করতেন, রোজা রাখতেন এবং ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন—অনুসারীদের ওপর তিনি সেই কঠোরতা চাপিয়ে দেন নি। তিনি তাঁর অনুগামীদের ব্যাপারে অনেক কোমল ছিলেন।

আপনি যখন একাধ্র মনোযোগে আল্লাহকে অনুভব করতে পারবেন, তখনই সেই নামাজ পড়তে পারবেন—যে নামাজ মানুষকে প্রশান্ত করতে পারে। তখন আপনিও বলতে পারবেন—নামাজই যথেষ্ট। কিন্তু ঐ স্তরে যেতে হলে চিন্তকে একাধ্র করতে হবে, সেজন্যে মেডিটেশন প্রয়োজন।

প্রশ্ন : মেডিটেশন কীভাবে সঠিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর : মেডিটেশন একজন মানুষের ভালো দিক এবং মন্দ দিক—দুটোই বুঝতে সাহায্য করে। ভালো দিককে বিকশিত করা এবং মন্দ দিককে পরিবর্তনের জন্যে যে ভেতরের তাগিদ থাকা দরকার, এটা একজন মানুষ লাভ করে আত্মনিমগ্ন অবস্থাতেই।

একজন মানুষ যদি নিয়মিত মেডিটেশন করে, তার ভেতরে পরিবর্তনের একটা অনুরণন সৃষ্টি হয়, যা তার ব্যক্তিত্বকে আগাগোড়া বদলে দিতে পারে। অন্তরের যত দ্বিধাদ্বন্দ্ব জড়তা সংকোচ ভয়ভীতি—এগুলো খুব সহজে সমূলে উপড়ে ফেলা যায় মেডিটেশনের মাধ্যমে।

প্রশ্ন : ছাত্রদের কেন নিয়মিত মেডিটেশন করা উচিত?

উত্তর : প্রশান্ত প্রত্যয় সৃষ্টির পাশাপাশি মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে নিয়মিত মেডিটেশন অত্যন্ত কার্যকরী। গবেষকদের গবেষণা দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, মেডিটেশনের সময় ব্রেনে আলফা ওয়েভ বিরাজ করে যা মনোযোগ বৃদ্ধির জন্যে সহায়ক।

১৯৭০ সালে বিজ্ঞানী ডেভিড ওরমে জনসন এবং তার সহযোগীরা আবিষ্কার করেন, ব্রেনের বলয়গুলোর ভারসাম্যের সাথে সৃজনশীলতার সম্পর্ক আছে। আর ওরমে জনসন, ডিলবেক, ওয়ালেস,

ট্রাভিস এবং অন্যান্য সবার গবেষণাতেই আলাদা আলাদাভাবে এটা দেখা যায় যে, মেডিটেশন এই ভারসাম্যকেই বাড়ায়।

২০০৭ সালে চীনের ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এক গবেষণা করেন ড. জাং এবং তার সহযোগীরা। গবেষণায় দেখা যায়, মেডিটেশন চর্চা করে সবারই মনোযোগ বেড়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের দৃষ্টিশক্তি বিষণ্ণতা রাগ অবসাদ কমেছে এবং মানসিক উদ্দীপনা বেড়েছে। দেহে কটিসল নামে স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ কমেছে। বেড়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

জীবন গঠন ও সাজানোর ক্ষেত্রে অন্য যে-কোনো বয়সী মানুষের চেয়ে একজন কিশোর বা একজন তরুণের সম্ভাবনা ও সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি। নিয়মিত মেডিটেশন তার এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেবে।

প্রশ্ন : বদভ্যাস বা আসক্তি দূর করতে কি মেডিটেশন কাজ করে?

উত্তর : গত ২৬ বছরে কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করে শত শত মানুষ ধূমপান, মাদকের মতো নেশা থেকে যেমন মুক্ত হয়েছেন তেমনই ফেসবুক-ইন্টারনেট-ইউটিউবের মতো ভারুয়াল ভাইরাস আসক্তি, সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, দুধ-চায়ের মতো ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাসকেও 'না' বলতে পেরেছেন অবলীলায়।

৭০-এর দশক থেকে এ-পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে সকল গবেষণাতেই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রচলিত যে-কোনো চিকিৎসার চেয়ে মাদকাসক্তি নিরাময়ে মেডিটেশনই সবচেয়ে বেশি কার্যকর। ক্যালিফোর্নিয়া স্কুল অব প্রফেশনাল সাইকোলজির গবেষক ক্যারোল বলেন, মেডিটেশন একজন মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যপূর্ণতা সৃষ্টি করে, যা আসক্তি থেকে মুক্তিতে তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : আমি কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। চরম হতাশায় ভুগছি। আমার পক্ষে কি সফল হওয়া সম্ভব?

উত্তর : অবশ্যই সম্ভব। বরং ব্যর্থ হয়েছেন বলেই আপনার সফল হওয়াটা এখন সহজ। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ সফল মানুষের গুরুত্বা ব্যর্থতা দিয়েই।

আসলে সাফল্যের জন্যে প্রথম প্রয়োজন মন ও মস্তিষ্কের শক্তির ওপরে বিশ্বাস স্থাপন। বিজ্ঞানীরা বলেন, 'আমি পারব' এই দৃঢ় বিশ্বাসই সকল সাফল্যের ভিত্তি। আপনি যেদিন বিশ্বাস করতে পারবেন যে, আমিও পারি, সেদিন আপনার প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত চাওয়া পাওয়ায় রূপান্তরিত হবে।

তবে আপনার মন প্রশান্ত হলে অন্তর্গত সত্তা আপনার মধ্যে বিশ্বাস সঞ্চারিত করবে। তাই মনকে প্রশান্ত করতে নিয়মিত মেডিটেশন করুন এবং সংস্কে একাত্ম থাকুন।

ধর্মের শাস্বত শিক্ষা ॥ ধ্যানী হোন, জ্ঞানী হোন

ইসলাম ধর্ম

...ধ্যানী বা চিন্তাশীলদের জন্যে আমার বাণী সুস্পষ্টভাবেই বয়ান করি (যাতে তারা গভীরভাবে ভাবতে পারে)!

সূরা ইউনুস : ২৪

(হে নবী! ওদের) বলো, আমি তোমাদের একটিমাত্র পরামর্শ দিচ্ছি, এককভাবে বা যৌথভাবে আল্লাহর সামনে সচেতন হয়ে দাঁড়াও। নিজের গভীরে ধ্যানে নিমগ্ন হও।...

সূরা সাবা : ৪৬

হিন্দু ধর্ম

অনন্ত প্রশান্তির জন্যে আমরা মহাপ্রভুর মহিমার ধ্যান করি।

অথর্ববেদ : ১৯.৯.৪

যোগ-ধ্যানের মাধ্যমেই আমরা অর্জন করি জ্ঞান, সৌন্দর্য ও ক্ষমতা।

যজুর্বেদ : ১১.২

মন দুর্দমনীয় অস্থির চঞ্চল। কিন্তু নিয়মিত ধ্যান, ইন্দ্রিয় সংযম, ভোগস্পৃহা দমনের মাধ্যমে মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

ধ্যানযোগ : ৩৫

বৌদ্ধ ধর্ম

উচ্ছৃঙ্খল ও মূর্খ ব্যক্তির শত বছরের জীবনের চেয়ে প্রাজ্ঞ ও ধ্যানীর একদিনের জীবন উত্তম।

সহস্রবগ্গো : ১১১

প্রজ্ঞা ছাড়া ধ্যান নাই। ধ্যান ছাড়া প্রজ্ঞা সৃষ্টি হয় না। যার ধ্যান ও প্রজ্ঞার সমন্বয় হয়েছে তিনিই নির্বাণ স্তরে পৌঁছেছেন।

ভিক্ষুবগ্গো : ৩৭২

খ্রিষ্ট ধর্ম

যিশুর শক্তির উৎস ছিল তাঁর ধ্যান, তাঁর প্রার্থনা। সন্ধ্যাবেলা খানিকটা নির্জনে গিয়ে তিনি প্রার্থনায় নিমগ্ন হতেন, ভুলে যেতেন সমস্ত ক্ষুধা-ক্লান্তি-অবসাদ। অন্যদেরও বলতেন, অনেক কাজ করেছে, এখন ধ্যান করো। নিজেকে পর্যালোচনা করো, ভুলগুলো খুঁজে বের করো, মনের পর্দায় নিজেকে দাঁড় করাও, জীবন পরিবর্তন করো।

আর্চবিশপ পৌলিনাস কস্তা

বিজ্ঞান ও মেডিটেশন

একবিংশ শতাব্দীতে এসে মেডিটেশন বা ধ্যান এখন আর শুধুই ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক সাধনার অনুষঙ্গ নয়, বরং পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনচায়ে। টেনশনমুক্ত সুস্থ ও সফল জীবনের জন্যে বিশ্বজুড়ে কোটি মানুষ এখন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করছেন।

মেডিটেশন একটি বিজ্ঞান-২৬ বছর আগে মূলত এ বিশ্বাসের শক্তিতেই যাত্রা শুরু করেছিল কোয়ান্টাম মেথড। তারপর টাইম, নিউজউইক, নিউসায়েন্টিস্ট, সায়েন্টফিক আমেরিকান, রিডার্স ডাইজেস্ট-সহ মূলধারার বিশ্বখ্যাত সাময়িকীগুলো নিয়মিত প্রকাশ করেছে মেডিটেশনের মনোদৈহিক উপকারিতা নিয়ে বিশেষ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রচ্ছদ ও গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধের ছবি এখানে দেয়া হলো।



মেডিটেশন ॥ ইতিবাচক পরিবর্তনের নেপথ্যশক্তি

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের শত শত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, সুখী হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় মেডিটেশন চর্চা। সিকি শতাব্দী ধরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন মেডিটেশন চর্চা করছেন। তারা পেয়েছেন আত্মশক্তির সন্ধান। ফলে তাদের জীবনে নিরাময়, প্রশান্তি আর সাফল্য এসেছে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়। দেশজুড়ে এই ইতিবাচক পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রে।



২৩ নভেম্বর ২০১৭। পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে যোগ-মেডিটেশন চর্চা করছেন ১,১০৬ জন নবনিযুক্ত নারী পুলিশ কনস্টেবল। ২০১৭ সাল থেকে কোয়ান্টাম ইয়োগা যুক্ত হয়েছে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ সূচিতে। এ পর্যন্ত কোয়ান্টাম ইয়োগা প্রশিক্ষণের তিনটি ব্যাচে অংশ নিয়েছেন মোট ৩,৪৪৮ জন নবনিযুক্ত কনস্টেবল। উল্লেখ্য, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে কোয়ান্টাম ইয়োগাকে।



ড. লরি স্যাণ্ডোস। তার 'সাইকোলজি এন্ড গুড লাইফ' যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৭ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় কোর্স। এবছর এ কোর্সে অংশ নিয়েছে ১,২০০ জন শিক্ষার্থী। এর মূল বক্তব্য : সুখী হওয়ার সহজ উপায় মেডিটেশন চর্চা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পরিহার করে পরিবার ও আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে অভ্যস্ত হওয়া।



খাইল্যান্ডে সম্প্রতি গুহায় আটকে পড়া ১২ জন কিশোর ফুটবলার ও তাদের কোচ ১৮ দিন পর উদ্ধার পান। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে, পানিবন্দি অন্ধকার গুহায় খাদ্য ও পানি সংকটের প্রতিকূল সময়ে কোচ একাপল মেডিটেশনের মাধ্যমে উজ্জীবিত রেখেছিলেন এ কিশোরদের।



২০১৬ সাল থেকে বরিশালের সৈয়দ বজলুল হক কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মেডিটেশন দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু করছে। মেডিটেশন চর্চার ফলে গ্রামের এই শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠছে আত্মপ্রত্যয়ী ও পড়ালেখায় মনোযোগী। ২০১৮-তে এইচএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শহরের নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পেছনে ফেলে তারা অর্জন করেছে দ্বিতীয় স্থান।



বান্দরবান লামায় বহিষ্ঠ শিশুদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ২০০১-এ যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার ফলে এই শিশুরা লেখাপড়ায় কৃতিত্বের সাক্ষর রাখছে। বাংলাদেশের খ্যাতনামা স্কুলগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ক্রীড়ায় দেশসেরা স্কুল নির্বাচিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : কোয়ান্টাম মেথড ৪৫০, সেপ্টেম্বর ২০১৮ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥

Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd



কোয়ান্টাম বুলেটিন

অক্টোবর ২০১৮

কৃতজ্ঞতা! সম্মানিত স্বেচ্ছা রক্তদাতা!

আপনার নিঃস্বার্থ দান বাঁচিয়েছে লক্ষ প্রাণ

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! ১০ লক্ষ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহের মাইলফলক অতিক্রম করল কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম (আগস্ট ২০১৮)। দেড় যুগের সম্ভব প্রচেষ্টায় বাঁচল কয়েক লক্ষ অমূল্য প্রাণ। পরম করুণাময়ের কাছে গভীর শুকরিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমরা এ আনন্দক্ষেণে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে তালিকাভুক্ত তিন লক্ষাধিক স্বেচ্ছা রক্তদাতার প্রতি-যাদের নিঃস্বার্থ দানের ফলেই সম্ভব হয়েছে এ অভূতপূর্ব অর্জন।

বাংলাদেশে নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রথম উদ্যোগটি গ্রহণ করে ২০০০ সালে। তার আগে দেশে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের চিত্রটি ছিল বেশ হতাশাজনক। রক্ত চাহিদার শতকরা ৪৭ ভাগই তখন আসত পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকে, যারা অর্থের বিনিময়ে রোগীর স্বজনদের কাছে রক্ত বিক্রি করত এবং তাদের প্রায় সবাই হয় মাদকাসক্ত কিংবা নানা জটিল রোগে আক্রান্ত। ফলে এদের কাছ থেকে জরুরি প্রয়োজনে রক্ত মিলত ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্তগ্রহীতারা পড়তেন আরো ঝুঁকির মুখে। বাড়ি ফিরতেন দুরারোগ্য রোগের জীবাণু শরীরে নিয়ে!

পরিস্থিতি পাল্টে যেতে শুরু করল ২০০০ সাল থেকে। কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত দানে ও প্রয়াসে স্থাপিত হলো কোয়ান্টাম ল্যাব। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি আর মান নিয়ন্ত্রণে আপসহীনতার ফলে অল্পদিনেই কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম পরিণত হলো পরম আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক। মুমূর্ষের পরিবার ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বিবেচনায় কোয়ান্টাম ল্যাব সরবরাহকৃত রক্তই হয়ে উঠল সবার প্রথম পছন্দ।



১০ লক্ষ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ

এর পাশাপাশি দেশের মানুষ বিশেষত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও তরুণ জনগোষ্ঠীকে নিয়মিত রক্তদানে সচেতন করে তুলতে কোয়ান্টাম গ্রহণ করে বিভিন্ন সমন্বিতপযোগী উদ্যোগ। এর মধ্যে অজুয়ে ১৯ কার্যক্রমটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যার মূল আহ্বান-
হে তরুণ! আপনার ১৯ তম জন্মদিন স্মরণীয় হোক প্রথম রক্তদানে, বাঁচুক ৪টি প্রাণ।

সেবামুখিতা ও কল্যাণকামিতা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। তারই প্রমাণস্বরূপ কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা তো বটেই, এ আহ্বানে ক্রমশ সাড়া দিতে শুরু করেন শিক্ষার্থীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। ১৮ বছরের পথপরিক্রমায় কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে তালিকাভুক্ত রক্তদাতার সংখ্যা বর্তমানে প্রায় তিন লক্ষ ৩৫ হাজার, যার মধ্যে অর্ধ লক্ষই আজীবন রক্তদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। সম্মানিত এ রক্তদাতাদের নিঃস্বার্থ দানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও গণীজনদের উপস্থিতিতে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাদের

জানানো হয়েছে বিশেষ সম্মাননা। স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রাণ এ রক্তদাতাদের পাশাপাশি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দও নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টায়।

এ সচেতনতা ক্রমেই ছড়িয়ে গেছে দেশব্যাপী। ফলে দেড় যুগ আগে প্রয়োজনীয় রক্তের ৪৭ শতাংশই যেখানে আসত পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে, ২০১৭ সালে তা এসে নেমেছে ১২ শতাংশে।

এ প্রসঙ্গে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী বলেন, বাংলাদেশে নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ, সরবরাহ ও পরিসঞ্চালনে যে অসামান্য অগ্রগতির সূচনা হয়েছে তার অগ্রনায়ক স্বেচ্ছা রক্তদাতাবৃন্দ। আমরা বিশ্বাস করি, তাদের কাজের সর্বোত্তম প্রতিদান দিতে পারেন একমাত্র পরম করুণাময় স্রষ্টা। তাই রক্তদাতাদের শারীরিক-মানসিক প্রশান্তি ও সার্বিক কল্যাণের জন্যে আমরা তাঁর কাছেই আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি।

বরকতান! বরকতান!!
কোয়ান্টাম মেথড ৪৫০

আসুক নিরাময় ও
সাফল্যের জোয়ার

বরকতান! বরকতান!! কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৪৫০। ২১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল থেকেই ঢাকার আইডিইবি প্রশাশন মুখরিত হয়ে ওঠে ঢাকাসহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা এ কোর্সের নানা বয়সী অংশগ্রহণকারী, রিজুভিনেশনে নিবন্ধিত থ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, আডভেন্টায়ার, কোয়ান্টায়ারসহ কোয়ান্টাম পরিবারের সকল পর্যায়ের সদস্যবৃন্দের আনন্দমুখর পদচারণায়। এর মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মেথডের সিকি শতাব্দীর সাফল্যযাত্রায় যুক্ত হলো আরো একটি মাইলফলক।

আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে উদ্ভাবক কর্তৃক এককভাবে ক্লাস নিয়ে ৪৫০টি কোর্স পরিচালনা করার এ বিরল সৌভাগ্যের জন্যে আমরা পরম করুণাময়ের কাছে জানাই আমাদের গভীর শুকরিয়া। শুধু তাঁর করুণার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

বরকতময় এ ক্ষণে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা ও দোয়া জানিয়েছেন এ কোর্সের সম্মানিত প্রশিক্ষার্থী, রিজুভিনেশনে অংশগ্রহণকারী এবং ফাউন্ডেশনের সকল সদস্য ও নানা পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের।

তিনি বলেন, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৫০ তম ব্যাচ সফলভাবে আয়োজনের জন্যে যিনি যেভাবে শ্রম ও সময় দিয়েছেন-মহান আল্লাহ সবার কাজ কবুল করুন এবং সৎকর্মের এই ধারায় সবার জীবনে আসুক নিরাময় ও সাফল্যের জোয়ার।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৫১ ব্যাচ ৯ ঢাকা

১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড দলের কোচ ড. মাহবুব আলম মজুমদার। তার গত এক দশকের নিরলস প্রচেষ্টায় এবছর আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদক অর্জন করে বাংলাদেশ। ড. মাহবুব যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় এমআইটি থেকে স্নাতক, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর, যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ও লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে পোস্ট ডক্টরাল সম্পন্ন করেন। হাই স্কুল পর্যায়ের তিনি দুবার যুক্তরাষ্ট্রের সেরা শিক্ষার্থী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে গ্রহণ করেন বিশেষ সম্মাননা পদক। নিভৃতচারী এ গণিতবিদ বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন এবং এমআইটি-র আঞ্চলিক উপদেষ্টার গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। গত ৬ আগস্ট কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনায় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদের সভাপতিত্বে তিনি মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন। তার আলোচনার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।



শিক্ষা ও পরিশ্রম দ্বারা সম্ভব যে-কোনো প্রত্যাশা পূরণ

অধ্যাপক ড. মাহবুব মজুমদার

বাংলাদেশে প্রথম ম্যাথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ২০০৫-এ। তখন মনে করা হতো—এদেশের ছেলেমেয়েরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একটি গাণিতিক সমস্যাও সমাধান করতে পারবে না। যদিও ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদের সবসময়ই আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ জেতার স্বপ্নও তারা দেখেছেন সেই শুরু থেকেই।

সময় বদলেছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ অনেক আত্মবিশ্বাসী। পূর্ববর্তী দলের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে নতুন দল এখন ক্যাম্পে আসে। অথচ আগে গুনের মধ্যে এক ধরনের ভয় ছিল—আমরা কি পারব? সেই ওরাই এখন দৃঢ়স্বরে বলে—আমরাই পারব।

কিশোর-তরুণদের উৎসাহ আমাকে আশাব্যবহিত করে

আমি বেড়ে উঠেছি যুক্তরাষ্ট্রে। সেই শৈশবেই বাবা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—এমআইটি একটা সুন্দর জায়গা, তুমি এখানেই পড়বে। এছাড়াও তার অনুপ্রেরণায় আমি গণিতের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম। এভাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নিতেই একসময় গণিতের প্রকৃত আনন্দটা পেলাম। আমার জীবনের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে গণিত, যার কল্যাণেই এমআইটি-র মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আমার জন্যে সহজ হয়েছিল।

২০০৫ সালে আমি এই ভেবে বাংলাদেশে এসেছিলাম যে, এখানে আমি নিভুতে বসে নিজের গবেষণার কাজগুলো করতে পারব। মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার আমাকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। সেই সূত্রেই আমার বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের সাথে যুক্ত হওয়া। যিনি শিক্ষকতা করতে ভালবাসেন, তিনি সবসময় এমন মানুষদের সাথে থাকতে পছন্দ করেন, যারা নতুন কিছু জানতে ও শিখতে আগ্রহী। বাংলাদেশে গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়া কিশোর-তরুণদের উৎসাহ-উদ্দীপনাই আমাকে এ কাজে আরো বেশি আকৃষ্ট ও আশাব্যবহিত করেছে।

প্রয়োজন সঠিক পথ-নির্দেশনা, পরিচর্যা ও সুস্থ পরিবেশ

উন্নত দেশের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্যে রয়েছে নানা সুযোগ-সুবিধা আর আধুনিক অবকাঠামো। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শুধু মেধা ও চেষ্টার জোরেই ভালো করছে। গাছ তো প্রাকৃতিকভাবেই বেড়ে ওঠে, কিন্তু পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রয়োজন একটু পানি ও সার দেয়া। তেমনি আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই সঠিক পথ-নির্দেশনা, যথাযথ পরিচর্যা ও সুস্থ পরিবেশ। আর এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদেরই।

শুরুর দিকে গণিত অলিম্পিয়াডকে কেন্দ্র করে আমার প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় কাটত। আমি ম্যাথ ক্যাম্পে শিক্ষার্থীদের সাথে থাকতাম, প্রচুর ক্লাস নিতে হতো, অনেক সময় আমার বাসাতেও আসত শিক্ষার্থীরা।

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়া পুরনো শিক্ষার্থীরাও এখন ক্লাস নিচ্ছে নতুনদের। আমাদের গণিত অলিম্পিয়াডে কোনো সিনিয়র-জুনিয়র বিভেদ নেই। সিনিয়ররা যেমন জুনিয়র দলকে শেখাচ্ছে তেমনি জুনিয়রদের কাছ থেকেও কখনো কখনো শিখছে সিনিয়ররা। আমি মনে করি, ভেদাভেদ সব ক্ষেত্রেই শেখার পরিবেশকে নষ্ট করে। আমাদের ম্যাথ ক্যাম্পে শেখার মানসিকতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে প্রতিযোগিতা এগিয়ে যাচ্ছে।

তরুণদের বিশ্বাসই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের স্বর্ণপদক জয় আমাদের জন্যে জাতিগতভাবে একটি আনন্দের বিষয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে—শুধু কি এই আনন্দটুকুই? এছাড়া জাতির কি কোনো লাভ নেই এতে? ধরুন, ব্রাজিল গণিত অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জিতে গেল। এতে কি তাদের জিডিপি বেড়েছে? তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে?

সত্যিই সেটা ঘটেছে। দেশটি এগিয়ে গেছে। কারণ এ ধরনের স্বীকৃতিগুলো জাতিকে আরো উদ্যমী করে তোলে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যখন এই কিশোরদের সাফল্য দেখে, তখন তাদের মনেও বিশ্বাস জাগে—আমরাও পারব। তরুণদের এ বিশ্বাসই সমাজের সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনে।

সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের

সেইসাথে প্রয়োজন শিক্ষকদের আন্তরিকতা

এ যুগে মা-বাবা কী বলছে তার চেয়েও শিশু-কিশোরদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার বন্ধুরা কী বলছে। আপনার সন্তানের বন্ধু কে—এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গণিত ভয় পায় বা শেখার আগ্রহ নেই, এমন বন্ধুর সাথে মিশলে আপনার সন্তানও তেমনটাই হবে। আবার আপনার ছেলেমেয়ে যদি এমন কারো সাথে বন্ধুত্ব করে, যে গণিত ভালবাসে তাহলে আপনার সন্তানেরও গণিতের ভয় দূর হবে। তাই আপনি তাকে স্কুলের গণিত ক্লাব বা এরকম ভালো কিছু কাজে উদ্বুদ্ধ করুন।

ভালো ছেলেমেয়েদের সাথে মিশলে আপনার সন্তান স্বাভাবিকভাবেই ভালো থাকবে। আবার তার বন্ধু যদি ভিডিও গেম খেলে, তাহলে সে-ও সেদিকেই যাবে। ভিডিও গেম কিন্তু ভীষণ আসক্তিকর। তাই অভিভাবকদের বলতে চাই, সন্তানের বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কে সচেতন হোন।

শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তোলার জন্যে ভালো ক্লাসরুম-কম্পিউটারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষকের আন্তরিকতা। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। যদি তারা শিক্ষকদের আন্তরিক হওয়ার ওপর জোর দেন, তবে একজন সাধারণ শিক্ষকও ভালো মানের শিক্ষকে রূপান্তরিত হবেন। আর একজন ভালো শিক্ষক হয়ে উঠবেন অসাধারণ।

চাই সুস্পষ্ট লক্ষ্য আর বড় প্রত্যাশা

গণিত অলিম্পিয়াডের উদ্দেশ্য শুধু স্বর্ণপদক জেতা নয়; বরং মানুষকে গণিত ও প্রযুক্তিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলা। দেশের ১০ জন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিকভাবে ভালো ফলাফল করার অর্থ হচ্ছে এদেশে এমন আরো হাজার মানুষ আছে, যারা ভালো করার সামর্থ্য রাখে। গণিত অলিম্পিয়াডের লক্ষ্য হচ্ছে এমন কিছু মানুষ গড়া, যারা আগামী ২০ বছরে দেশের সমৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।

১৬ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। আমরা এদের মধ্য থেকে ছয় জনের একটি দল কেন গঠন করতে পারব না—যারা আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে প্রথম হতে পারে? একজন মানুষ বা একটি জাতি তখনই পারে, যখন তাদের সামনে থাকে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও প্রত্যাশা। আর শিক্ষা ও পরিশ্রম দ্বারা যে-কোনো মানুষের পক্ষে যে-কোনো প্রত্যাশাই পূরণ করা সম্ভব।

অনুলিখিত

বিশ্বজুড়ে প্রশান্তির সন্ধানে মানুষ

ভোগবাদী পণ্য আধাসন আর নিত্যনতুন প্রযুক্তি-আসক্তিতে ব্যক্তি 'আমি'র খোঁজ নিতেই ভুলে যায় আধুনিক মানুষ। ফলে একসময় অনুশোচনাই হয়ে ওঠে জীবনের পরিণতি। যে-কোনো অর্জনের মতো জীবনকে গুছিয়ে নেয়ার জন্যেও প্রয়োজন সচেতন প্রয়াস। সেই উপলব্ধি থেকেই বিশ্বব্যাপী আত্ম উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলো এখন জনপ্রিয়।

আধুনিক পৃথিবীতে অর্থবিশ্বই যেন সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড। নৈতিক শিক্ষার অভাব শিশুদের মাঝে সৃষ্টি করছে এক ধরনের শূন্যতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ভারতে ১৩-১৫ বছর বয়সীদের প্রতি চার জনে একজন শিশু বিষণ্ণতায় ভুগছে। এ সমস্যা মোকাবেলায় এবছর জুলাই থেকে ভারতের দিল্লিতে এক হাজারের বেশি স্কুলে চালু করা হয়েছে হ্যাপিনেস কারিকুলাম। প্রায় আট লক্ষ শিক্ষার্থীকে শেখানো হচ্ছে মেডিটেশন, নৈতিক শিক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের অনুশীলন। প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ২১ হাজার শিক্ষককে।
(ছবি : দিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের একাংশ)



খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্যে মেডিটেশন কোর্স

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম (বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং)	কোর্সের নাম	কোর্স ফি (টাকা)	সময়	কোর্সের বিষয়বস্তু
এমআইটি (১)	ডিজাইনিং ইয়োর লাইফ		২ ঘণ্টা	সুখী জীবনের রহস্য ও প্রতিকূলতার মুখে করণীয়।
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (২)	ডিজাইনিং ইয়োর লাইফ	২,১৪,২০০/-	২ ঘণ্টা/ সপ্তাহ	ক্যারিয়ার ও জীবন সাজানোর কৌশল।
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (৩)	দ্য সায়েন্স এন্ড অ্যাপ্লিকেশন অব পজিটিভ সাইকোলজি	স্নাতক : ১,৩১,৭৫০/- স্নাতকোত্তর : ২,২৯,৫০০/-	৩২ ঘণ্টা	সুখী হওয়ার বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও করণীয়।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (৬)	দ্য সাইকোলজি অব হ্যাপিনেস		২০ ঘণ্টা	সুখী হওয়ার সূত্র ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের প্রক্রিয়া।
ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় (১০)	সাইকোলজি এন্ড দ্য গুড লাইফ			বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৭ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় কোর্স। এবছরই অংশ নিয়েছে ১,২০০ জন।
ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া (১৩)	অ্যাপ্লাইড পজিটিভ সাইকোলজি	৫৬,০৯,২৩৫/-	একবছর	আলোচনার পাশাপাশি দমচর্চা ও মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার প্রক্রিয়া।
ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়ায় ১ম)	অ্যাপ্লাইড পজিটিভ সাইকোলজি	৩২,০৪,৭২৭/-	একবছর	ইতিবাচকতার সূত্রগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিজীবনে সাফল্যের প্রক্রিয়া।
নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিন (যুক্তরাষ্ট্রে ৩য়)	সায়েন্স অব হ্যাপিনেস			শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল করে তোলার চিন্তা থেকে সাজানো হয়েছে এ কোর্সটি।

বিশ্বব্যাপী আত্ম উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামগুলো মূলত পাঁচ ধরনের

- ১ ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
- ২ নিরাময় ও সুস্বাস্থ্য
- ৩ আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়ন
- ৪ কাউন্সেলিং ও পরামর্শ সেবা
- ৫ বই অডিও ভিডিও

আত্ম উন্নয়নমূলক কোর্সগুলোর বেশিরভাগই জীবনের কোনো একটি দিককে কেন্দ্র করে সাজানো-কোনোটি নিরাময়কেন্দ্রিক, কোনোটি হয়তো ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। যেমন, ওষুধ ও অস্ত্রোপচার ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় পদ্ধতির প্রবর্তক চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. ডীন অরনিশের কোর্সে মেডিটেশন, যোগাসন ও জীবনাচার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরাময় লাভ করে হৃদরোগীরা। এতে অংশগ্রহণকারীদের গুণতে হয় সাত হাজার ডলার বা প্রায় ছয় লক্ষ টাকা।

কিন্তু সবকিছু মিলিয়েই জীবন। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনোযোগের দাবিদার। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের অনন্যতা এখানেই। চার দিনের এ কোর্সে ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, মনোদৈহিক সুস্থতা, পরিবারে সুখ, নৈতিক ও আত্মিক জাগরণ-জীবনের সকল প্রয়োজনকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। রয়েছে কাউন্সেলিং বা পরামর্শ সেবা। নিয়মিত চর্চার সুবিধার্থে রয়েছে নানা প্রকাশনা ও মেডিটেশনের অডিও এবং দেশজুড়ে সেন্টার-শাখা-সেলগুলোতে প্রতি শুক্রবার সাদাকায়নসহ বছরব্যাপী একাধিক কার্যক্রম। সবকিছুর সমন্বয়ে কোয়ান্টাম মেথড এমন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া, যা চর্চা করে যে-কেউ গড়তে পারেন সুখী জীবন।



কায়সার জাহিদ আহমেদ

(৮ নভেম্বর ১৯৮৩ - ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮)

প্রধান কোচ, কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ
খো খো ও হ্যান্ডবল দল
এবং

প্রধান কোচ, বাংলাদেশ জাতীয় খো খো দল ও
সহকারী কোচ, বাংলাদেশ জাতীয় হ্যান্ডবল দল

সেপ্টেম্বর ২০০৭। তরুণ ক্রীড়া প্রশিক্ষক কায়সার জাহিদ আহমেদ যাচ্ছেন বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে। কোয়ান্টামে তার সেই প্রথম ভ্রমণটা ছিল দারুণ অ্যাডভেঞ্চারে ঠাসা। টিমের সবাই আমিরাবাদ নেমে গেলেও বাসে ঘুমিয়ে থাকা জাহিদকে ডাকতে কারোরই মনে ছিল না!

সহযাত্রীদের হঠাৎ মনে হতেই ফোন করে তাকে জাগানো হলো। বাস ততক্ষণে ছুটছে কক্সবাজারের দিকে। অতঃপর চকরিয়ায় নেমে লামার পথে রওনা দিলেন জাহিদ।

পাহাড়ি প্রকৃতি ভীষণ মুগ্ধ করল তাকে। পথের প্রায় পুরোটাই মোবাইল ফোনে ভিডিও করতে করতে তিনি পৌঁছলেন কোয়ান্টামে। এখানেই যে পরবর্তী এক যুগ তার জীবনের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত ও সার্থক দিনগুলো কাটবে-সেদিন কে তা জানত!

আশৈশব তার মনছবি ছিল ক্রীড়াবিদ হওয়ার

শৈশব থেকেই জাহিদ ছিলেন খেলাধুলা অন্তঃপ্রাণ। পড়তেন ঢাকার মতিঝিল মডেল হাই স্কুলে। মায়ের ইচ্ছা সে আইডিয়াল স্কুলে পড়ুক। পর পর দুবার ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো সে। তৃতীয়বার মা বললেন, এবারও ফেল করলে খবর আছে তোমার। বালক জাহিদ বলল, মা, আমি এবারও লাভু পাব।

ছেলের কথা শুনে তো বাড়ির সবাই অবাক! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, জাহিদ প্রতিবারই পরীক্ষায় সাদা খাতা জমা দিয়ে এসেছে। কেন? আইডিয়ালে খেলার মাঠ নেই কিন্তু মতিঝিল মডেলে আছে। খেলাধুলায় এ আত্মহৃদে তখন থেকেই পরিবারের সদস্যরা জাহিদকে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

কৃতী খেলোয়াড় হওয়ায় স্কুলের শিক্ষকরাও তাকে পছন্দ করতেন। ১৫ বছর বয়সে বাটা স্কুল হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টে তিনি স্কুল টিমের অধিনায়কত্ব করে চ্যাম্পিয়ন হন। টুর্নামেন্টের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হন তিনি।

খেলাধুলায় তার এই অনুরাগ নিছক বয়সোচিত

কায়সার জাহিদ আহমেদ

তিনি চলে গেছেন বেঁচে আছে তার স্বপ্ন

আকর্ষণ ছিল না। খেলোয়াড় হওয়ার মনছবিই তাকে তড়িত করেছে আকৈশোর। প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে প্রশিক্ষণ নেন ক্রিকেট, হ্যান্ডবল ও খো খো-তে। পারদর্শিতার দরুন বরাবরই বয়সভিত্তিক দলগুলোর অধিনায়কত্ব দেয়া হয় তাকে।

অনুর্ধ্ব-১৯ জাতীয় ক্রিকেট দলেও খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন জাহিদ। টুর্নামেন্টের দুদিন আগে হাত ভেঙে যায় তার। ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে একসময় পুরো মনোযোগ দেন হ্যান্ডবল ও খো খো-তে। ট্রফি, মেডেলে ভরে উঠতে শুরু করে বাড়ি। দেশের প্রথম জাতীয় খো খো দলের অধিনায়ক হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খো খো টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন তিনি।

ঢাকার নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী হিসেবেও কায়সার জাহিদ অংশ নিয়েছেন নানা টুর্নামেন্টে, রেখেছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে পড়ার সময় তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় হ্যান্ডবল দলের অধিনায়ক। জাতীয় হ্যান্ডবল দলেরও একজন কৃতী খেলোয়াড় ছিলেন তিনি।

কোচ হিসেবে ছিলেন ‘মাস্টার স্ট্র্যাটেজিস্ট’

একজন সফল খেলোয়াড় পরবর্তীতে কোচ হিসেবেও সফল হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কায়সার জাহিদ সেই ব্যতিক্রমদেরই একজন। কোচ হিসেবে একজন খেলোয়াড়ের সেরাটা বের করে আনার দক্ষতা ছিল জাহিদের সহজাত। মাত্র ১৭ বছর বয়সে পালন করেন মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের হ্যান্ডবল ও খো খো কোচের দায়িত্ব।

পরবর্তীতে প্রফেশনাল কোচিংয়ের কলাকৌশল

আয়ত্ত করার জন্যে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তিনি অংশ নেন। বাংলাদেশ জাতীয় হ্যান্ডবল দলের সহকারী কোচ ও জাতীয় খো খো দলের কোচের গুরুভার তাকে দেয়া হয়।

এবছর হাঙ্গেরির ইউনিভার্সিটি অব ফিজিক্যাল এডুকেশনে তিন মাসব্যাপী কোচ প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ থেকে মনোনীত হন কায়সার জাহিদ। সেই কোর্সে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে কোচরা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের প্রতিটি ধাপে অনবদ্য পারফরম্যান্স করে তিনি কোচদের মধ্যে প্রথম হন। মৃদুভাষী ও বিনয়ী এই মানুষটি সহকর্মীদের কাউকেই তার এই সাফল্য-সংবাদ নিজে থেকে জানান নি। সবাই একথা জানতে পারে তার মৃত্যুর পর!

কোচ হিসেবে তাকে বলা যেতে পারে একজন ‘মাস্টার স্ট্র্যাটেজিস্ট’। তার পেশাদারি দক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মিশেলে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল হ্যান্ডবল ও খো খো দল রূপান্তরিত হয় জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী এক দলে।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের সাথে এক যুগের সাফল্যগাথা

কোয়ান্টামের সাথে জাহিদের সম্পৃক্ততা রক্তদানের মধ্য দিয়ে, ২০০২ সালে। ২০০৪ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল খো খো দল ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি খণ্ডকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পান। পরবর্তীতে কোয়ান্টামে আসার পর তার তত্ত্বাবধানে গঠিত এ স্কুলের খো খো দল ২০০৯ সালে প্রথমবারের মতো কোনো জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং টুর্নামেন্টে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে প্রথমবারেই চ্যাম্পিয়ন হয়!



২০১৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ১২ তম সাউথ এশিয়ান গেমসে রৌপ্যজয়ী বাংলাদেশ জাতীয় খো খো দলের নয় জন খেলোয়াড়ই ছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী। কোয়ান্টামের সাথে কোচ কায়সার জাহিদ আহমেদ (সর্বদানে)।

ফাউন্ডেশনের সাথে জাহিদের একাত্মতা আরো বাড়ে ২০১১ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার পর। মেডিটেশন হয়ে ওঠে তার দৈনন্দিন রুটিনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। একপর্যায়ে ফাউন্ডেশনে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনেকেই তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেও সিদ্ধান্তে অবিচল জাহিদ ২০১২ সালে পুরোপুরিভাবে কোয়ান্টামে যোগ দেন।

কোয়ান্টামের প্রতি তার ভালোলাগা ক্রমেই রূপ নিয়েছে গভীর ভালবাসায়। তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের আশ্রয় উত্থানে।

তার নির্বিড় প্রশিক্ষণে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী কোয়ান্টামের সাফল্যগাথা ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে। বহু অর্জনের কয়েকটি হলো : চ্যাম্পিয়ন-স্বাধীনতা কাপ খো খো টুর্নামেন্ট (২০১৪ ও ২০১৫), রানার আপ-বাংলাদেশ গেমস (২০১৩), রানার আপ-জাতীয় খো খো চ্যাম্পিয়নশিপ (২০১২), হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন-জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (২০১৩, ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭), চ্যাম্পিয়ন-১ম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ (২০১৪), চ্যাম্পিয়ন-তৃতীয় জাতীয় যুব হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ (২০১৭)।

তার কোচিংয়ে কোয়ান্টাম জাতীয় দলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ২০১৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত হয় সাউথ এশিয়ান গেমস। সেখানে রৌপ্য পদকজয়ী বাংলাদেশ জাতীয় খো খো দলের ১২ সদস্যের নয় জনই ছিল কোয়ান্টাম। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ।

কায়সার জাহিদের হাতে প্রশিক্ষিত কোয়ান্টামদের সাফল্য এবছর জুলাইতে হইচই ফেলে দেয় দেশের ক্রীড়ামহলে। জাতীয় হ্যান্ডবল প্রিমিয়ার লিগে প্রথমবার অংশ নিয়েই বিদেশি খেলোয়াড়সমৃদ্ধ স্বনামধন্য ক্লাবগুলোকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টামরা। বরাবরের মতোই কোচ জাহিদ কৃতজ্ঞচিত্তে সাফল্যকে বরণ করেন পাদপ্রদীপের আড়ালে থেকে।

এভাবেই গত এক যুগে জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে কোয়ান্টামদের সাফল্যের অন্যতম নেপথ্য কারিগর হয়ে উঠেছিলেন তিনি।



এবছর হ্যান্ডবল প্রিমিয়ার লিগে প্রথমবার অংশ নিয়েই শিরোপা জিতে বিস্ময় সৃষ্টি করে কোয়ান্টামরা। সাফল্যের নেপথ্য কারিগর কোচ কায়সার জাহিদকে ঘিরে উল্লসিত কোয়ান্টামরা।

স্বপ্ন বাস্তবায়নের এই নেপথ্য কারিগর ছিলেন একজন আপাদমস্তক স্পোর্টসম্যান

আপাদমস্তক একজন স্পোর্টসম্যান ছিলেন জাহিদ-বেশভূষায়, চিন্তাচেতনায়, স্বপ্নে। সহকর্মীদের সাথে দেখা হলেই স্মিত হাসিতে তার সম্ভাষণ ও কুশল বিনিময়ের পর আলাপচারিতা যা হতো, তার সবটাই ছিল কোয়ান্টামের খেলাধুলা-সংক্রান্ত।

সময়ের এই নীরব কর্মী প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বড় অর্জনের লক্ষ্যে। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন- অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই। প্রায়ই বিশ্বখ্যাত হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের গল্প শুনিye কোয়ান্টামের হৃদয়ে সেই বিশ্বাস সঞ্চারিত করতেন।

দেশের দূরপ্রান্তের এই শিশুরাও যে ক্রীড়ায় একদিন বিশ্বজয় করার সামর্থ্য রাখে তা নিয়ে তার ছিল না বিন্দুমাত্র সংশয়। এই লক্ষ্য অর্জনই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। স্বপ্ন দেখতেন-কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে তৈরি হবে সব ধরনের খেলার স্পোর্টস ম্যানুয়াল, আর তা অনুসরণ করে প্র্যাকটিস করবে সারা দেশের খেলোয়াড়রা।

আমরা তার অবদান গভীর মমতা ও ভালবাসায় স্মরণ করি

কোয়ান্টাম অন্তঃপ্রাণ জাহিদ জীবনের শেষ প্রহরেও নিশ্চিত বিপদের মুখে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন তার প্রিয় শিষ্যদের। আর শিষ্যরা মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে পরবর্তী বৃহস্পতিবার



বান্দরবানে প্রতিপক্ষকে ১৩-১ গোলে পরাজিত করে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

আমরা বিশ্বাস করি, যেদিন অলিম্পিকের মধ্যে কোয়ান্টামের স্বর্ণপদক গলায় দাঁড়াবে আর চারদিক ছাপিয়ে বেজে উঠবে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, সেই দিনটিই হবে দেশের এই কুতী ক্রীড়াবিদের প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।



৬ সেপ্টেম্বর ৪৭ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লামায় অনুষ্ঠিত বাছাই পর্বে প্রতিপক্ষকে ৯-০ গোলে হারিয়ে জয়লাভ করে মেয়ে কোয়ান্টামরা। খেলা শেষে কোয়ান্টামে ফেরার পথে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তারা চিরদিনের জন্যে হারায় প্রিয় কোচ কায়সার জাহিদকে। দুর্ঘটনায় আহত মূল দলের পাঁচ জন খেলোয়াড়কে রেখেই পরবর্তী খেলায় (১৩ সেপ্টেম্বর, বান্দরবানে) মাঠে নামে ওরা। খেলার শুরুতে প্রয়াত কোচের স্মরণে পালন করে এক মিনিট নীরবতা (ছবি)। সেই খেলায় ১৩-১ গোলে জয়ী হয় ওরা। জাহিদ চলে গেছেন, বেঁচে আছে তার স্বপ্ন।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমার দুই মেয়ে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। দুজনই শিক্ষার্থী। ওরা কোনো উপার্জন করে না কিন্তু এতিমের দায়িত্ব নিতে চায়। এক্ষেত্রে টাকা আমাকেই দিতে হবে। এ মাস থেকে আমিও একজন এতিমের দায়িত্ব নিয়েছি। আমার মেয়েদের টাকা আমি দেয়ার মাধ্যমে ওরা কি এতিমের দায়িত্ব নিতে পারবে?

উত্তর : আপনি তো সৌভাগ্যবান যে আপনার সন্তানেরা এতিমের দায়িত্ব নিতে চেয়েছে। বর্তমানে সমাজের বেশিরভাগ মা-বাবা সন্তানদের নিয়ে কতরকম পেরেশানিতে ভুগছেন, সন্তানকে ভালো কাজে যুক্ত করার জন্যে কতভাবে চেষ্টা করছেন! আর আপনার মেয়েরা নিজে থেকেই বলছে তারা এতিমের দায়িত্ব নিতে চায়।

আপনার দুই মেয়েকে তো উপহার দেয়া উচিত। কারণ তারা কোনো আজীবাজে জিনিস আপনার কাছে চায় নি। চাইলে তো ঠিকই আদায় করে নিতে পারত। তারা যেহেতু এখনো উপার্জন করে না এবং আপনার ওপর নির্ভরশীল, আপনি তাদের পক্ষ থেকে টাকাটা দান করতে পারবেন। বোঝা যাচ্ছে যে, আরো দায়িত্ব নেয়ার সামর্থ্য আপনার আছে।

এই যে দান করার এবং এতিমের দায়িত্ব নেয়ার উৎসাহ আপনি সন্তানদেরকে দিচ্ছেন, এই উৎসাহটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দোয়া করি, আপনার সন্তানেরা যখন নিজেরা উপার্জন করবে, তখন যেন আরো বড় বড় দায়িত্ব তারা নিতে পারে। তাদের মধ্যে দায়িত্ব নেয়ার যে মানসিকতা, এজন্যে সবসময় আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের নিয়ে নিয়মিত সাদাকায়ন-আলোকায়নে অংশ নেবেন এবং সংসঙ্গে একাত্ম থাকবেন।

প্রশ্ন : আমার শাওড়ির মৃত্যু হয়েছে আজ তিন মাস হলো, কিন্তু আমার স্বামী এখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এ কারণে তিনি পরিবারে ও কর্মস্থলে নানা অস্থিরতায় ভুগছেন, কখনো কখনো আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করছেন। কীভাবে তিনি এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারেন?

উত্তর : মা-বাবাকে হারিয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। জীবনে অবশ্যই শোক আসবে। একদিন সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা জীবনের খুব সহজ সত্য। কোরআনে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না। ... (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৪৫)

মায়ের মৃত্যুশোকে অস্থির হয়ে আপনার স্বামী যখনই পরিবারের সাথে বা তার কর্মস্থলে দুর্ব্যবহার করছেন, তিনি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং চারপাশের মানুষদেরও কষ্ট দিচ্ছেন। আর দুর্ব্যবহার সবসময়ই গুনাহর কাজ। তিনি তার মাকেও গুনাহর ভাগীদার বানাচ্ছেন এবং পুণ্য থেকে বঞ্চিত করছেন।

এসময় তিনি যদি আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পড়েন বা দান করেন, এটা অনেক বেশি কল্যাণকর। এখন আপনারা যত দোয়া করবেন, সদকা দেবেন এবং সংকাজ করবেন, মৃত ব্যক্তি তত ভালো থাকবেন। সন্তানের শোক কখনো মৃত মা-বাবার আমলনামায় যুক্ত হয় না। তাদের আমলনামায় যুক্ত

হয় সন্তানের সৎকর্ম আর দোয়া। অতএব সৎকর্মের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়াই উত্তম।

কোয়ান্টামে আমরা বলি, মাথার ওপর দিয়ে কোনো কিছু উড়ে যেতে পারে কিন্তু মাথায় সেটার বাসা বানাতে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। রসুলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় তাঁর অনেক আপনজন তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর চোখেও পানি এসেছে কিন্তু সেই শোক তাঁর কোনো দায়িত্বকে বা কাজকে কখনো ব্যাহত করে নি। নবী-রসুলদের জীবনে দুঃখকষ্ট এসেছে, প্রতিকূলতা এসেছে। কিন্তু শোকের কারণে তাঁরা কখনো কাজ বন্ধ করেন নি, কখনো সৎকর্ম থেকে দূরে থাকেন নি।

অতএব আমরা যেন শোক বা দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো অজ্ঞদের মতো আচরণ না করি। আমাদের উচিত শোকটাকে সৎকর্মে রূপান্তরিত করা, সাদাকায় রূপান্তরিত করা। আমরা দোয়া করি, আপনার স্বামী যেন শোককে সাদাকায় রূপান্তরিত করতে পারেন।

প্রশ্ন : মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শে আমি ১৭/১৮ বছর যাবৎ একটানা ওষুধ খেয়েছি। আমার বয়স ৪৪ বছর। কোর্স করার পর ওষুধ বন্ধ রাখতে পেরেছিলাম। কিন্তু আবার মনোরোগ এবং স্নায়ুরোগের চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। ওষুধ না খেলে খারাপ লাগে। আপনার পরামর্শ চাই।

উত্তর : মনোরোগের ওষুধগুলো থেকে বেরিয়ে আসার একটা নিয়ম আছে, একটা ব্যাকরণ আছে। জীবনে প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যাকরণ আছে এবং তা অনুসরণ করবেন। আর এসব ওষুধ সবসময় চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বন্ধ করা উচিত। কারণ তারা জানেন, কোন ওষুধের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং কীভাবে তা বাদ দিতে হবে।

সাধারণত কোনো ওষুধ বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন-আপনি হয়তো একটি ট্যাবলেট খাচ্ছেন, প্রথমে একমাস ট্যাবলেটের অর্ধেকটা খান। তারপর একমাস চার ভাগের একভাগ খান। পরের একমাস ওই চার ভাগের একভাগ ট্যাবলেট একদিন অন্তর অন্তর সেবন করুন। অর্থাৎ ধীরে ধীরে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিন। এটা হচ্ছে নিয়ম। তবে সবটাই যে এই নিয়ম অনুসারে হবে, তা নয়। তাই সবসময় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেন।

তবে নির্মম সত্য হলো, ওষুধে আসক্ত করে ফেলাটা হচ্ছে ওষুধ কোম্পানিগুলোর মূল লক্ষ্য। ওষুধ কোম্পানির লিটারেচার পড়ে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লিখে দেয়া হয়-চলবে চলবে। এই চলবে মানে কী? ওষুধ কি নাশতা নাকি পানি? তাহলে চলবে কেন? কারণ যত ওষুধ চলবে তত ব্যবসা চলবে। ওষুধ কোম্পানির লাভ হবে আর আপনার পকেট ফাঁকা হবে এবং আপনার শরীরের বারোটা বাজবে। আপনাকে ওষুধের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলাটাই ওষুধ কোম্পানিগুলোর লক্ষ্য।

তাই আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে সবসময় বলি, সুস্থতার দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে। আপনাকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব কোনো ডাক্তার, হাসপাতাল বা ওষুধ কোম্পানির নয়। আপনার নিজেকে সচেতন হতে হবে, সঠিক জীবনচারণা অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন-ঋণমুক্ত সচ্ছল জীবন আমার মৌলিক অধিকার। কিন্তু কী করে ঋণমুক্ত হবো? আমার আয় পাঁচ টাকা আর আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে প্রয়োজন ১০ টাকা। আল্লাহ কোনো না কোনোভাবে মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করতে পারছি না। কীভাবে ঋণমুক্ত হবো, যদি বলে দিতেন!

উত্তর : ঋণমুক্ত হওয়ার জন্যে আসলে আপনার নিয়তটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে আপনার ব্যয়টা সীমার মধ্যে আনতে হবে। নিজের কাছে দৃঢ় থাকবেন যে, আল্লাহ আমাকে যা উপার্জন করার সামর্থ্য দিয়েছেন, তাতেই আমি চলব। তাহলে দেখবেন আপনার চলার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

বেশিরভাগ মানুষ তাদের আয় না বাড়িয়ে ব্যয়টাকে বাড়িয়ে ফেলে। আর আয় না বাড়িয়ে ব্যয় বাড়ানোর ফন্দিটাই হচ্ছে শোষকদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। নানান রকম বিজ্ঞাপন ও পণ্যের জৌলুস দেখিয়ে তারা আপনার ব্যয় বাড়িয়ে দেবে। তারপর আপনি শুধু কিস্তি দিতে থাকবেন।

আমাদের দেশে কিন্তু ৪০ বছর আগেও এই কিস্তি ছিল না। এখন চারপাশে সবারই কিস্তি-কারো ক্রেডিট কার্ডের কিস্তি, কারো ফ্ল্যাটের জন্যে, কারো গাড়ির কিস্তি। এমনকি মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিনও মানুষ কিস্তিতে কিনছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেনাকাটাগুলো প্রয়োজন পূরণের জন্যে নয়, করা হচ্ছে জৌলুস বাড়ানোর জন্যে। আসলে প্রয়োজন কতটুকু সেটা বুঝতে হবে।

যখনই আপনি উপার্জন ছাড়া কোনো ভোগ্যপণ্য কিস্তিতে কিনছেন, তখনই নিজের ওপর গজব নিয়ে আসছেন। আপনার জীবনে শান্তি থাকবে না। কারণ একদিকে ঋণের দুশ্চিন্তা, আরেকদিকে চক্রবৃদ্ধি সুদে আপনি জড়িয়ে পড়ছেন। রসুলুল্লাহ (স) যে কয়েকটি বিষয় থেকে পানাহ চেয়েছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ঋণ।

আর ব্যাংক ঋণ তো কখনোই নেবেন না। এখন তো ব্যাংকগুলো বিয়ের জন্যেও ঋণ দিচ্ছে। ঋণ করে কখনো এই ফুটানি করতে যাবেন না। কারণ ঋণ মানেই অভিশাপ। যারা ঋণ করে বিয়ে করেছে, ঋণশোধের চিন্তায় তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, কেউ কেউ সর্বস্বান্ত হয়েছে-এরকম অনেক উদাহরণ আছে। অতএব কোনো কিছুতেই ঋণ নয়। আগে উপার্জন করবেন, তারপর খরচ করবেন। ঋণের ব্যাপারে পরিচিতদেরও নিরুৎসাহিত করবেন।

আর ইতোমধ্যেই যারা ঋণগ্রস্ত তারা নিয়ত ঠিক রাখবেন যে, আমাকে ঋণমুক্ত হতে হবে। তাহলে আল্লাহ আপনার জন্যে সহজ করে দেবেন। কারণ আল্লাহ তাকেই সাহায্য করেন, যে মানুষ জীবন বদলের জন্যে নিজে উদ্যোগী হয়।

এ মাসের অটোসাজেশন

সকল পরিস্থিতিতে সবসময়
বলব-প্রভু! তোমাকে ধন্যবাদ।
সবকিছুর জন্যেই আমি কৃতজ্ঞ।

কোয়ান্টাম পরিবারের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান

সভ্যতার বিকাশে যুগে যুগে প্রেরণা জুগিয়েছে নারী

হে নারী! আলোকিত সভ্যতা নির্মাণে তোমার মেধা, তোমার শ্রম শীর্ষক বিশেষ একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে। এতে অংশ নেন কোয়ান্টাম পরিবারের ২৪২ জন নারী সদস্য।

অনুষ্ঠানের প্রথমভাগে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় সুরাইয়া রহমান এবং বাণীবাহক বনানী তানজিমা রহমান। দ্বিতীয়ভাগে আলোচনা করেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী। আর্ডেন্টার শামীমা আক্তার অনুষ্ঠান সম্বলন্যার দায়িত্ব পালন করেন।

পরিচালক সমন্বয় সুরাইয়া রহমান বলেন— ‘বুদ্ধবাণীতে আছে, এ পৃথিবীর যত দুঃখ তার সবই একা সুখী হওয়ার বাসনা থেকে উদ্ভূত। আর এ পৃথিবীর যত সুখ তার সবই নিজের সুখ অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার বাসনা থেকে উদ্ভূত।’

কোয়ান্টামে এসে আমাদের ভেতরে সত্যিকার মানুষ হওয়ার তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। সহজাতভাবেই নারীদের মমতা ও আবেগ বেশি, লেগে থাকার ক্ষমতাও বেশি। তারা সুদক্ষ হাতে একই সময়ে একাধিক কাজ করতে পারেন। আমরা সৌভাগ্যবান যে, ফাউন্ডেশনে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গিয়ে নিজেদের এই গুণগুলো ও অনন্যতাকে আমরা ইতিবাচকভাবে বিকাশের সুযোগ পেয়েছি।

ব্যক্তিগত জীবনে ঘরের সব কাজ আমি নিজে করি। ফাউন্ডেশনে আসার আগে আমি ছিলাম পুরোদস্তুর গৃহিণী। সাংগঠনিক কাজের কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। কিন্তু প্রো-একটিভ থেকেছি এবং সবার সাথে সৌহার্দ্য রেখে দায়িত্ব



পালনের চেষ্টা করেছে সবসময়। সজ্জের কোনো কাজে কখনো অজুহাত দেয়ার চেষ্টা করি নি। আমি মনে করি, প্রতিটি নারীর মাঝেই রয়েছে এ শক্তি।’

অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয়া মা-জী বলেন, ‘যুগে যুগে যে মহামানবদের হাত ধরে সভ্যতার উত্থান ঘটেছে, তার নেপথ্যশক্তি হিসেবে প্রেরণা দিয়েছে নারী। মহানবী (স)-এর জীবনেও আমরা দেখি, তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) তাঁকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন, দুর্গম হেরা গুহায় তাঁর খাবার পৌছে দিয়েছেন। এমনকি তাঁকে রসুল হিসেবে প্রথম গ্রহণ করেছিলেন তিনিই।’

পৃথিবীতে বিশ্বাস ও লেগে থাকার ক্ষেত্রে নারী সবসময় অগ্রগামী। জীবনে বড় কিছু অর্জন করতে

হলে লেগে থাকতে হয়। এই লেগে থাকা অর্থাৎ ধৈর্যের জন্যে প্রয়োজন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা।

স্রষ্টার করুণায় ২৬ বছরের নিরলস কর্মে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আজ লাখো মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রেও নারীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কারণ পরিবারে মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম জীবনাচার চর্চার পাশাপাশি তারা উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন চারপাশের সবাইকে। আমরা বিশ্বাস করি, সবার সম্মিলিত প্রয়াসে কোয়ান্টামের প্রশান্তির বাণী শুধু দেশে নয়, সারা বিশ্বে পৌছে যাবে। একদিন সারা বিশ্ব হবে আলোকিত।’

সমাপনী পর্বে শ্রদ্ধেয়া মা-জী বিশেষ মেডিটেশন পরিচালনা করেন।

আইনজীবীদের অংশগ্রহণে কোয়ান্টাম ইয়োগা সেমিনার



ল'ইয়ার্স মেডিটেশন সোসাইটি-র উদ্যোগে ১১ ও ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম ইয়োগা বিষয়ক দুটি সেমিনার। ঢাকা বার এসোসিয়েশনের আড়াই শতাধিক আইনজীবীর অংশগ্রহণে প্রথম প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান অডিটোরিয়ামে। দ্বিতীয় প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা ট্যাক্সেস বার এসোসিয়েশনে। এতে অংশগ্রহণ করেন দেড় শতাধিক আইনজীবী।

কোয়ান্টাম ইয়োগা-শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তির উৎস বিষয়ে আয়োজিত এ দুটি সেমিনারে

মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর ডা. মনিরুজ্জামান।

আলোচনায় উঠে আসে-আধুনিক কর্মব্যস্ত মানুষের জন্যে সবচেয়ে সহজ ও সমন্বিতব্যয়োগী ব্যায়াম কোয়ান্টাম ইয়োগা। যারা সুস্থ ও কর্মময় থাকতে চান, তাদের জন্যেই এ কার্যক্রম।

সেমিনারে কোয়ান্টাম ইয়োগার সহজ কিছু আসন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়। এ পর্বটি পরিচালনা করেন ল'ইয়ার্স মেডিটেশন সোসাইটির আহ্বায়ক এডভোকেট মনিরুজ্জামান।



হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ,
ডায়াবেটিস, স্ট্রোক
ও মেদস্থলতার

মূল কারণ ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি
ও অবৈজ্ঞানিক জীবনাচার

‘ ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি এবং মেডিটেশন, ব্যায়াম, প্রাণায়াম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে আপনি সহজেই এই রোগগুলো প্রতিরোধ ও নিরাময় করতে পারেন ’

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ
ওরিয়েন্টেশন

১০০ তম ব্যাচ

তারিখ : ২৬ ও ২৭ অক্টোবর ২০১৮

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)। কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

যোগাযোগ

৮৩৯৬৮১৫, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬

quantummethod.org.bd



নিরাপদ রক্তের নির্ভরতা কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

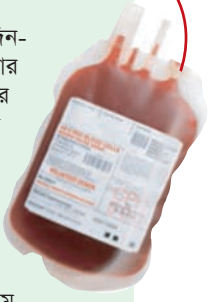


ধানমন্ডি
আইডিয়াল
কলেজে
অনুষ্ঠিত
ব্লাড ক্যাম্পে
রক্তদান
করেন
২১৮ জন
শিক্ষার্থী।
১১ আগস্ট
২০১৮

মুমূর্ষের সেবায় ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা

মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে সারা বছর দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা এ সেবা নেয়ার সুযোগ থাকে সর্বস্তরের মানুষের জন্যে। নিয়মিত রক্তের চাহিদা পূরণ ছাড়াও দেশের যে-কোনো দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনে মানুষের পাশে আছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

যেহেতু রক্তের কোনো বিক্রয়মূল্য হয় না, তাই কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্তের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মৌলিক পাঁচটি স্ক্রিনিং টেস্টে (হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিলিফিলিস, এইডস এবং ম্যালেরিয়া) ন্যূনতম প্রেসেসিং খরচ রাখা হয়।



১৯ তম জন্মদিনে ল্যাবে এসে রক্ত দিন



আমাদের দেশের ১৯-৬০ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মাত্র তিন শতাংশ যদি প্রতিবছর শুধু তাদের জন্মদিনে রক্ত দেন, তাহলেই আমরা দেশের রক্ত চাহিদার পুরোটাই মেটাতে পারি। তাই ১৯ তম জন্মদিনে প্রথমবার রক্ত দিয়ে দিনটিকে স্মরণীয় করার চমৎকার সুযোগ হলো অজেয় ১৯ কার্যক্রম।

আর ল্যাবে এসে রক্ত দিলে একব্যাগ রক্ত থেকে উপাদানগুলো বিভক্ত করে কমপক্ষে চার জন মানুষের জীবন বাঁচানো যায়। মুমূর্ষের জীবন বাঁচাতে রক্তদানের মতো একটি মহান কাজে তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয় ফাউন্ডেশনের অজেয় ১৯ কার্যক্রমটি। এ পর্যন্ত দেশের ৩৯০টি স্কুল-কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মোট ৯০৭টি কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে ৫৬ হাজার অগ্রহী রক্তদাতা।

আপনার এলাকায় বা প্রতিষ্ঠানে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন :

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/তি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর
ঢাকা-১২১৭। ফোন : ০১৭১৪-০৪৭৬৩৬
blood.quantummethod.org.bd

‘আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দূষিত রক্তের জন্যে রোগীর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে রক্ত নিয়ে আমি এ পর্যন্ত কোনো সমস্যা পাই নি। কারণ তাদের ব্লাড স্ক্রিনিং পদ্ধতি অত্যন্ত ভালো।’
ডা. মো. আসলাম হোসেন। সহযোগী অধ্যাপক, কার্ডিয়াক সার্জারি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

‘কোয়ান্টাম ল্যাবে যে স্ক্রিনিং টেস্ট করা হয় সেগুলো বিশ্বমানের। তাই এর ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারি। এ-ছাড়া প্লাটিলেট, প্লাজমা-সহ যে রক্ত উপাদান আমাদের প্রয়োজন হয়, এখান থেকে সহজেই পাই।’
ডা. অলিয়া শারমিন। সহযোগী অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

‘রক্ত দেয়ার আগে রক্তদাতার পালস দেখা হয়, ব্লাড প্রেশার মাপা হয় এবং রক্তের পাঁচটি টেস্ট করা হয়। এই ফ্রি মেডিকেল চেকআপটি তার বাড়তি লাভ, যা কোয়ান্টাম ল্যাবে নিখুঁতভাবে করা হয়। নিরাপদ ও সুস্থ রক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কোয়ান্টাম বিশেষ অবদান রাখছে।’
ডা. শহীদুর রহমান। মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), বাড্ডা

‘কোয়ান্টাম ল্যাব ন্যূনতম প্রেসেসিং খরচে রোগীদের রক্ত দিচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে তাদের কাছে রক্তের জন্যে পাঠিয়ে আমরা কখনো নিরাশ হই নি।’
ডা. কাওছার পারভীন জলি। গাইনি বিশেষজ্ঞ, মা ও শিশু হাসপাতাল, মাতুয়াইল

এক নজরে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

- এ পর্যন্ত সরবরাহকৃত রক্ত ও রক্ত উপাদান ১০,১৪,৫৩৭ ইউনিট
- স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা ৩,৩৪,১৭১ জন
- শত আজীবন রক্তদাতা (তিন-নয় বার) ৩৯,৮৭৭ জন
- সিলভার ডোনার (১০-২৪ বার) ৮,৫০১ জন
- গোল্ডেন ডোনার (২৫-৪৯ বার) ১,১৮৮ জন
- প্লাটিনাম ডোনার (৫০-এর বেশি বার) ১০ জন
- স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৩,৯৯৫টি ব্লাড ক্যাম্প সংগ্রহ হয়েছে ১,৮৫,৮৭০ ব্যাগ রক্ত।
- থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, কিডনিবৈকল্য ও এনিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদেরকে আংশিক বা বিনামূল্যে নিয়মিতভাবে রক্ত সংগ্রহের জন্যে ৪৩৫টি কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- সামর্থ্যহীনদের জন্যে বিনা প্রেসেসিং খরচে ৩৫,৬০৯ ইউনিট এবং সীমিত সামর্থ্যবানদের ন্যূনতম প্রেসেসিং খরচে ৫৪,৭০০ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান প্রদান করা হয়েছে।
- অগ্নিদগ্ধসহ অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসার্থে সরবরাহকৃত ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ২,০৫,৩৩৭ ইউনিট
- স্ক্রিনিং টেস্টে দূষিত গণ্য হওয়ায় বাতিল ১০,৫০৯ ইউনিট

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত

কোয়ান্টাম বুলেটিন : অক্টোবর ২০১৮ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/তি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd

ওরা থেমে নেই, আপনি কেন থামবেন?

প্রযুক্তি মাফিয়ারা থেমে নেই। ঠিকই ওরা নিত্যনতুন অপকৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক আত্মসন। যদিও বিভিন্ন প্রযুক্তি-উপকরণগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ও ব্যক্তিগত তথ্য চুরিসহ নানা অভিযোগ আজ প্রমাণিত। কিন্তু তাতে প্রযুক্তি মাফিয়াদের তালুব কি কিছু কমেছে?

ওরা থামে নি। আপনি কেন থেমে যাবেন-যখন বুঁকিতে আপনার সন্তান ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য আর নিরাপত্তা? যখন ভারুয়াল মহামারী ক্রমশ সর্বনাশ ঘটিয়ে চলেছে আপনার আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশীদের? যখন বুঁকির মুখে প্রিয় দেশ ও জাতি?

সিকি শতাব্দী ধরে জাতিকে স্বপ্নে-আশায় উজ্জীবিত করেছে কোয়ান্টাম-মানবিকতার অভিযাত্রায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ। এজন্যে চাই সুস্থ, উদ্যমী, আত্মবিশ্বাসী এক প্রজন্ম। কিন্তু প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে অসুস্থ ও হীনম্মন্য মানুষ দিয়ে কীভাবে গড়ে উঠবে সেই নৈতিক মহাসমাজ?

তাই ২০০৯ থেকেই দেশবাসীকে সচেতন করে তুলছে কোয়ান্টাম। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ ক্যাম্পেইন। শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিসে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতামূলক সেমিনার। পাশাপাশি ব্যক্তি-উদ্যোগে এই বাণী ছড়িয়ে গেছে দেশের লাখে পরিবারে। তারা মুক্ত হয়েছেন মাদকের চেয়েও ভয়ানক ফেসবুক-ইন্টারনেট-স্মার্টফোন আসক্তি থেকে।

অতএব সর্বতো চেষ্টায় চলমান রাখতে হবে আমাদের এই কল্যাণ প্রয়াস। বাড়াতে হবে কর্মতৎপরতা। সর্বপ্রথম নিশ্চিত করুন ফাউন্ডেশনে আপনার নিয়মিত সম্পৃক্ততা। এতে শোষকদের সাম্প্রতিক ফাঁদগুলো সম্পর্কে নিজে যেমন জানবেন, তেমনি সচেতন করে তুলতে পারবেন পরিচিতদেরও। সবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সচেতন প্রয়াসেই এগিয়ে যাবে জাতি। সমৃদ্ধ হবে প্রিয় বাংলাদেশ।



ভারুয়াল ভাইরাসের ভয়াবহতা ও আসক্তি সম্বন্ধে সচেতন করতে ফাউন্ডেশন প্রকাশিত স্টিকার, ফোল্ডার, কণিকা ও ভিডিও সংগ্রহ করুন। পৌঁছে দিন পরিচিত পরিমণ্ডলে।



আপনার দেহ-মন সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই

সুস্থ দেহ-মন একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এর সুরক্ষায় মূল দায়িত্বটা নিতে হবে নিজেকেই। আর এ দায়িত্ব সম্পর্কে যিনি যত সচেতন তার সুস্থতা তত বাড়ে, অন্যদিকে যিনি যত উদাসীন ও খেয়ালি, দিন দিন তত বাড়ে তার অসুস্থতা। তাই আপনার দেহ-মন সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই।

গত ৩ অক্টোবর ঢাকার আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

কোয়ান্টাম পরিবারের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন প্রয়াত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খানের একটি কথার সূত্র ধরে গুরুজী বলেন, স্যার বলতেন-‘এ যুগে মানুষ সারাজীবন ধরে যা রোজগার করে, জীবনের শেষ তৃতীয়াংশে এসে তা সে ব্যয় করে ডাক্তার, ওষুধ ও ক্লিনিকের পেছনে।’ বাস্তবতাও আসলে তা-ই। এবং এর অন্যতম কারণ হলো, নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অসচেতনতা ও দায়িত্ব নিতে অনীহা। কারো কারো ধারণাটাই এমন যে, ‘আমাকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব ডাক্তার-হাসপাতালের।’ কিন্তু ডাক্তার, ওষুধ, হাসপাতাল হতে পারে তার নিরাময়ের সহযোগী শক্তি মাত্র। মূলত এ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আজকের এত মনোদৈহিক স্বাস্থ্য-জটিলতার উৎপত্তি।

তিনি বলেন, পুঁজিবাদী আত্মসনের এই যুগে রূপচর্চা নিয়ে আমরা যতটা ব্যস্ত, শরীর-মনের প্রতি আমাদের মনোযোগ ততটাই কম। কিন্তু রূপচর্চার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বাস্থ্যচর্চা। কারণ নিজের শরীর-মনের প্রতি আপনি যত ভালবাসা অনুভব করবেন তত এর যত্ন নিতে উদ্বুদ্ধ হবেন। তত সুস্থ থাকবেন, রোগমুক্ত থাকবেন। আর নিজের চেহারা ও শারীরিক গড়ন নিয়ে যদি হীনম্মন্যতায় ভোগেন, এ নিয়ে ভেতরে বিরক্তি ও

নেতিবাচকতা লালন করেন, তাহলে অন্যরা আপনাকে সম্মান করবে না। আপনার রূপচর্চাও আকৃষ্ট করবে না কাউকেই। বরং আপনি যখন নিজের অনন্যতাকে সম্মান করেন, পার্থিব অস্তিত্ব হিসেবে স্রষ্টা আপনাকে যে চেহারা-অবয়ব দিয়েছেন তা নিয়ে কৃতজ্ঞচিত্ত হন, সেই আত্মসম্মানবোধই আপনাকে সুস্থ এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। এটাই চিরসত্য।

আমরা ইদানীং যেসব ভুল জীবনাচারের কারণে অসুস্থ হই, তার অধিকাংশই খাদ্যাভ্যাস-সংক্রান্ত। এজন্যে প্রথমত খাবারটা খেতে হবে গুরুরীয়ার সাথে, পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে এবং নীরব মনোযোগে। তাহলে শরীর সেই খাবার থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ করবে। দেহ থাকবে সুরক্ষিত। সাম্প্রতিক চিকিৎসা-গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে, এই নিয়মে খাবার গ্রহণ দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে।

আর যত বিরক্তি নিয়ে খাবেন, খাওয়ার সময় টিভি সিরিয়াল দেখা কিংবা পরচর্চা-পরিনিদ্রা ও নেতিবাচক আলাপ করতে করতে খাবেন তত এসিডিটি বাড়বে, শরীর হয়ে উঠবে এসিডিক, যা ব্যাকটেরিয়া-সহ নানা জীবাণুর আত্মসনের পক্ষে অনুকূল। যার ফলে বাড়ে অসুস্থতার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, মুখরোচক খাবার নয়, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার খাবেন। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর খাবার সর্বতোভাবে বর্জন করবেন।

এর পাশাপাশি কোয়ান্টাম ইয়োগা ও অন্যান্য সুস্থ জীবনচর্চা এবং ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি আপনাকে রাখবে সব দিক থেকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, উদ্যমী ও প্রাণবন্ত। আর সার্বিক সুস্থ জীবনের জন্যে সবসময় পরম করুণাময় স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করবেন-প্রভু হে! আমার সুস্থতার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি। আমি নিজেকে সুস্থ রাখতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য করো।

ব্যথা ভালো হবে না কেন?

অধ্যাপক ডা. বজলুল করিম



তিন বছর ধরে ডান গোড়ালির ব্যথায় ভুগছিলাম। দেশে-বিদেশে চিকিৎসার পর জানা গেল, ওখানে টিবি হয়েছে। একবছর ধরে টিবি চিকিৎসা চলেছে। কিন্তু ব্যথাটা কমছিল না। হাসপাতালে আমি ছইল চেয়ারে বসে রাউন্ড দেই। বাসায়ও আমাকে দুটো ক্রাচ ব্যবহার করতে হয়।

কিছুদিন আগে আমার এক ছাত্রী এ কোর্সে অংশ নেয়। সে বলল, স্যার, মেডিটেশন করুন, ব্যথা চলে যাবে। এক রোগীর মা-বাবা বললেন তারা এ কোর্স করে উপকৃত হয়েছেন। তারপর এক আত্মীয় প্রায় জোর করে আমাকে এখানে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

গতকাল কোর্স থেকে ফিরে আমি হাসপাতালে রাউন্ড দিয়েছি ছইল চেয়ার ছাড়াই, একটা ক্রাচে ভর দিয়ে! নিরাময়ের এই কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া আমি চর্চা করে যাব এবং আমার বিশ্বাস, ক্রাচটাও ফেলে দিতে পারব। ব্যথা ভালো হবে না কেন?

আগে আমার সংশয় ছিল যে, এটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা। কিন্তু চার দিনে যা শুনলাম, দেখলাম-এটা শতভাগ ইসলামসম্মত বলে আমি বিশ্বাস করি। আরো একটা দ্বিধা ছিল-এটা বিজ্ঞানসম্মত কিনা। মস্তিষ্কের কর্মপ্রক্রিয়ার আলোকে গুরুজী যেভাবে কোয়ান্টাম মেথডকে ব্যাখ্যা করলেন তা অতুলনীয়।

এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি ছাত্র ও সহকর্মীদের বলব-কোয়ান্টাম মেথড পুরোপুরি একটি ইসলামসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া।

[অধ্যাপক ডা. এ. এস. এম. বজলুল করিম। বিএসএমএমইউ-এর শিশু পুষ্টি ও পরিপাকতন্ত্র বিভাগের প্রধান। ৪৫০ তম ব্যাচের প্রত্যয়নে তিনি একথা বলেন।]

কোয়ান্টাম মেথড

৪৫২ তম কোর্স ৯ ডাকা

১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নভেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

দেশের বিশিষ্ট প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার। চিকিৎসাবিজ্ঞানের একনিষ্ঠ এ কর্মীর উদ্ভাবিত সায়েবা'স মেথডের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে উপকৃত হচ্ছেন লাখো মা। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ফিস্টুলা আক্রান্ত দুস্থ নারীদের সূচিকিৎসার জন্যে পেনশনের পুরো অর্থ ব্যয় করে তিনি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মাম'স ইনস্টিটিউট অব ফিস্টুলা এন্ড ওমেনস হেলথ। ১ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৮০ তম পর্বে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। তার আলোচনার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

আমরা সচেতন হলেই সমাজে পরিবর্তন আসবে

অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার



২০০০ সাল। আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সে-সময় গাইনি ওয়ার্ডে প্রসবকালে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে একটি মেয়ে মারা গেল। ডাক্তার নার্স সবাই মিলে আমরা খুব চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করা গেল না। সেই রাতে আমি ঘুমাতো পারলাম না। বার বার মনে হচ্ছিল-১৮ বছরের মেয়েটি মা হতে গিয়ে এভাবে মারা গেল, আমরা কিছুই করতে পারলাম না!

সন্তান জন্মদানকালে পৃথিবীতে যত মা মারা যায়, তাদের প্রতি তিন জনের একজনের মৃত্যুর প্রধান কারণ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। আমাদের দেশেও শতকরা ৩১ ভাগ মাতৃমৃত্যুর কারণ এটি। এসময় মায়ের রক্তপাত বন্ধ করা সম্ভব হলেই তাকে বাঁচানো যায়।

এ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এক ধরনের বেলুন দিয়ে রক্তপাত বন্ধের কৌশল শেখানো হয়েছিল আমাদের। ইংল্যান্ড থেকে আনা সেই বেলুনটির দাম ৩০০ ডলার, কিন্তু মাত্র একবারই এটি ব্যবহার করা যাবে। আমাদের মতো একটি দেশের জন্যে যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে যেদিন মেয়েটি মারা গেল, আমার শুধু মনে হচ্ছিল, বেলুনটি থাকলে হয়তো আজ মেয়েটি প্রাণে বেঁচে যেত। এরকম নানান চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন, হঠাৎ মনে হলো-কনডম তো একটা মেডিকেল টুল আর এটি সুলভ ও সাশ্রয়ী। বেলুনের জায়গায় তো এটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ঘটনার একদিন পরেই আমি ওয়ার্ডে রাউন্ড দিচ্ছিলাম। জানতে পারলাম, সিজারিয়ান অপারেশনে একজন মা মৃত সন্তান জন্ম দিয়েছেন, কিছুতেই তার রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে জরায়ু অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ রোগীর ক্ষেত্রেও সেই প্রস্তুতিই চলছিল। আমি অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে বললাম, শেষ একটা চেষ্টা করে দেখি। তারপর রোগীর জরায়ুতে একটি কনডম প্রবেশ করিয়ে তাতে স্যালাইন ভরে ওটা ফোলানো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তপাত বন্ধ হলো। রোগীটা বেঁচে গেল!

সহকর্মী ডাক্তারদের নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করলাম। একে একে ২৩ জন মৃত্যুপথযাত্রী প্রসূতি মায়ের ক্ষেত্রে আমরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলাম এবং সফল হলাম। আমাদের গবেষণার ফলাফল আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হলো। উদ্ভাবিত হলো সায়েবা'স মেথড। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হলো এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে।

বর্তমানে বাংলাদেশ-সহ ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের গাইনি চিকিৎসায় ও মেডিকেল পাঠ্যসূচিতে কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি হিসেবে সায়েবা'স মেথড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব দেশে হাজার হাজার দরিদ্র

মায়ের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছে এটা। আমাদের দেশের জন্যে যা অত্যন্ত গর্বের। আমি মনে করি, এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এটা সম্ভব হয়েছে আমার রোগীদের আন্তরিক দোয়ার ফলে।

এদেশের মায়েরা অনেক দিক থেকে অসহায়। এই উপলব্ধিটা আমার হয়েছে মেডিকেল কলেজে পড়তে এসে। অবশ্য আমি কখনো ডাক্তার হতে চাই নি। কিন্তু আমার বাবার ইচ্ছে ছিল, চিকিৎসক হয়ে আমি মানুষের জন্যে কিছু করব। মূলত তার অনুপ্রেরণাতেই আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলাম। প্রথম দুবছর পড়াশোনায় কোনো অগ্রহ পাই নি। চলেও এসেছিলাম কয়েকবার।

কিন্তু থার্ড ইয়ারে যখন রোগীদের সংস্পর্শে এলাম, তখন থেকে আর কোনো দ্বিধা আমার মধ্যে কাজ করে নি। রোগীদের অসহায়ত্ব দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম-এদের জন্যে আমাকে কিছু করতে হবে।

আজ জীবনের এই প্রান্তে এসে আমি মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করি। তারা যদি আমাকে উৎসাহ না দিতেন, তাহলে আমাদের দেশের অসহায় মায়েরদের জন্যে কিছু করার সুযোগ আমার হতো না। অভিভাবকদের সিদ্ধান্তগুলো কখনো কখনো সন্তানদের ভালো লাগে না। কিন্তু মা-বাবা যে কথাগুলো বলেন তা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলেন।

প্রসূতি মায়েরদের জন্যে কাজ করতে গিয়ে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, গর্ভকালীন সময়ে সারাক্ষণ বিশ্রাম নেয়াই হচ্ছে পরিচর্যা। এটি ভুল ধারণা। অতিরিক্ত পরিশ্রম যেমন গর্ভবতী মায়ের জন্যে ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর অতিরিক্ত বিশ্রামও। স্বাভাবিক চলাফেরা ও দৈনন্দিন কাজগুলো করাই স্বাস্থ্যসম্মত। অনেকের ধারণা, সন্তানসম্ভবা মা-কে অনেক বেশি খেতে হবে। এটাও ঠিক নয়। মায়ের সুস্থতা ও শিশুর বিকাশে সাধারণ পুষ্টির খাবারই যথেষ্ট। আর মায়ের শৈশবকালীন স্বাস্থ্য তার গর্ভাবস্থাকে প্রভাবিত করে। তাই একজন কিশোরীর পুষ্টি-পরিচর্যার ব্যাপারে পরিবারকে মনোযোগী হতে হবে। কিশোরীর যত্ন নেয়ার অর্থ হলো, ভবিষ্যতে তাকে সুস্থ মা হতে সাহায্য করা।

এর পাশাপাশি দরকার নিরাপদ প্রসব। একজন চিকিৎসক হিসেবে বলব-মা-কে বাঁচিয়ে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারা, পৃথিবীতে এর মতো আনন্দ আর হয় না। কিন্তু অদক্ষ ধাত্রীর হাতে অনিরাপদ প্রসবের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মা ও শিশুর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র মায়েরাই হন এর শিকার। এতে বিভিন্ন দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাদের।

এমনই একটি রোগ ফিস্টুলা। যার অন্যতম কারণ বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত প্রসব। এ রোগীদের প্রস্রাব-পায়খানার ওপর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তারা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারে না, তাদের কেউ কাজেও রাখে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীরা তাদের ত্যাগ করে। অধিকাংশের জীবন কাটে অবহেলা আর বঞ্চনায়।

আমার সবসময়ই ইচ্ছা ছিল এই দুস্থ মায়েরদের জন্যে কিছু করার। এ লক্ষ্যেই গড়ে তুলি মাম'স ইনস্টিটিউট অব ফিস্টুলা এন্ড ওমেনস হেলথ। এখানে ফিস্টুলা রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হয়। ফিস্টুলার একমাত্র চিকিৎসা হলো অপারেশন। আর গাইনিতে যত অপারেশন আছে, তার মধ্যে এটা সবচেয়ে কঠিন। এ রোগটা যেহেতু গরিব মায়েরদেরই বেশি হয়, তাই এ-ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই ডাক্তারদের নিজেদের টাকা খরচ করেই অপারেশন করতে হয়। ফিস্টুলা রোগীদের ও নিঃস্বার্থ এই ডাক্তারদের জন্যে আমি কোয়ান্টাম পরিবারের সবার কাছে দোয়া চাই।

আর আমাদের সকল রোগীর পক্ষ থেকে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এবং রক্তদাতাদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ মাম'স ইনস্টিটিউটে রোগীদের জন্যে যে রক্তের প্রয়োজন হয়, তার শতকরা ৯০ ভাগই আমরা পাই কোয়ান্টাম থেকে। প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ চিকিৎসায় প্রথম প্রয়োজন হলো রক্ত। তখন রক্ত না পেলে মা-কে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে।

একটা সময় নিরাপদ রক্ত পাওয়া সহজ ছিল না মোটেই। সে-সময় পেশাদার রক্ত-বিক্রেতাদের কাছ থেকে রক্ত কিনতে হতো। এমনও হয়েছে, রোগী অপারেশন থিয়েটারে কিন্তু রক্ত কেনার সামর্থ্য তার পরিবারের নেই। আমরা ডাক্তাররাই তখন নিজেদের ঘড়ি, স্বর্ণের চেইন জমা রেখে রক্ত এনেছি। সময়মতো রক্ত না পাওয়ায় অনেক প্রসূতি মাকে বাঁচানো যায় নি-এরকম বহু দুঃসহ স্মৃতি আমাদের আছে।

স্বেচ্ছা রক্তদান, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরদের পরিচর্যা এবং মাতৃমৃত্যু রোধে আমাদের সবার সচেতনতা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, আমরা প্রত্যেকে সচেতন হলেই সমাজে আসবে কাক্ষিত পরিবর্তন।

অনুলিখিত

সম্ভবদ্বতা ॥ ভালো থাকার বৈজ্ঞানিক উপায়

নিজেকে প্রশ্ন করুন তো, ভরসা করার মতো পরিচিত কজন আছেন আপনার? সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে কজনকে পাশে পাবেন আপনি? কিছুদিন আগেও সমাজ জীবনের চিত্রটি ছিল ভিন্ন। যৌথ পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের নিয়ে ছিল হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশ। বলা হয়ে থাকে, এ যুগে জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। অথচ সত্য হলো, সবার জীবনেই নিত্যনতুন যন্ত্র এসেছে অনেক কিন্তু কমেছে মানুষের সংস্পর্শ। সামাজিকতা এখন পরিচিতদের নিয়ে চটকদার কোনো রেষারেষি খেতে যাওয়া আর ছবি তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এগিয়ে যাওয়ার নামে আমরা আসলে পিছিয়ে পড়ছি না তো?



বাংলাদেশের তরুণদের নিয়ে জরিপের ফলাফল

৯৭%

মনে করে মানুষ এখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে

৮৯%

মনে করে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে

৮৫%

মনে করে পারিবারিক দূরত্ব বাড়ছে

তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ২০১৭

কিন্তু বলছে ভিন্ন কথা-বয়োজ্যেষ্ঠদের তুলনায় এখন তরুণরাই বেশি নিঃসঙ্গ অনুভব করে। বিশ্বব্যাপী ৫৫ হাজার মানুষের ওপর চালানো এ জরিপ অনুযায়ী, ৭৫-এর অধিক বয়সীদের মধ্যে নিঃসঙ্গ অনুভব করেন ২৭% মানুষ। অন্যদিকে ১৬-২৪ বছর বয়সীদের মাঝে একাকিত্বের হার ৪০%!

ফোর্বস-এর মতে, এভাবে চলতে থাকলে নিঃসঙ্গতা হয়ে উঠতে পারে আগামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানসিক সমস্যা। কারণ সিংহভাগ মানসিক অসুস্থতার প্রধান উৎস এই একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অনুভূতি পরবর্তীতে হতাশা, বিষণ্ণতা, আত্মহত্যা-প্রবণতাসহ বিভিন্ন ধরনের মনোদৈহিক রোগের জন্ম দেয়। অর্থাৎ এর প্রভাব শুধু মনেই সীমাবদ্ধ নয়, দুরারোগ্য নানা রোগের কারণও এই নিঃসঙ্গতা।

বিশ্বের প্রথম নিঃসঙ্গ মন্ত্রী!



যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানে পাঁচ জনে একজন একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন

অবস্থা এখন এতটাই বেগতিক যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে একাকিত্ব-বিষয়ক একজন মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন তার দেশে। এ বছরের জানুয়ারিতে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আসতে থাকে এই চমকপ্রদ খবর। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি জরিপে উঠে আসে-প্রতি পাঁচ জনে একজন নিঃসঙ্গতায় ভুগছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এর কারণ হলো ভুক্তভোগীদের দুই-তৃতীয়াংশের জীবনেই ভরসা করার মতো কোনো মানুষ নেই এবং আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার ফলেই তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে অনিরাপত্তাবোধ ও সীমাহীন শূন্যতা।

মানুষের সংস্পর্শে বাঁচুন, মেধাদীপ্ত হোন

যত বেশি মানুষের সাথে আপনার পরিচয় ও সখ্য হবে তত বাড়বে আপনার বুদ্ধিমত্তা। একথা বলছে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী *সায়েন্টেফিক আমেরিকান* (৭ মার্চ ২০১১)। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্কে নিউরোন-সংখ্যা একই থাকে, বাড়তে শুধু নিউরাল কানেক্টিভিটি বা সংযোগায়ন। নিউরোনে নিউরোনে যত বেশি সংযোগ ঘটবে, তত বাড়বে আপনার মস্তিষ্কের সামর্থ্য। নতুন নতুন মানুষ আর বৈচিত্র্যময় ধারণা আপনার মস্তিষ্কে তৈরি করবে নতুন সংযোগ পথ। আপনি ভাবতে শিখবেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। আপনি হয়ে উঠবেন চৌকস, মেধাদীপ্ত।

এগিয়ে থাকুন সুস্থতার পথে

সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের দেহে খাবার, পানি ও ঘুমের যেমন দৃশ্যমান প্রভাব রয়েছে, তেমনি সামাজিক সংযোগেরও রয়েছে বাস্তব প্রভাব। অর্থাৎ পুষ্টির খাবার যেমন সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি তেমনি দেহ-মনকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে প্রয়োজন হৃদয়তাপূর্ণ সামাজিক যোগাযোগ।

সহজ কথায়, কোনো খাবারের ছবি যেমন ক্ষুধা মেটাতে পারে না বা দেহে পুষ্টি যোগাতে পারে না, একইভাবে ভার্চুয়াল জগতে যোগাযোগও পারে না মানুষের একাকিত্ব ঘোচাতে। ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস আর আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও মানুষে মানুষে প্রকৃত সংযোগ হয় না।

কানাডীয় মনোবিদ সুজান পিংকারের গবেষণা মতে, কারো সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ ও আন্তরিক হাত মেলানোর মতো আপাত সাধারণ ঘটনায়ও ব্রেনে

অক্সিটোসিন প্রবাহের সূত্রপাত ঘটে, যা দেহে কটিসলের মাত্রা কমানোর মাধ্যমে স্ট্রেস কমায়। বাড়ায় সুখানুভূতি। তিনি বলেন, বাস্তবে পারস্পরিক যোগাযোগ মানুষের দেহে ডোপামিন হরমোন উৎপাদন করে, যা দেহে মরফিনের মতো ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। শুধু তা-ই নয়, মমতাপূর্ণ বাস্তব যোগাযোগে বাড়তে দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা।

গবেষণার উপসংহারে সুজান বলেন, পশ্চিমা বিশ্বে আত্মকেন্দ্রিকতার চর্চাই তাদের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ।

নিয়মিত সাদাকায়ন-আলোকায়নে আসুন

সম্ভবদ্বতা ও সমমর্মিতার চর্চায় ভালো থাকুন আপনিও

সময় এসেছে সচেতন হওয়ার। আমরা সৌভাগ্যবান যে, সারাদেশে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার-শাখা-সেলে প্রতি শুক্রবার আয়োজিত হচ্ছে সাদাকায়ন কার্যক্রম। সেন্টারগুলোতে প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আলোকায়ন। এসব প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনি পরিচিত হবেন নতুন নতুন মানুষের সাথে। হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশে হয়ে উঠবেন একে অন্যের ভরসাস্থল। যৌথ মেডিটেশনের পাশাপাশি পরিচিতদের সাথে আন্তরিক কুশল বিনিময় আপনাকে এগিয়ে দেবে সুস্বাস্থ্যের পথে।



হাস্যোজ্জ্বল ও সুখী মানুষের সংস্পর্শে যেমন আনন্দের অনুভূতি সঞ্চার করে, তেমনি নেতিবাচক ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মানুষের সঙ্গ একজনকে করে তোলে ক্লান্ত ও বিমর্ষ। এ বিষয়টি এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'ইমোশনাল কন্টেজিন্স' বা আবেগীয় সংক্রমণ। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা ঘটে অবচেতনভাবেই। যেমন, কাউকে হাই তুলতে দেখে অনেকের হাই তোলার উপক্রম হয়। ব্রেনের 'মিরর নিউরোন' সংক্রান্ত গবেষণায় উঠে এসেছে চমকপ্রদ সব তথ্য। এই মিরর নিউরোন অন্যের আবেগ বা কার্যকলাপ অনুকরণ করে নিজের মাঝেও সৃষ্টি করে সেই একই অনুভূতি।

আর এ কারণেই কোয়ান্টামের সাথে যারা সম্পৃক্ত হন, বাড়তে তাদের ভালো থাকার অনুভূতি। শোকরগোজার মানুষের এই সংস্পর্শে একাত্ম হয়ে বাড়তে থাকে ইতিবাচকতা, আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি। বিকশিত হয় সময়ানুবর্তিতা, সুবচন, শুদ্ধাচার ও বিনয়ের মতো গুণগুলো। তাই বলা যায়, বৈজ্ঞানিক নিয়মেই আমরা ভালো আছি। আমাদের সাথে আসুন, আপনিও ভালো থাকবেন।

তথ্যসূত্র : বিবিসি, দ্য ইকনোমিস্ট, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

কোয়ান্টাম মেথড ৪৫০ ব্যাচ ৥ গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স—নিজের যা আছে তা নিয়েই জীবন শুরু করা ও প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ২৬ বছরে এসে অনুষ্ঠিত হলো কোর্সটির ৪৫০ তম ব্যাচ। জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশের নানা প্রান্ত থেকে সমবেত কিশোর-তরুণ-প্রবীণ এতে অংশ নিয়েছেন। রোগ হতাশা ব্যর্থতা ভুলে তারা উপলব্ধি করেছেন মেডিটেশনের উজ্জীবনী শক্তিকে। তাদেরই কয়েকজনের নিরাময় ও সাফল্যের অনুভূতি এখানে দেয়া হলো।

প্রশান্তির সূত্র জেনেছি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে

আবুল হাসনাত রোবেল



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের আলোচনায় মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মেডিটেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্রেন ওয়েভ তৈরি করে সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তির জন্যে কল্যাণকর যে কমান্ড দেয়া যায়, তা সত্যিই অসাধারণ। এই বিষয়টি পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত। সম্প্রতি একটি গবেষণা দলের সাথে এ সম্পর্কিত কিছু কাজ করায় বিষয়গুলো আমার কাছে আরো বিশ্বাসযোগ্য এবং স্পষ্ট হয়েছে।

গত ১০ বছর ধরে আমার মাইগ্রেনের সমস্যা ছিল। দেশে ডাক্তার দেখিয়েছি, ভারতেও গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েক দফায় আমাকে ইনজেকশন দেয়া হলো। কিন্তু আমার মাথাব্যথা কমল না। এরপর বেলজিয়ামে পড়াশোনার জন্যে চার বছর ছিলাম। সেখানে চিকিৎসা করিয়েও কোনো লাভ হয় নি। এ কোর্সে এসে বুঝতে পারলাম, মাইগ্রেন হলো একটি মনোদৈহিক সমস্যা এবং কোর্সের এই চার দিন মেডিটেশন চর্চা করে আমার মাথাব্যথা চলে গেছে।

নিজের প্রশান্তির জন্যেও অনেক সূত্র জেনেছি এখন থেকে, যা অনুসরণ করলে জীবনে অতৃপ্তি-অশান্তি থাকবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।

[সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়]

মুঠো ভরে আর ওষুধ খেতে হচ্ছে না

শারমীন খান

সেই স্কুলজীবন থেকে আমার মাইগ্রেনের ব্যথা ছিল। ৩৫ বছরের বেশি আমি এ সমস্যায় ভুগেছি। পেশাগত কারণে প্রতিদিন আমাকে কমপক্ষে তিনটি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে হয় এবং সাধারণত ১৫ মিনিটের মধ্যে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয়ে যায়। এজন্যে নিয়মিত আমি মুঠো ভরে ওষুধ খেতাম। অথচ মেডিটেশন করে আমার মাথাব্যথা নেই। ওষুধও খেতে হচ্ছে না। এটা আমার জন্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা।

দূর থেকে আমরা অনেকেই এ কোর্স সম্পর্কে নেতিবাচক অনেক কিছু মনে করি। আমার ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে। একটানা পাঁচ বছর আমার বান্ধবী চেষ্টা করেছে যেন আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করি। আর আমিও সবসময় চেষ্টা করেছি, আমার বান্ধবী যেন কোয়ান্টাম থেকে এবং মেডিটেশন থেকে দূরে থাকে। একপর্যায়ে আমিই উদ্বুদ্ধ হয়ে কোর্সে অংশ নিলাম। এখানে এসে আমার ভুল ধারণা দূর হয়েছে। কোয়ান্টামে না এলে আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা হয়তো কখনোই উপলব্ধি করতাম না।

[এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড]



আমি আবার সামনে এগিয়ে যেতে পারব

শাহরিন রহমান

একবছর আগে আমার মা মারা যান এবং সেই থেকে আমার জীবনটা পুরোপুরি পাল্টে যায়। আমি কোনোভাবেই এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। চোখ বন্ধ করলেই মায়ের কথা মনে পড়ত। খুব ছোটবেলায় আমি বাবাকে হারিয়েছি। আমার বাবা একজন শহিদ বুদ্ধিজীবী। মা তার জীবনের সবটুকু দিয়ে আমাদের দুই ভাইবোনকে বড় করেছেন।

তার মৃত্যুর পর আমি মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছিলাম যে, ডাক্তার-ওষুধ কোনোটাই কাজ করছিল না। কারণ আমি হাসতে ভুলে গিয়েছিলাম। কাঁদতেও পারতাম না। কারো সাথে কথা বলতাম না। এমনকি আমি ক্ষুধাও অনুভব করি নি অনেক দিন। আমার স্বামী-সন্তান আশ্রয় চেষ্টা করছিল যেন আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠি।

এমন সময় আমার ছেলে কোয়ান্টাম সম্পর্কে জানতে পারে। তারই উৎসাহে আমি কোর্সে এলাম। আলোচনা এবং মেডিটেশন একপর্যায়ে আমার ভালো লাগতে শুরু করল। এখানে এসে অনেকদিন পর আমার ক্ষুধা পেয়েছে এবং কিছুটা খেয়েছি। আগে মাথাব্যথা করত, এখন তা-ও নেই।

পারিবারিক মেডিটেশনে আমি মা-কে অনুভব করেছি। কাঁদতে পেরেছি, তার জন্যে দোয়া করেছি। এখন আমি সুস্থ জীবনের বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। কোয়ান্টামের একজন সদস্য হয়ে বলতে পারি, আমি আবার সামনে এগিয়ে যেতে পারব। সত্যিই এ কোর্স আমাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন উপহার দিল।

[অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা]



কোরআনের শিক্ষাই এ কোর্সে প্রতিফলিত হয়েছে

মো. ইউসুফ



কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘...নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অনেক নেয়ামত দান করব, যদি তোমরা শোকরগোজার হও। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি হবে খুবই কঠিন।’ (সূরা ইব্রাহিম : ৭)

কোয়ান্টাম মেথড দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে এই শিক্ষাই মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে—শোকরগোজার হওয়ার শিক্ষা, কৃতজ্ঞচিত্তের শিক্ষা।

এ কোর্সের প্রতিটি আলোচনা এবং মেডিটেশনের সময় আমি বেশ মনোযোগী ছিলাম। আমি বলতে পারি, এখানে কোরআনের শিক্ষাই বার বার প্রতিফলিত হয়েছে।

শারীরিক-মানসিক সুস্থতার পাশাপাশি পারিবারিকভাবে সুখী হওয়ার পথও এখানে দেখানো হয়েছে, যা পালন করলে একজন মানুষ অবশ্যই সফল হতে পারবে। এ কোর্সে সততার গুরুত্বও বোঝানো হয়েছে সুন্দরভাবে। আল্লাহ এ সজ্ঞের সাথে আমাকে যুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন।

[প্রাক্তন আরবি ভাষা প্রশিক্ষক, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ইদগাহ সোসাইটি]

এখন আরো সুস্থ বোধ করছি

মো. আজগর

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসার আগে আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম। একেবারেই হাঁটাচলা করতে পারতাম না। সুস্থ হওয়ার জন্যে আমি প্রায় ২৫ লাখ টাকা খরচ করেছি। তবুও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোনো রোগ ধরা পড়ে নি।

এমন অবস্থায় পরিচিত একজন আমাকে কোয়ান্টামের মাটির ব্যাংক দিলেন এবং সুস্থতার নিয়তে নিয়মিত দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। আমিও দান করতে শুরু করলাম।

এর কিছুদিনের মধ্যে আবার ডাক্তার দেখালাম। এবার তিনি আমার রোগ শনাক্ত করতে পারলেন। তিনি জানালেন আমার মেরুদণ্ডে টিবি হয়েছে এবং অপারেশন করতে হবে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! সব ভালোভাবেই সম্পন্ন হলো। তখনই আমি এ কোর্সটি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কোর্সে এসে মেডিটেশন করলাম, এখন আমি আরো সুস্থ বোধ করছি। কারণ অপারেশনের পরও আমার হাতে ও পেটে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল এবং পা দুটো প্রায়ই অবশ হয়ে থাকত। আল্লাহর রহমতে এই সমস্যাগুলো এখন আর নেই। আমি বিশ্বাস করি, নিয়মিত দান করে এবং মেডিটেশন করে আমি সুস্থ হতে পেরেছি।

[মৎস্য ব্যবসায়ী]



সহকর্মীর পরিবর্তন দেখে এই কোর্সে এসেছি

টুকি চাকমা



চাকরির পাশাপাশি আমি কিছু পড়াশোনাও করি। ফলে অফিস থেকে বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর ভার্সুয়াল জগৎ তো আছেই। একটু সুযোগ পেলেই ইন্টারনেটে যেতে ইচ্ছে করত। এসব

कारणे আমার সন্তানকে সময় দিতে পারতাম না। ক্যারিয়ার ও পরিবারের প্রতি ঠিকমতো মনোযোগও দিতে পারছিলাম না।

এর মাঝে আমার এক সহকর্মীকে দেখে অবাক হলাম। আগে তাকে প্রায়ই চিন্তিত দেখতাম। কিন্তু সেদিন বেশ প্রশান্তচিত্তে কাজ করছিলেন। জানতে পারলাম, সম্প্রতি তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছেন। তার এই পরিবর্তনে আমিও আগ্রহ বোধ করি। এরপর তার সাথেই আলোকায়নে অংশ নিলাম, ভার্সুয়াল ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন হলাম। মনস্থির করলাম আমি কোর্সটি করব।

আমাকে অনেকেই বলেছে, কোয়ান্টামে কি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বিষয়গুলো শেখানো হয় বা এটা কি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের মানুষের জন্যে? কোর্সে অংশ নিয়ে বুঝলাম, ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ এখানে নেই। বরং কোর্সের প্রতিটি বিষয় সব ধর্মের সব মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয়।

[সহকারী গ্রন্থাগারিক, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়]

রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি

তাসলিমা আক্তার



দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে আমার ব্যাকপেইন ছিল। এর জন্যে বহু চিকিৎসা করিয়েছি। কোনো লাভ হয় নি। একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলাম বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করা। কিন্তু আমার ছেলে রীতিমতো জোর করে

এ কোর্সে নিয়ে এলো। কোর্সে এসে মনোযোগ দিয়ে মেডিটেশন করলাম। ধীরে ধীরে কোমরের ব্যথা কমেতে শুরু করল। কোর্স শেষে মনে হচ্ছে, ব্যাকপেইন আমার কখনোই ছিল না!

এ-ছাড়া মেডিটেশনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মনের গভীরে ডুব দিয়েছি। এতে নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো সহজেই ধরা পড়েছে। বিশেষত আমার রাগ-জ্বেরের পরিমাণ একটু বেশি ছিল, যা নিজের এবং পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করত।

মেডিটেশনে নিজের রাগ-ক্ষোভ অবলোকন করে বুঝতে পারলাম, এটা কত ক্ষতিকর। এখন রাগকে আমার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি। আসলেই কোয়ান্টাম এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নিজের ভুলগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়।

[উদ্যোক্তা]

সবার মেডিটেশন চর্চায় গড়ে উঠবে একটি সুন্দর দেশ

আহসান হাবীব



মেডিটেশন নিয়ে আমার কৌতূহল ছিল। কারণ সারা পৃথিবীতে এখন এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। ভারতেও এ নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে।

এ সম্পর্কে আমি পড়েছি এবং দেখলাম আমাদের দেশে মেডিটেশন নিয়ে কাজ করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

একসময় ভাবলাম এই কোর্সে অংশগ্রহণ করা দরকার। আমি অবশ্য একা আসি নি। আমার বড় দুই বোন এবং আমার স্ত্রী-সহ আমার চার জন এই কোর্সে অংশ নিলাম।

এখন আমার মনে হচ্ছে, এ কোর্সটি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে করাই ভালো। তাহলে পারিবারিকভাবে মেডিটেশন চর্চা করতে যেমন সুবিধা হবে, তেমনি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিষয়গুলো আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। তাই একা করার চেয়ে পরিবারের সবারই মিলে এ

কোর্সে অংশ নিলে উপকার আরো বেশি হবে বলে আমার ধারণা।

আরেকটি বিষয় আমার ভালো লেগেছে—গুরুজীকে আমার খুব হাস্যরসপ্রিয় একজন মানুষ বলে মনে হয়েছে। তার সেন্স অব হিউমার অসাধারণ। প্রতিটি আলোচনা আমি আগ্রহ নিয়ে শুনেছি। উপভোগ করেছি। কারণ আমি নিজেও রম্য-বিষয়ক লেখালেখি করি।

একসময় চীনের জ্ঞানী ব্যক্তিরা হাসতেন না। মনে করা হতো, দাঁত দেখা যাওয়া মানে সে মূর্খ বা তার জ্ঞানের অভাব রয়েছে। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। জ্ঞানী হলেই গভীর থাকতে হবে, ব্যাপারটা তা নয়। গুরুজী অনেক মজা করে গল্পের মাধ্যমে কোর্সের বিষয়বস্তু আমাদের বুঝিয়েছেন। প্রতিটি বিষয়ের সাথে তিনি একটি করে উদাহরণ যোগ করেছেন, এতে আমরা সহজেই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি।

এখন আমার চাওয়া এটাই যে, বাংলাদেশের সবারই এখানে আসুন, মেডিটেশন করুন। তাহলে নিজের তো উপকার হবেই, দেশেরও উপকার হবে। আমরা সবারই সুন্দর একটা দেশ চাই এবং এর জন্যে মেডিটেশনের দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

[স্বনামধন্য কার্টুনিস্ট ও রম্য সাহিত্যিক। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক উন্মাদ]

সুস্থতা ও কল্যাণের জন্যে কোয়ান্টামে আসুন

মো. আব্দুল হালিম মামুন



আমাকে সবসময় বসে কাজ করতে হয়। ফলে গত কয়েক মাস ধরে আমি ব্যাকপেইনে ভুগছিলাম। এ-ছাড়া সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমার হাত-পা খুব ব্যথা করত। ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত

পেইনকিলার খেয়েছি। কিন্তু ব্যথা কমে নি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে মেডিটেশন করতে শিখলাম। কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে আমি উপকার পেতে শুরু করি। এখানে ১০ ঘণ্টা বসে ক্লাস করেছি কিন্তু আগে আধা ঘণ্টা পর পর চেয়ার ছেড়ে হাঁটাইটি করতে হতো। সকালেও ঝরঝরে অনুভূতি নিয়ে ঘুম থেকে উঠছি। আমার হাত-পায়েও আর ব্যথা নেই। আরো শিখেছি, মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারের মাধ্যমে নিজের নিরাময়ের পাশাপাশি অন্যকেও নিরাময় করা যায়।

আসলে যারা দূর থেকে এ কোর্সের সমালোচনা করেন বা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, আমি মনে করি তারা কোয়ান্টাম সম্পর্কে না জেনেই কথাগুলো বলেন। তাদের অনুরোধ করব, সুস্থতা ও কল্যাণের পথে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিতে কোয়ান্টামে আসুন।

[সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, মাহাবুব গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ]

পরিবারের সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারছি

তাসনিম আহমেদ সুমিত্রা



আগে সবকিছুতেই আমি বিরক্তি বোধ করতাম। কারো সাথে কথা বলতে চাইতাম না। যে কারণে আমার মা-বাবা এবং পরিবারে সবার সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আর রাগ-ক্ষোভ তো ছিলই।

পরীক্ষার রেজাল্টও আশানুরূপ হচ্ছিল না। অথচ আগে আমি সবসময় ভালো রেজাল্ট করতাম।

একটুতেই রেগে যেতাম বলে সবারই বলত—আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। একপর্যায়ে আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করলাম এই কথাটা। সবদিক থেকে নেতিবাচকতা আমাকে আঁকড়ে ধরল।

কোর্সে এসে বুঝতে পারলাম, এতদিন ব্রেনকে আমি ভুল কমান্ড দিচ্ছিলাম, তাহলে কীভাবে পারব? আসলে ব্রেনের রয়েছে অপার ক্ষমতা। এখন আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, আমার দ্বারা আবার ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব। পরিবারে সবার সাথে এখন ভালো ব্যবহারও করতে পারছি।

প্রতিটি মেডিটেশনের পরে আমি উপলব্ধি করেছি, আমার রাগের মাত্রা কমছে আর প্রশান্তি বাড়ছে। তাই বলতে চাই, এ কোর্সে অংশ নেয়া আমার জীবনের সঠিক একটি সিদ্ধান্ত।

[শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : কোয়ান্টামে বলা হয়-যা চাই তা-ই পাব, আমি পারি আমি করব। এটা কি শিরক নয়?

উত্তর : এটা কীভাবে শিরক হলো? আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা হলে সেটাই হচ্ছে শিরক। এই যে আমরা বলি-আমি পারি আমি করব। এই 'আমি'টা কে? স্রষ্টার প্রতিনিধি। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যে অক্ষম, যার কিছু করার বা পারার সামর্থ্য নেই, প্রতিনিধির দায়িত্ব সে কীভাবে পালন করবে? এমন কেউ তো প্রতিনিধি হতে পারে না। আপনি কাকে নিজের প্রতিনিধি বানাবেন? যে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে অর্থাৎ আপনার কাজগুলো যে করতে পারবে।

যখন একজন বলছে-'আমি পারি আমি করব', তখন সে আসলে স্রষ্টার প্রতি তার কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটচ্ছে-আল্লাহ! তুমি আমাকে যে শক্তি আর পারার ক্ষমতা দিয়েছ, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তাই সবসময় মনে রাখবেন-'আমি' স্রষ্টার প্রতিনিধি। 'আমি' পারব না কেন? স্রষ্টাই তো আমাকে পারার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি চাইলে তাঁর প্রতিনিধিও পারবে। আর নিজের শক্তি ও ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো আপনাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ওপরেই বিশ্বাস স্থাপন করা।

আসলে জ্ঞানের অভাব ও ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাই। মানুষকে সত্য ও কল্যাণ থেকে শয়তান দূরে সরিয়ে রাখে এভাবেই। অতএব সবসময় সবকিছু মুক্তমন নিয়ে গুনবেন ও বিচার করবেন। তাহলে আপনি যে-কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারবেন। অন্তর্নিহিত সত্যটা বুঝতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি আমার মনছবি ঠিক করতে পারছি না। একবার মনে হয় বিসিএস পরীক্ষা দেবো। পরক্ষণেই মনে হয়, থাক, প্রাইভেট জব করব। আমি চাই-যে প্রফেশনেই থাকি, আমি যেন মানুষের কল্যাণে কিছু করতে পারি।

উত্তর : প্রথমত, একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, জীবিকাটাই জীবন নয়। গত দুশ বছরের শাসনে ইংরেজরা আমাদের মধ্যে এই ধারণাটা ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে যে, জীবন মানে শুধুই জীবিকা। অবশ্য তারা নিজেদের স্বার্থে যেটা করা দরকার মনে করেছে, সেটাই করেছে। কারণ চিন্তার গণ্ডি ও জীবনের অর্থটা ছোট করে দিলে আর হীনম্মন্য করে রাখতে পারলে মানুষকে দাস বানিয়ে রাখাটা অনেক সহজ হয়। শোষণ করা যায় সহজেই।

তাই এটা বুঝতে হবে যে, জীবিকাটাই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার জন্যে জীবিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটা জীবনের একটা অনুষঙ্গ মাত্র।

দ্বিতীয়ত, আপনি আসলে কী চান? বিসিএস দেয়ার বা বিসিএস দিয়ে পাশ করার যোগ্যতা কি আপনি অর্জন করেছেন? প্রাইভেট জবের জন্যে যে যোগ্যতা প্রয়োজন, সেটা আপনার আছে কি? আসলে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে বলে ভাবে, আকাশকুসুম কল্পনা করে। কিন্তু যোগ্যতা সৃষ্টি করে না। যদি এমন হতো, সরকারি বেসরকারি একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে

আপনার কাছে এপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে, তাহলে আপনি বলতে পারতেন যে, আমি এটা করব না ওটা করব। তাই আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কেন বিসিএস পরীক্ষা দিতে চাই? সবাই দিচ্ছে বলে? নাকি এটা আমার চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ? এর জন্যে প্রাণান্ত প্রয়াস চালানোর ইচ্ছা কি আমার আদৌ আছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর যদি আপনার কাছে থাকে, তখন আর কোনো সংশয় থাকবে না যে, আপনি কোথায় যাবেন বা কী করবেন। তা না হলে আমি যা বলব সেটা আপনার কিছুদিন ভালো লাগবে, তারপর মনে হবে-না, এটা নয়, ওটাই ভালো ছিল।

প্রশ্ন : আমি সনাতন ধর্মের অনুসারী। আমি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। আমার সহকর্মীদের সাথে আমি সালাম বিনিময় করি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, আমাদের স্কুলের দুজন ধর্মীয় শিক্ষক আমাকে সালাম দেন না এবং আমি তাদেরকে সালাম দিলেও উত্তর পাই না। তারা অত্যন্ত কৌশলে সৌজন্য প্রকাশ করেন। আমার প্রশ্ন হলো, শুধু কি ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই একে অপরের সাথে সালাম বিনিময় করতে পারবে?

উত্তর : আসসালামু আলাইকুম কথাটার অর্থ হলো, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই যে অন্যের জন্যে শান্তি কামনা-এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ এবং এটা সবাই করতে পারে। তবে সব ব্যাপারেই কিছু ভিন্ন মত আছে। কেউ হয়তো মনে করেন-না, এটা করা যাবে না।

আর ভাষা কখনো ধর্মের অংশ নয়, ভাষা হলো সংস্কৃতির অংশ। যেমন, 'শহিদ' শব্দটি এখন আর কোনো বিশেষ ধর্মের নয়, বরং শব্দটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। স্কুদিরামকেও আমরা শহিদ বলি। আবার বরকত, রফিক, জন্মারকেও আমরা শহিদ বলি। একইভাবে সালাম বিনিময়ও আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে।

আরেকজনকে শুভকামনা জানানো বা তার জন্যে দোয়া করা-এটা নিঃসন্দেহে একটি ভালো কাজ এবং প্রত্যেক মানুষ এটা করতে পারে। তবে কেউ যদি সালামের জবাব না দেন, এই দায়িত্ব তার।

প্রশ্ন : ভর্তি পরীক্ষার ভয় কীভাবে দূর করব? একমাস মেডিটেশন করলে কি লিখিত পরীক্ষায় টিকব? ভাইভা পরীক্ষায় কথা বলতে পারি না। তাই পরীক্ষা দেয়ার সাহস পাচ্ছি না। এর আগে ভাইভা থেকে বাদও পড়েছি।

উত্তর : এ ভয়টা নিশ্চয়ই একদিনের নয়। দীর্ঘদিন ধরে যে ভয় আপনার ভেতরে তৈরি হয়েছে, তা দূর করার জন্যে আপনি একমাসের টার্গেট কেন করছেন? একটা সমস্যা যেতেও তো সময় লাগে। আপনি যদি সময় নির্ধারণ করে দেন, এটা টেনশন তৈরি করে। প্রতিমুহূর্তে আপনি চিন্তা করছেন, আমার ভয়টা দূর হলো কিনা বা কতটুকু দূর হলো?

যেমন, মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে ২১ দিন সময় লাগে। এখন আপনি যদি বার বার ডিম উঠিয়ে দেখেন, তাহলে বাচ্চা ফোটার কথা থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যাবে।

আপনাকে প্রথমে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে যে-হাঁ, আমি এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। এটা কয়েক মাসে হতে পারে, কয়েক দিনের মধ্যেও হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের সেই জায়গায় আপনাকে পৌছতে হবে। যতক্ষণ আপনার মনে প্রশ্ন বা দ্বিধা থাকবে, সমস্যা দূর হবে না। তাই বিশ্বাসটাকে প্রবল করতে হবে-নিজের ওপর এবং স্রষ্টার ওপর।

সেইসাথে পড়াশোনা করবেন এবং যথাযথ প্রস্তুতি নেবেন। নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। আপনার ভেতরের যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, এটা দূর হবে এবং পড়ালেখায় মনোযোগ এনে দেবে মেডিটেশন। তখন যা পড়বেন, আপনার মনে থাকবে। পরীক্ষার খাতায় আপনি লিখতে পারবেন এবং ভাইভা বোর্ডের সামনেও কথা বলবেন আত্মবিশ্বাসের সাথে।

প্রশ্ন : আমার আত্মীয়স্বজন অনেকেই গ্রাজুয়েট। কিন্তু কোয়ান্টামের বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমার অংশ নেয়া ও লামায় যাওয়া-আসটা সবাই ভালোভাবে নেয় না। এসব ক্ষেত্রে কিছুটা মিথ্যা কথা বলা যাবে কি?

উত্তর : জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সং থাকা উচিত। কারণ সং সাহসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি ভালো কাজ করেন এবং ন্যায়ের পথে থাকেন, তাহলে কে কী বলল, তার কোনো গুরুত্ব নেই। এখন যা-ই করুক, পরে তারাই এটা ভালোভাবে নেবে, যদি আপনার মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং ইতিবাচক পরিবর্তন দেখে। আর এটা তখনই হবে, যখন আপনার বিশ্বাস আপনার জীবনের চেয়ে বড় হবে। তাই বিশ্বাসকে প্রবল করতে হবে। তাহলে আপনি সকল প্রতিকূলতা জয় করতে পারবেন।

চারপাশের অধিকাংশ মানুষই মনে করে, বেঁচে থাকাটাই জীবন। কিন্তু শুধু বেঁচে থাকাটাই জীবন নয়, কীসের জন্যে আপনি বাঁচবেন তা গুরুত্বপূর্ণ। কারো লক্ষ্য যদি জীবনের চেয়ে বড় হয়, তাহলে কোনোকিছুই তার পথে বাধা হতে পারে না।

কোয়ান্টাম সম্পর্কে যারা নেতিবাচক কথা বলে, তাদের সাথে কখনো বিতর্কে জড়াবেন না, রাগারাগি করবেন না। শুধু বলবেন, 'কোয়ান্টামে আমার ভালো লাগে। আমি শান্তি পাই বলেই সেখানে যাই। যেদিন আপনি বুঝবেন সেদিন নিজেই বলবেন, আমাকে নিয়ে চলো।' কারণ মানুষ যেখানে কিছু পায় সেখানেই তো যায়। সেই পাওয়াটা হতে পারে আত্মার পরিতৃপ্তি কিংবা মনের শান্তি।

মনে রাখবেন, জীবনে সাহসী হতে হবে। পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে। আপনার বিশ্বাস যেন হয় আপনার প্রথম ভালবাসা। যদি বলতে পারেন-আমার বিশ্বাসই আমার প্রথম ভালবাসা, আমার প্রথম প্রেম-তাহলে আপনি অমর হবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি সঠিক পথের অনুসারী।

প্রতিদিন আমার অন্তরের

আলো ও প্রশান্তি বাড়ছে।

অক্লান্ত কাজ করে যাওয়ার জন্যে চাই সুস্থতা

আবুল হায়াত

নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয় একটি নাটক ছিল *বহুব্রীহি*। ১৯৯০ সালের কথা সেটা। সেই নাটকে আমি ‘সোবহান সাহেব’ বলে একজন দানশীল ও হৃদয়বান ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম, যিনি মানুষকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন, বিপদে-আপদে আশ্রয় দেন।

নাটকটা যখন প্রচার হচ্ছিল, সে-সময় আমি একদিন বাজারে গিয়েছি। এক বৃদ্ধ ভিখারিনি এগিয়ে এসে সাহায্য চাইলেন। কিছু দেবো না জানিয়ে তাকে সরে যেতে বললাম। কিন্তু তিনি আমার পিছু ছাড়লেন না, চাইতেই থাকলেন। একসময় তার সবরকম উপরোধ-আকৃতি উপেক্ষা করে আমি যখন বাজার শেষে গাড়িতে উঠতে যাব তখন পুনরায় তার কাতর অনুরোধ—‘একটা টেহা দ্যান না বাবা।’

এবার আমি কিছুটা ধমকে উঠলাম—‘এই! যান তো যান। টাকা দিতে পারব না, যান।’ আমার বিরক্তি দেখে মহিলা হতভম্ব। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—‘টিভিতে তো দেখি কত মাইনষের কত টেহা দেন, আমারে এই একটা টেহা দিতে এত কষ্ট!’

খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। ঘটনাটা আমাকে বেশ নাড়া দিল। অভিনয়ের শক্তিটা নতুন করে উপলব্ধি করলাম। এজন্যই আমি নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কাউকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করি না। যেমন, শাশুড়ি বা পুলিশের চরিত্র। কারণ অধিকাংশ দর্শক একেই বাস্তব হিসেবে ধারণা করে বসে। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

আমার শৈশব কেটেছে চট্টগ্রামের রেলওয়ে কলোনিতে। তখন মা-বাবার সাথে বিভিন্ন নাটকের আসরে যেতাম। এভাবেই নাটকের প্রতি আমার ভালবাসা জন্মে। ১০ বছর বয়সে পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে প্রথম *টিপু সুলতান* নাটকে অভিনয় করি। তারপর স্কুল, কলেজ, কলোনির অনুষ্ঠান-অভিনয়ের কোনো সুযোগই কোথাও হাতছাড়া করি নি। কিন্তু সবার মুখে শুনতাম শুধু একটা কথা—‘এই ছেলের অভিনয় তো অভিনয়ই মনে হয় না!’

আমার খুব মন খারাপ হয়ে যেত কথাটা শুনে। এটা কি প্রশংসা নাকি অন্য কিছু বুঝতাম না। এদিকে অভিনয়ের নেশাও পেয়ে বসেছে। বুয়েটে পড়াকালীন ইউনিভার্সিটির হলে বা অন্য কোথাও নাটক হয়েছে আর আমি অভিনয় করি নি, এমনটা কখনো হয় নি।

১৯৬৭ সালে পড়াশোনা শেষ হলো। প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিলাম ঢাকা ওয়াসায়। সেটাও নাটকের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুবিধার্থেই, কারণ এ চাকরিতে ঢাকার বাইরে বদলি নেই।

এর মধ্যে জিয়া হায়দার বলে একজনের নাম শুনলাম। তিনি *নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়* নামে একটি নাট্যদল গঠন করতে যাচ্ছেন। আমি যথারীতি যুক্ত হলাম। ওখানে গিয়ে বুঝলাম—আগে যা করেছি সবই না বুঝে, না জেনে। ভেতর থেকে যা এসেছে তা-ই করেছি। কিন্তু জিয়া হায়দার—আমার নাটকের শিক্ষাগুরু—তিনিই প্রথম শেখালেন প্রকৃত অভিনয়টা আসলে কী।

তিনি বলতেন, অভিনয় না করাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অভিনয়। ছোটবেলা থেকে আমার অভিনয় যে অভিনয়ই মনে হয় না, তা শুনে কষ্ট পেতাম। অথচ *নাগরিক*কে কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম—ওটা স্রষ্টাপ্রদত্ত গুণ। আমি স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ যে, এই গুণটা আমার সহজাত। সেই থেকে আমি সবসময় একে ধরে রাখার এবং বিকশিত করার চেষ্টা করেছি।

এভাবেই আমার নাট্যচর্চা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। সেই স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী

বিশিষ্ট নাট্যজন ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দক্ষতার কারণে গত অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশি সময় ধরে তিনি দেশের সব প্রজন্মের দর্শকের কাছে বহুল জনপ্রিয়। একুশে পদকসহ নানা সম্মাননায় ভূষিত এই গুণীজনের সাহিত্যভ্রমণও বেশ সমৃদ্ধ। কবিতা, স্মৃতিকথা, গল্প, উপন্যাস, কলাম-সংকলন মিলিয়ে এ-যাবৎ তার প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ২৬। ১০ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৭৯ তম পর্বে তার আলোচনার নির্বাচিত অংশ তুলে ধরা হলো।

সময়টাতে দেশে রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি আমরা নানাভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছিলাম। পশ্চিমা অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আমরা শহিদ মিনারে, মাঠে-ময়দানে, রাস্তাঘাটে নাটক করতাম।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ আমাদের একটি নাটক মঞ্চস্থ করার কথা ছিল—*রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য*। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার আগেই আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। একপর্যায়ে কোমায় চলে গেলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখি—ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমি একা শয্যাশায়ী। ডাক্তার-নার্স কেউ নেই। দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শুনলাম আমার মেয়ে বিপাশা জন্মগ্রহণ করেছে। তখনও আমি ওকে দেখি নি।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে না পারার বেদনা তো ছিলই, সেইসাথে যে ঘটনাটা আমাকে ভীষণ ব্যথিত করল সেটা হলো, প্রফেসর ডা. ফজলে রাব্বীর মৃত্যু। ১৫ ডিসেম্বর তিনি স্বাধীনতা-বিরোধীদের হাতে অপহৃত ও নিহত হন। মাসকয়েক আগে তার চিকিৎসাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।

স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্রেও অভিনয় শুরু করি। ১৯৭২ সালে আমার প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়। ছবিটা ছিল বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম*।

পরবর্তীতে শিশুদের নিয়ে আমি কিছু নাটক রচনা ও নির্মাণ করেছি। কাজটা আমি উপভোগ করেছি। শিশুদের মনটাকে আমি বুঝতে চেয়েছি। আমরা শিশুদের বুঝি না, কারণ বুঝতে চাই না। ওদের ওপর জোর খাটাতে গিয়ে নানা মানসিক চাপ সৃষ্টি করি। এ ব্যাপারে আমি সচেতন হয়েছি আমার বাবাকে দেখে। আমার বাবা ছিলেন একজন সব্যসাচী মানুষ। বিচিত্র বিষয়ে ছিল তার জ্ঞান ও আগ্রহ। তিনি আমাকে বাগান করা, ছবি আঁকা, মাছ ধরা শিখিয়েছেন। কিন্তু কখনো কিছু চাপিয়ে দেন নি।

যে শিশুদের নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম তারা অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। আমার খুব ভালো লাগে যে, অভিনয়ের পাশাপাশি কিছু শিল্পীও তৈরি করতে পেরেছি। জীবনের এ পর্যায়ে এই কাজগুলোই করতে চাই। নিজে যা শিখেছি, যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেটা ছড়িয়ে দিতে চাই। আর অক্লান্ত কাজ করে যাওয়ার জন্যে দরকার সুস্থ থাকা।

নিজেকে সুস্থ রাখতে আমি কিছু বিষয় মনে চলি। বাইরের কোনো খাবার আমি খাই না। ফাস্টফুড তরুণদের খুব পছন্দ, কিন্তু ফাস্টফুড ও চিনি দুটোই বিষ। চিনির উৎস হতে পারে ফল। বাংলাদেশের ওপর স্রষ্টার বিশেষ রহমত—আমাদের এত বিচিত্র ফল রয়েছে। এবং যে সময়ে যে ফল পাওয়া যায় সেই ঋতুর রোগের প্রতিষেধকও সেই ফল।

আর একটা কথা আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি—আমার কাজ ও পরিবার নিয়েই আমার জীবন। কাজের বাইরে যতটুকু সময়, সেটা আমার পরিবারের। আমার জীবনে কোনো আড্ডা বা ক্লাব কিছুই নেই।

কোয়ান্টামের একটা কথা আমার বেশ পছন্দের—*রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন*। ব্যক্তিগত জীবনেও এটা প্রয়োগ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আজ সমাজে বিশেষ অবদান রাখছে। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে বহু মানুষ যোগ দিয়েছে কোয়ান্টামের এই মিলনমেলায়। এখানে এসে প্রশান্ত হওয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ তার ভেতরের শক্তিকে উপলব্ধি করেন। ফলে তিনি যেমন উপকৃত হচ্ছেন, এগিয়ে যাচ্ছে জাতিও।

অনুলিখিত

সন্তানের ফ্রিন-আসক্তি ॥ আপনি কতটুকু সচেতন?



সন্তানের দুরন্তপনা সম্পর্কে আপনি অবগত। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে আছেন নিশ্চিন্তে। কিন্তু সে স্কুলে যেতে শুরু করলে ক্রমশ দৃশ্যমান হতে লাগল তার অস্বাভাবিক কিছু আচরণ—

অমনোযোগিতা, অগোছালো স্বভাব, অস্থিরতা ও জিনিসপত্র হারানো এবং সব কাজই অসমাপ্ত। স্কুলে তার ফলাফলও সন্তোষজনক নয়। শিক্ষকরাও অভিযোগ জানাচ্ছেন। এর মধ্যে একজনের কাছে গুনলেন এডিএইচডি সম্বন্ধে। যার সব উপসর্গই যেন মিলে যাচ্ছে সন্তানের সঙ্গে।

এডিএইচডি (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)। সহজ করে বললে নিজের মনোযোগের ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকার এক বিভীষিকাময় রোগ। মনোযোগ ধরে রেখে গভীরভাবে ভাবতে পারে না বলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত হয় ভুল, কাজ হয় এলোমেলো। ইদানীং এটি যেন পরিণত হয়েছে এক মহামারীতে। আগে দুয়েকজন এ রোগে আক্রান্ত শোনা গেলেও এখন বিশ্বব্যাপী এ এক আলোচিত বিষয়।

যখন থেকে এ মহামারীর শুরু

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ স্মার্টফোন আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে ২০০৭ থেকে। এরপর পরিলক্ষিত হয় বিশেষ কিছু পরিবর্তন—

কমতে শুরু করে শিক্ষার্থীদের

স্যাট স্কোর : যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ বোর্ডের রিপোর্ট মতে, ২০০৭ থেকে সে-দেশের শিক্ষার্থীদের গাণিতিক সমস্যা সমাধান ও লেখনী দক্ষতার গড় স্যাট স্কোর কমতে শুরু করে। ২০১৬-তে এসে শিক্ষার্থীদের স্যাট স্কোরের গড় দাঁড়ায় ৪৬ বছরের ইতিহাসে সর্বনিম্নে!

বাড়ছে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা : যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, সে-দেশে ২০০৭-এর চেয়ে ২০১১-তে এডিএইচডি আক্রান্ত শিশুর (২-৫ বছর বয়সী) সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫০ ভাগ।

স্মার্টফোন ও সব ধরনের ফ্রিনই মূলত দায়ী

স্মার্টফোন ও ফ্রিন-আসক্তি শিশুর অস্থিরতার জন্যে আসলেই দায়ী কিনা, তা নিয়ে জার্নাল অব দ্য আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন একটি গবেষণা করে। লস অ্যাঞ্জেলেসের ২,৬০০ জন হাই স্কুল শিক্ষার্থীকে তারা পর্যবেক্ষণের জন্যে বেছে নেয়, যাদের ফ্রিন-আসক্তি একেবারেই নেই।

দুবছর তাদের বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়। এতে দেখা যায়, ৮১% শিক্ষার্থীই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। মাত্রাতিরিক্ত আসক্তদের ৫৩% আক্রান্ত

হয়েছে এডিএইচডি-তে। (সূত্র : এনবিসি নিউজ, ১৭ জুলাই ২০১৮)

চাই আশু সচেতনতা

দুরন্ত মানাই যে শিশু এডিএইচডি-তে ভুগছে তা নয়। আবার এসব উপসর্গ অবহেলা করারও সুযোগ নেই। তাই আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। আপনার সন্তান ফ্রিনের সামনে যত বেশি সময় থাকবে, তার মনোযোগ হবে তত বিক্ষিপ্ত। ফ্রিন-আসক্তির এ চক্রান্ত থেকে তাকে বাঁচাতে পারে আপনার সচেতন উদ্যোগ।

শিশুর বিকাশে মনোযোগী হোন

শিশুকে খেলাধুলা, দৈহিক পরিশ্রম ও ঘরের কাজে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করুন। বাস্তব জীবনমুখী হলে সে ভার্চুয়াল জগতে আসক্ত হবে না। আর বয়স ১৮ হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন দেবেন না।

এর পাশাপাশি শিশুকে বই পড়তে ও সেবামূলক কাজে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করুন, যা তার কল্পনাসক্তি ও মেধাকে শাণিত করবে। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে শিশু সন্তানকে সাথে নিয়ে অংশ নিন।

শিশু বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন

ফ্রিন-আসক্তিতে মেধানাশ

ডা. আহমদ মরতুজা চৌধুরী



ফ্রিনে অভ্যস্ত শিশু ভার্চুয়াল জগৎ ও বাস্তবতার মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। বাস্তবতা বোঝার জন্যে শিশুর মস্তিষ্কে নিউরোনের যে সংযোগগুলো তৈরি হওয়া প্রয়োজন, ক্রমাগত ফ্রিনে তাকিয়ে থাকার ফলে তা হয় না। ফলে আবেগ-অনুভূতির ঘাটতি ও অসামাজিকতা দেখা যায় তার মাঝে।

মেধার প্রকৃত বিকাশের জন্যে মানুষ ও বাস্তব জিনিসের সংস্পর্শ প্রয়োজন। বই থেকে একটি কবিতা পড়ে শিশু তা কল্পনার রঙে রাঙায়। কখনো একটি লাঠিকে খেলনা বানিয়ে খেলে। এসবের মধ্য দিয়ে বাড়ে তার কল্পনাসক্তি। পরবর্তীতে সে পড়াশোনায়ও ভালো করে।

শিশুকে যদি ফ্রিনের সামনে বসিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করা হয়, কান্না থামাতে হাতে স্মার্টফোন দেয়া হয় তবে ক্রমেই সে আসক্ত হয়ে পড়ে। এই আসক্তিই শিশুর মেধানাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও লেখক। সাবেক সহযোগী অধ্যাপক, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল]

এসব আসক্তি থেকে আগে মা-বাবাকে মুক্ত হতে হবে

অধ্যাপক ডা. মনীষা ব্যানার্জী



বয়স বেড়েই চলেছে অথচ বাচ্চা কথা বলছে না—এই সমস্যা নিয়ে অভিভাবকরা প্রায়ই আমাদের কাছে আসছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের কথা না বলার অন্যতম কারণ ফ্রিনের সামনে

মাত্রাতিরিক্ত সময় কাটানো।

ফ্রিনের সামনে শিশুদের কথা বলার কোনো প্রয়োজন হয় না, তারা শুধু দেখেই যায়। ফলে যোগাযোগটা হয় একমুখী। বাস্তবে পারস্পরিক ভাব বিনিময় হয় না বলে শিশুর ভাষাগত দক্ষতাও সৃষ্টি হয় না। ফলে সে কথা বলতে শেখে না।

তাই মা-বাবাকে আগে ফ্রিন-আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হবে। এতে তারা সন্তানকে যেমন সময় দিতে পারবেন তেমনি তাকে ফ্রিন থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধও করতে পারবেন।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, নবজাতক ইউনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল]

ফ্রিন থেকে দূরে রাখলেই আসবে ইতিবাচক পরিবর্তন

অধ্যাপক ডা. আবদ হোসেন মোল্লা

শিশুদের মধ্যে অটিজম ও এডিএইচডি-র মতো অসুস্থতার হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে অভিভাবকরা এসব সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসেন, আমরা গবেষণায় দেখেছি, ৮৩% শিশুরই অসুস্থতার কারণ হলো ফ্রিন-আসক্তি।



এ শিশুদের শুধু ফ্রিন থেকে দূরে রেখেই আমরা তাদের আচরণে লক্ষ্য করছি ইতিবাচক পরিবর্তন। টিভি, মোবাইল, ট্যাবের সামনে বাচ্চাকে বসিয়ে মা-বাবা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। ভুলটা হয়ে যায় এখানেই। সন্তানের জন্যে সম্পদ গড়তে গিয়ে সেই সন্তানই যদি অসুস্থ হয়ে যায় তবে কী হবে সম্পদ দিয়ে? সন্তানকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে যথাযথ সময় দেয়া উচিত। কারণ সন্তানই মা-বাবার প্রকৃত সম্পদ।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল]



সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম

২০১৮ : লক্ষাধিক ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম অতিক্রম করল আরেকটি মাইলফলক। বছর পেরোনোর আগেই অর্জিত হলো এক লক্ষ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা (৪ ডিসেম্বর ২০১৮)। কোয়ান্টাম ল্যাব প্রতিষ্ঠার ১৮ তম বছরে এটি সম্ভব হয়েছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে তালিকাভুক্ত তিন লক্ষাধিক রক্তদাতার নীরব ও নিঃস্বার্থ দানের ফলে। সেইসাথে নেপথ্যস্থিতি হিসেবে দিনরাত নিরলস কাজ করে গেছেন রক্তদান কার্যক্রমের সকল স্তরের কর্মী। এ সাফল্যের সবটুকুই পরম করুণাময়ের করুণা এবং রক্তদানের সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত অগণিত মানুষের সজ্জবদ্ধ প্রচেষ্টার ফসল।

বাংলাদেশে নিরাপদ ও সুস্থ রক্তদান আন্দোলনে নব দিগন্তের সূচনা করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। রক্তদান কার্যক্রম ১৯৯৬ সালে শুরু হলেও ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কোয়ান্টামের নিজস্ব ল্যাব। ল্যাব প্রতিষ্ঠার আগে রোগীর প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্লিনিকে ও হাসপাতালে গিয়ে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা রক্তদান করতেন।

পরবর্তীতে নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতেই প্রতিষ্ঠা করা হয় নিজস্ব ল্যাব। ২০০৩ সালে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ করা হয় কোয়ান্টাম ল্যাব। ফলে মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট, প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা, প্লাটিলেট পুওর প্লাজমা, এফএফপি, ফ্রেশ প্লাজমা, ক্রায়ো-প্রিসিপিটেট, আরসিসি-সহ রক্তের সকল উপাদান সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

রক্তগ্রহীতা ও রক্তদাতাদের জন্যে কোয়ান্টাম ল্যাবে দিনরাত ২৪ ঘন্টা সেবাদান শুরু হয় ২০০৫ সাল থেকে। নিরাপদ রক্ত সরবরাহকে আরো গতিশীল ও বিস্তৃত করতে বছরে ৩৬৫ দিনই ল্যাব খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ২০১২ সালে।

কোয়ান্টামের অন্যান্য সেবা কার্যক্রমের মতোই স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে। সূচনালগ্ন থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত পাঁচটি মৌলিক ক্রিনিং সম্পন্ন করে নিরাপদ রক্ত প্রদানের ব্যাপারে আপসহীন মনোভাব পোষণ করে আসছে কোয়ান্টাম ল্যাব। ফলে অল্পদিনেই মুমূর্ষের পরিবার ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বিবেচনায় কোয়ান্টাম ল্যাব সরবরাহকৃত রক্ত হয়ে ওঠে আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক।

এর পাশাপাশি সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে রক্তদাতাদের সম্মানিত করার কাজটিও করছে কোয়ান্টাম। নিয়মিত সংযোগায়নের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে তিন লক্ষ ৪১ হাজার রক্তদাতার এক বর্ষিষ্ণু পরিবার। নিবেদিতপ্রাণ এই দাতারাই হলেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অর্থাৎ তরুণ প্রজন্মকে নিয়মিত রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে ২০০৮ সালে শুরু হয় অজেয় ১৯ কার্যক্রম। ১৯ তম জন্মদিনকে রক্তদানের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় করে রাখার আহ্বান নিয়েই এ কর্মপ্রয়াস।

রক্তদান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে এবং সমাজের সকল মানুষকে সচেতন করে তুলতে নিয়মিত নানা স্থানে আয়োজন করা হয় ব্লাড ক্যাম্প। ২০১২ সালে সংযোজন করা হয় মোবাইল ব্লাড ক্যাম্প। এর মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে আমাদের দেশের প্রথম মোবাইল ব্লাড ক্যাম্প।

এভাবেই নিরাপদ রক্ত পরিস্থগলনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে কোয়ান্টাম গ্রহণ করেছে সমন্বয়যোগী নানা পদক্ষেপ। ফলে নিয়মিত রক্তের চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে দেশের যে-কোনো দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।



সাফল্যের নেপথ্যে সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও টিমওয়ার্ক

ল্যাব প্রতিষ্ঠার বছর ২০০০ সালে কোয়ান্টাম সরবরাহ করেছে ১,৫৬৪ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। আর ২০১৮ সালে সরবরাহ করা সম্ভব হলো ১ লক্ষ ইউনিট। এ সাফল্যের মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে—

সমন্বয়বর্তিতা : কোয়ান্টাম ল্যাব শুরু থেকেই সময়কে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে প্রতিটি কাজে। কর্মীদের উপস্থিতি, কর্মতৎপরতা এবং রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহের সবগুলো ধাপে সময়ের ছন্দই এ সাফল্যের প্রথম ভিত্তি।

বিশ্বাস ও পরিশ্রম : মুমূর্ষ মানুষকে বাঁচাতে একবছরে লক্ষ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করা সম্ভব—এ কথাটি কর্মীরা বিশ্বাস করেছেন এবং এই লক্ষ্যে অক্লান্ত কাজ করেছেন।

দক্ষতা বাড়ানো : টেকনিক্যাল কাজগুলোতে যতটা সম্ভব নির্ভরতা কমিয়ে কর্মীরা নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। ফলে

কাজে গতির সঞ্চার হয়েছে অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

সহযোগিতা সবার সাথে : বছরজুড়ে সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে কাজ করে গেছে ব্লাড ক্যাম্প, মোবাইল ক্যাম্প, ল্যাব এবং রক্তদান-সংশ্লিষ্ট সবগুলো টিম। কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—সহযোগিতা সবার সাথে, প্রতিযোগিতা নিজের সাথে।

সমন্বয়যোগী পদক্ষেপ : আমাদের দেশে সাধারণত জুন-আগস্ট মাসে দেখা দেয় ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ। শীতের শুরু মৌসুমে অগ্নিদগ্ধ রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। এবছর আগে থেকেই রোগভেদে প্রয়োজনীয় রক্ত উপাদানগুলো সরবরাহের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

গীবত ও পরচর্চা বর্জন : যেখানে গীবত, পরনিন্দা ও পরচর্চা করা হয়, সেখানে আল্লাহর রহমত থাকে না। তাই কাজেও বরকত আসে না। তাই গীবত ও পরচর্চা বর্জনে সচেষ্ট থেকেছেন সবাই।

নিরাময় ও সাফল্যে উদ্ভাসিত সিকি শতাব্দী

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আমরা যে সিলেবাস অনুযায়ী পড়াই, সেগুলো অধিকাংশই তাত্ত্বিক। এগুলো তাদের ব্যক্তিজীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কীভাবে কাজে লাগতে হবে তা পড়ানো হয় না। তাই কোয়ান্টাম মেথডে আত্ম উন্নয়নের যে পদ্ধতি শেখানো হয়েছে, তা শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত হলে শিক্ষার্থীরা নিজেকে ও সমাজকে উন্নত করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

অধ্যাপক ড. বশির আহমেদ • অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৩৭ ব্যাচ

আমার ছিল শোল্ডার পেইন। এজন্যে সবসময় পেইনকিলার খেতে হতো। কোর্সে মেডিটেশন করে আমি আর ব্যথা অনুভব করছি না। আসলে মনের বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই ব্যথাগুলো হচ্ছিল। যেমন, আমার রাগের পরিমাণটা বেশি ছিল, যা এখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি।

আফরোজা ইয়াসমীন • সহকারী অধ্যাপক, সরকারি মোহাম্মদপুর মেডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। ৪৫১ ব্যাচ

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের প্রতিটি বক্তব্য এবং মেডিটেশনের পেছনে রয়েছে সঠিক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, যা একজন মানুষের কল্পনার শক্তিকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। শরিয়তের সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা এ কোর্সের মাধ্যমে অনেকের মনোদৈহিক সমস্যাগুলো দূর করেছেন।

মুফতি মো. আবুল কালাম কাহেমী • শাইখুল হাদীস, ফাতেমাতুজ্জোহরা মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া। ৪৪৪ ব্যাচ

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বরবরে অনুভূতি আমি কখনো পেতাম না। কারণ রাতের ঘুমটা গভীর হতো না। কিন্তু মেডিটেশন করার পর থেকে আমার ঘুম খুব ভালো হচ্ছে। এ কোর্সে এসে আমার মনে হয়েছে, তরুণদের এখানে বেশি আসা উচিত। কারণ তারা এখানে নৈতিকতার শিক্ষা পাবে।

কল্পনা রাণী রায় • অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ৪৫২ ব্যাচ

আমার জানামতে, মনোদৈহিক রোগগুলোর সুস্থতার জন্যে কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। এজন্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মেডিটেশন চর্চার প্রয়োজন, যা এ কোর্সের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ সহজে শিখতে পারে। মেডিটেশন হলো একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন চিকিৎসা।

ডা. জেসমীন আক্তার লীনা • কনসালট্যান্ট, চর্মরোগ বিভাগ, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ঢাকা। ৪৪৯ ব্যাচ

আমি স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটে আসক্ত ছিলাম। আগে ২৪ ঘণ্টাই আমার স্মার্টফোনে ইন্টারনেট চালু থাকত। কিন্তু কোর্সে এসে আমি ভার্যুয়াল ভাইরাসের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জেনেছি এবং সচেতন হয়েছি। মেডিটেশন করে আমার হাইপারটেনশন ও এলার্জির সমস্যাও ভালো হয়েছে।

দিপক দেব নাথ • শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, জেনেটিক্স এন্ড প্র্যান্ট ব্রিডিং বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর। ৪৫১ ব্যাচ

১৯৯৩ সালে কোয়ান্টাম মেথডের যাত্রা শুরু হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে ২৬ বছরে সম্পন্ন হয়েছে এ কোর্সের ৪৫২টি ব্যাচ। এতে অংশ নিয়েছেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা-বয়সের লাখো মানুষ। মেডিটেশনের মাধ্যমে তারা অর্জন করেছেন প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য। সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছেন জীবনের লক্ষ্য। তাদেরই কয়েকজনের কোর্সে অংশগ্রহণের অনুভূতি দেয়া হলো।

আমার গলার একটি সমস্যার জন্যে সিঙ্গাপুরে ডাক্তার দেখালাম। তিনি আমাকে মেডিটেশন করতে শেখালেন। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে যখন শিথিলায়ন মেডিটেশনটি করলাম, আমার উপলব্ধি হলো, তা সিঙ্গাপুরে শেখানো মেডিটেশনের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। শিথিলায়ন করে অনেক বেশি রিল্যাক্সড হওয়া যায়।

অধ্যাপক মোহা: আলগুগী • চারুকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৪৭ ব্যাচ

হঠাৎ করেই এবছর আমার হার্টে কিছু সমস্যা হয় এবং দুটি রিং লাগাতে হয়। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে এমন অসুস্থতা আমাকে হতাশ করে তুলেছিল। এমন অবস্থায় আমার এক সহকর্মী এ কোর্সের কথা বললেন। এখানে এসে আমি জীবনে সুখী হওয়ার গাইডলাইন পেলাম। এটি একটি জীবনভিত্তিক কোর্স। এখন আমি শারীরিক-মানসিকভাবেও বেশ প্রাণবন্ত অনুভব করছি।

মো. মনিরুজ্জামান মনির • হেড অব মার্কেট রিসার্চ, এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লি। ৪৫১ ব্যাচ

নিজের জন্যে আমি সবসময় দোয়া করতাম, আমার রাগটা যেন কমে যায়। কারণ রাগ কখনোই ভালো কিছু বয়ে আনে না। এতদিন পারি নি। কিন্তু কোর্সে এসে মেডিটেশন করে মনে হচ্ছে, রাগটা এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আর মেডিটেশনের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছি নিজেকে, অনুভব করেছি অন্যরকম প্রশান্তি।

অধ্যাপক তানজিদা হোসেন • রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা। ৪৫১ ব্যাচ

নিজেকে আমি সবসময় একজন লক্ষ্যভিসারী মানুষ মনে করতাম। কিন্তু এ কোর্সটি করে উপলব্ধি করলাম, এতদিন আমার লক্ষ্যগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমি তা সুনির্দিষ্ট ও একত্র করতে পেরেছি। এ-ছাড়া সন্তান লালনে এবং পারিবারিক জীবনের জন্যেও কিছু চমৎকার দিক-নির্দেশনা পেয়েছি।

শিবলী হুসাইন আহমদ • বিভাগীয় প্রধান, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন বিভাগ, ডেকো ফুডস লি। ৪৪৮ ব্যাচ

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে যা শুনলাম, দেখলাম-এটা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত এবং ইসলামসম্মত বলে আমি বিশ্বাস করি। ব্রেনের কার্যপ্রক্রিয়ার আলোকে গুরুত্বী যেভাবে কোয়ান্টাম মেথডকে ব্যাখ্যা করেছেন, তা অতুলনীয়।

অধ্যাপক ডা. এ. এস. এম. বজলুল করিম • বিভাগীয় প্রধান, শিশু পুষ্টি ও পরিপাকতন্ত্র বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫০ ব্যাচ

পড়াশোনা বা কর্মজীবনে একটু সমস্যা দেখা দিলেই আমি নেতিবাচক হয়ে যেতাম। মনে হতো আমি কিছু পারব না। কিন্তু এখানে এসে উপলব্ধি করেছি, আমার যা আছে তা নিয়ে আমি সামনে এগিয়ে যাব। আমার কী নেই-সেদিকে আর তাকাব না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমি শোকরগোজার হতে শিখলাম।

ডা. জান্নাতুল মাওয়া গুদা • ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিভাগে কর্মরত। ৪৫২ ব্যাচ

২০০৩ সালে আমি সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড বইটির সাথে প্রথম পরিচিত হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্যে আমি মনছবির মেডিটেশন চর্চা করি এবং ভর্তির সুযোগ পাই। সাফল্যের সাথে পড়াশোনা শেষ করি। কিন্তু কর্মজীবনে এসে আমার ব্যাকপেইন আর এসিডিটির সমস্যা শুরু হয়। এজন্যে প্রচুর ওষুধ খেতে হয়েছে। এ কোর্সে এসে মেডিটেশন করে আমি আর কোনো ব্যথা অনুভব করছি না। কোর্সে এসে সরাসরি মেডিটেশন করার অনুভূতিই আলাদা।

মো. তারিকুল ইসলাম • প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। ৪৫১ ব্যাচ

আমার হাঁটুতে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা করত। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো রোগ ধরা পড়ছিল না। এক ডাক্তারের পরামর্শে এ কোর্সে এলাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! মেডিটেশন চর্চা করে সত্যিই এখন কোনো ব্যথা নেই। এ-ছাড়া এখানে এসে আমি একটি পরিবার পেয়েছি-কোয়ান্টাম পরিবার।

তাস্মিন আরা • গৃহিণী। ৪৫১ ব্যাচ

আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আমার অনেকটা সময় নষ্ট হতো। এমনও হয়েছে, দিনে টানা ছয় ঘণ্টা ইন্টারনেটে ব্যয় করেছি। পড়াশোনার প্রতি আমার মনোযোগ দিন দিন কমে যাচ্ছিল। এ কোর্সে এসে আমি সচেতন হয়েছি। বায়বীয় জগৎ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি।

জয়শ্রী রায় জয়া • শিক্ষার্থী, অনার্স, ইংরেজি বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম। ৪৪৯ ব্যাচ

পড়াশোনা ভালোমতো করলেও আমার মধ্যে এক ধরনের পরীক্ষাভীতি কাজ করত, যা মেডিটেশনের মাধ্যমে দূর হয়েছে। আগে মা-বাবার সাথে আমি অহেতুক তর্কে জড়িয়ে যেতাম। আর এখন আমি তাদের সালাম দেই এবং ভালো ব্যবহার করি।

মো. মাসনুন আমিন খাঁন • শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ। ৪৫২ ব্যাচ

চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৯১ জন



বান্দরবান রাজবিলায় চক্ষু চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে এ পর্যন্ত সেবা পেয়েছেন ১,৫৩৫ জন। চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে ২০৪ জনের। অন্যান্য চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম শুরু হয় ২০১০ সালে। সেবা পেয়েছেন ৩৮,৫৭৬ জন স্থানীয় অধিবাসী।



সাত বছরের আলতাজ খাতুন। এ শিশুটির পুরো পৃথিবীই ছিল অন্ধকার। সবাই জানত সে জন্মান্ন। তার পরিবারও এতটাই দরিদ্র ছিল যে, কোনো চিকিৎসাই করানো সম্ভব হয় নি তাদের পক্ষে। আলতাজ আর কোনোদিন পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না, এটা একরকম মেনেই নিয়েছিল সে ও তার পরিবার।

২০১৭-এর শুরুতে বান্দরবানের রাজবিলায় কোয়ান্টামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি মেডিকেল ক্যাম্প। নিজের চিকিৎসার জন্যে ওখানে এসেছিলেন আলতাজের মা, সাথে এসেছিল আলতাজও। মূলত কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের উৎসাহেই সেদিন ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিশুটির চোখ পরীক্ষা করেন। এই প্রথম মা জানতে পারলেন, আলতাজ জন্মেছিল আর দশটি শিশুর মতো স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি নিয়েই। কিন্তু চোখে ছানি পড়ার কারণে এতদিন সে কিছুই দেখে নি।

চিকিৎসক অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। পরবর্তীতে ফাউন্ডেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রামের একটি চক্ষু-হাসপাতালে তার অপারেশন হয়।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! সফল অপারেশনের পর এখন সে সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে দেখছে।

লামায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ২০১৯

বান্দরবান লামায় আগামী ৪ জানুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প



৫ জানুয়ারি ২০১৮ বান্দরবান লামার কোয়ান্টামে আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা কোয়ান্টাম পরিবারের ১১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এ ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন পাহাড়ি-বাঙালি তিন সহস্রাধিক রোগী। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীদেরকে বিনামূল্যে মোট এক লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৪৩ ইউনিট ওষুধ বিতরণ করা হয়।

৮,০২৪ জন প্রসূতি মা পেয়েছেন চিকিৎসা ও পুষ্টিসেবা

গর্ভবতী মায়ের সুস্থতা ও শিশুর নিরাপদ জন্মদানকে নিশ্চিত করতে ২০০৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শুরু হয় মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম। এ পর্যন্ত ৮,০২৪ জন মা মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় পেয়েছেন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, জন্ম দিয়েছেন সুস্থ-সবল শিশু।

গর্ভকালীন সময়ের তৃতীয় মাস থেকে সন্তান জন্মদান পরবর্তী ৪০ দিন পর্যন্ত মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে সেবা পেয়ে থাকেন সুবিধাবঞ্চিত মায়েরা। এ সময় তাদের নিয়মিত চেকআপের পাশাপাশি জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও ওষুধের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এ-ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা হয় গর্ভকালীন সময়ে মা ও শিশুর যত্নের বিষয়ে।

সমৃদ্ধ দেশ গড়তে মা ও শিশু উভয়ের সুস্থতাই অপরিহার্য। এই বিশ্বাস থেকেই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সজ্জবদ্ধ দানে এক যুগ ধরে পরিচালিত হচ্ছে এ সেবামূলক কার্যক্রম।



চট্টগ্রামে মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় সেবাপ্রাপ্ত মা ও তাদের সন্তানদের একাংশ

শিক্ষা খেলাধুলা ও বহুমুখী সাফল্যে প্রত্যয়দীপ্ত ওরা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ব্যান্ডদল পরিদর্শন করছেন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ২৬ মার্চ ২০১৮

স্বাধীনতা দিবস কুচকাওয়াজে পর পর চার বার প্রথম স্থান অর্জন

২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২৬ মার্চ ২০১৮ ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশের কুচকাওয়াজে টানা চতুর্থ বার প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ।



জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৮-র সমাপনী অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি-র কাছ থেকে যন্ত্র সংগীত পর্বে প্রথম স্থান অর্জনের পুরস্কার নিচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী অর্কন চাকমা।

২০১৮ সালে ক্রীড়ায় উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন

- ◆২য় জাতীয় যুব আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপ : অনুর্ধ্ব-১৮ একক ইভেন্টে স্বর্ণপদক
- ◆৩৪ তম জাতীয় জুনিয়র এথলেটিক্স প্রতিযোগিতা : ২টি স্বর্ণপদক ও ১টি রৌপ্যপদক
- ◆১ম বিকেএসপি কাপ টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা : অনুর্ধ্ব-১৬ একক ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন
- ◆কিউট প্রিমিয়ার লিগ হ্যান্ডবল : চ্যাম্পিয়ন
- ◆১ম বাংলাদেশ যুব গেমস : হ্যান্ডবল ও কাবাডিতে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন (১৩টি স্বর্ণপদক)
- ◆৪৭ তম জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা : হ্যান্ডবল ইভেন্টে বালক দল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং বালিকা দল আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন (গ্রীষ্মকালীন), টেবিল টেনিস ইভেন্টের দ্বৈতে পর পর তিন বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন (শীতকালীন)

জাতীয় বয়সভিত্তিক জিম্নাস্টিকস প্রতিযোগিতা :

- ২০১৭ : ১১টি স্বর্ণসহ ৩২টি পদক
- ২০১৬ : ৯টি স্বর্ণসহ ২৯টি পদক
- ২০১৫ : ৩টি স্বর্ণসহ ২২টি পদক
- ২০১৪ : ৩টি স্বর্ণসহ ১০টি পদক

১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবসের প্যারেড ও ডিসপ্লেতে প্রথমবারের মতো অংশ নেয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের মেয়ে শিক্ষার্থীরা। অর্জন করে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার। উল্লেখ্য, কোয়ান্টাম শিশুসদনে উদারনৈতিক শিক্ষা ও সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে উঠছে ৩২৬ জন মেয়েশিশু।

মেধার কোনো জাত-পাত-ধর্ম নেই। উপযুক্ত সুযোগ পেলে মেধার বিকাশ ঘটতে পারে যে-কেউ। এ বিশ্বাস থেকেই বান্দরবানের লামায় দুর্গম জনপদে দেড় যুগ আগে যাত্রা শুরু করেছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জীবন শুরু করেছিল শূন্য থেকে। আজ এই শিশুরাই দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে মনছবির পথে। বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় মেধাস্থান অর্জন করেছে কোয়ান্টাম কসমো কলেজের ২৩ জন শিক্ষার্থী কোয়ান্টা।

পাবলিক পরীক্ষায় কোয়ান্টাদের সাফল্য

২০১৮ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৩৪ জন কোয়ান্টাই সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সাত জন এ প্লাস এবং ২২ জন এ গ্রেড পেয়েছে। এইচএসসি-তে এবছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথমবারের মতো ২২ জন কোয়ান্টা পরীক্ষা দেয় এবং শতভাগ উত্তীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে দুই জন এ প্লাস এবং ১৩ জন এ গ্রেড পেয়েছে।

২০১৭ সালের পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের পাশের হার শতভাগ। এসএসসি পরীক্ষার্থী ৩১ জন কোয়ান্টার মধ্যে ২৪ জন এ গ্রেড পায়। এইচএসসি পরীক্ষার্থী ১৪ জনের মধ্যে একজন এ প্লাস, নয় জন এ, চার জন এ মাইনাস গ্রেড অর্জন করে। জেএসসি-তে মোট ৪৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিন জন এ প্লাস লাভ করে। পিইসি-তে ৯৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৮১ জন এ প্লাস পায়।



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৮ সালে ১২ জন কোয়ান্টা মেধাতালিকায় ভর্তি হয়েছে (ছবিতে এ কোয়ান্টাদের একাংশ)। ২০১৭ সালে ছয় জন, ২০১৬ সালে একজন ও ২০১৫ সালে সাত জন কোয়ান্টা এখানে ভর্তি হয়। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে চার জন কোয়ান্টা মেধাতালিকায় প্রথম থেকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে।



বুয়েট

২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে একজন কোয়ান্টা।

চুয়েট

এবছর চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে একজন কোয়ান্টা।



সরকারি মেডিকেল কলেজ

২০১৮ সালে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ; জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও রংপুর মেডিকেল কলেজে (ডেন্টাল ইউনিট) সুযোগ পাওয়া কোয়ান্টাম কসমো কলেজের তিন শিক্ষার্থী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৮ সালে কোয়ান্টাম কসমো কলেজ থেকে সাত জন কোয়ান্টা ভর্তি হয়েছে। ২০১৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাত জন ও ২০১৬ সালে পাঁচ জন কোয়ান্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় সুযোগ পেয়েছে।

অসহায়-বঞ্চিতের সেবায় দুই দশক

দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম

বঞ্চিত ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের দানে ও সহযোগিতায় এ পর্যন্ত পুনর্বাসিত করা হয়েছে ১৫,৮৭০ জনকে। এ-ছাড়াও পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন ফলজ প্রকল্প, প্রাণী ও পশুসম্পদ প্রকল্প (বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঁস, মুরগি, উন্নত জাতের ছাগল ও ভেড়া), দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ঋণমুক্তি, কর্মসংস্থান প্রকল্প।



কোয়ান্টাম স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২১টি ব্যাচে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৩৩৭ জন মহিলাকে। সেলাই মেশিন পেয়েছেন ৩৮৯ জন।



প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন ২,৪৯৪টি পরিবারকে গৃহনির্মাণে সহায়তা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে রাজমাটিতে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ২০টি পরিবারও এ সেবা পায়।



এ পর্যন্ত আশ্রয়মমে সেবা পেয়েছেন ৩৬ জন অসহায় প্রবীণ

বিশুদ্ধ পানি পান করছেন লক্ষ মানুষ

১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৯২টি পানির ট্যাংক, ২৮৮টি টিউবওয়েল ও দুইটি ইদারা স্থাপিত হয়েছে দেশের উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায়।

আশ্রয়মম ৥ মমতার আশ্রয়ে অসহায় প্রবীণরা

আত্মীয়-পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধদের নিয়ে বান্দরবানের রাজবিলায় ২০১২ সালে স্থাপিত হয় 'আশ্রয়মম'। বর্তমানে নয় জন পুরুষ ও আট জন নারী সেবাার্থীকে এখানে সার্বক্ষণিক পরিচর্যা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

খতনাসেবা পেয়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৮৬ জন

২০০৫ সালে শুরু হয় খতনা কার্যক্রম। দরিদ্র শিশু-কিশোর ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে খতনার সুযোগবঞ্চিত পূর্ণবয়স্ক পুরুষরাও এ সেবা পেয়ে থাকেন।

দাফন কার্যক্রম ৥ মমতাপূর্ণ শেষ বিদায়

পরিচয়হীন অথবা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকারের জন্যে ২০০৪ সালে শুরু হয় দাফন কার্যক্রম। এ পর্যন্ত মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানানো হয়েছে ৪৮৯ জনকে।



বছরব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ও আবাসিক এলাকায় নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম। গত ২৪ মার্চ ২০১৮ ঢাকা জেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণে জাতীয় স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে কোয়ান্টামের সাত শতাধিক সদস্য অংশ নেন।



শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল 'রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ'-এর সার্বিক পরিচালনা ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব ২০১৫ সাল থেকে গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বর্তমানে এই স্কুলে পড়াশোনা করছে মোট ২৪৫ জন শিক্ষার্থী।



রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার প্রাঙ্গণে
কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা করছেন
নবনিযুক্ত ১,১০৬ জন নারী পুলিশ কনস্টেবল।

কোয়ান্টাম ইয়োগা ॥ সুস্থতার বৈজ্ঞানিক পথ

আধুনিক কর্মব্যস্ত মানুষের জীবনে কমে গেছে শারীরিক পরিশ্রমের সুযোগ। পাশাপাশি ব্যস্ততার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে যুক্ত হয়েছে টেনশন-স্ট্রেস। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যে চিকিৎসকরা এখন প্রতিটি মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন যোগ-ধ্যান চর্চা। সহজ কৌশল ও চর্চার সুবিধার কারণে দেশব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যোগব্যায়ামের সর্বাধুনিক সংস্করণ কোয়ান্টাম ইয়োগা। সবাই এখন সচেতন ও উদ্যোগী হচ্ছেন ইয়োগা চর্চায়।

২০১৬ থেকে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়েছে কোয়ান্টাম ইয়োগা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্যে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি শাহবাগে, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সাভারে এবং গাজীপুরে টেলিকমিউনিকেশন স্টাফ কলেজে এ পর্যন্ত ২১টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশ নিয়েছেন ৯৯৭ জন বিসিএস ক্যাডার, ১৯৪ জন উপ-সচিব ও ১২৪ জন যুগ্ম-সচিব।

২০১৭ সালে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনে (আগারগাঁও) অনুষ্ঠিত চারটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ নেন প্রতিষ্ঠানটির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৩৪৮ জন কর্মকর্তা। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে অনুষ্ঠিত তিনটি ব্যাচে ইয়োগা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৩,৪৫১ জন নবনিযুক্ত নারী পুলিশ কনস্টেবল।

২০১৮ সালে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কোয়ান্টাম ইয়োগা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

তারিখ	প্রতিষ্ঠান	অংশগ্রহণকারী
১২ ও ১৩ অক্টোবর	ঢাকা আইনজীবী সমিতি	১৩৫ জন আইনজীবী
২১ ও ২২ অক্টোবর	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১৯ জন শিক্ষক ও অনুষদ সদস্য
১২ ও ১৩ নভেম্বর	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) ও বিয়াম ফাউন্ডেশন	৪০ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও বিয়াম ফাউন্ডেশনের ১০ জন ফ্যাকাল্টি মেম্বর
২৪ নভেম্বর	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)	৪০ জন সহযোগী অধ্যাপক

সব ধর্মের সব মানুষের

quantummethord.org.bd

পণ্য আর প্রযুক্তির ভিড়ে আধুনিক মানুষকে প্রশান্তির সন্ধান দিতেই কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটের কর্মপ্রয়াস। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে-কোনো সময় কোয়ান্টাম চেতনায় নিজেকে আলোকিত করার এক অনন্য সুযোগ এই ওয়েবসাইট।

বর্তমানে ইংরেজি ও বাংলায় যোগ-মেডিটেশনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট এটি। নতুনরূপে বিন্যস্ত ডেস্কটপ অ্যাপ, উইশবোর্ড এবং নতুন এন্ড্রয়েড অ্যাপ, কোয়ান্টাম ভিডিও, কোয়ান্টাম মেডিটেশন, আল কোরআন ও বাংলা মর্মবাণী সংযোজনের মাধ্যমে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট এগিয়ে গেছে আরো একধাপ। অ্যাপগুলো ফ্রি ডাউনলোড করা যাবে।

প্রযুক্তির অপব্যবহারের আসক্তি থেকে মুক্ত করে বর্তমান প্রজন্মকে কল্যাণকর আধুনিক মানুষে রূপান্তর করাই এ ওয়েবসাইটের লক্ষ্য।

কোয়ান্টাম প্রকাশনা

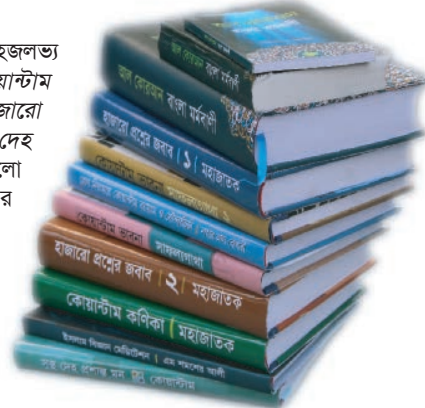
ভাষা ও উপস্থাপনগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল ধর্মের মূল সুর একই। সব ধর্মই মানুষকে ভালো মানুষ হতে বলে। স্রষ্টায় বিশ্বাস ও সৃষ্টির কল্যাণে কাজের নির্দেশনাই ধর্মের শিক্ষা। চারটি প্রধান ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী কথিকা আকারে প্রকাশ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

সুস্থ সুন্দর সুখী পরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে যা প্রয়োজন, কোরআনের পাতায় পাতায় রয়েছে তারই দিক-নির্দেশনা। আর এ সহজসরল সূত্রগুলো মায়ের ভাষায় প্রকাশে ফাউন্ডেশনের এক অনন্য প্রয়াস *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী*। প্রথম প্রকাশের পর থেকেই সর্বস্তরের মানুষ মর্মবাণী নিজেরা চর্চার পাশাপাশি অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

সুখী ও সফল জীবন গড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সবার জন্যে সহজলভ্য করেছে কোয়ান্টাম প্রকাশনা। *আত্মনির্মাণ*, *রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা*, *জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন*, *হাজারো প্রশ্নের জবাব ১* পর্ব ১ ২ ও ৩, *হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ*, *সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন*, *ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন*, *ভাঙো দুর্দশার চক্র-এ বইগুলো* ছাড়াও রয়েছে কোয়ান্টাম কথিকা। আকারের ক্ষুদ্রতায় আর বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায় এ এক অভিনব প্রকাশনা।

মেডিটেশন ও অটোসাজেশন চর্চার জন্যে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক অডিও। বিশ্ববাসীর কাছে প্রশান্তির বাণী পৌছে দিতে ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি অডিও। ফাউন্ডেশনের যে-কোনো সেন্টার-শাখা-সেল থেকে সংগ্রহ করা যাবে এ প্রকাশনাগুলো।

ফ্রি ডাউনলোড : publication.quantummethord.org.bd



জাতির ইতিবাচক মানস গঠনে কোয়ান্টাম

১৯৯৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে কোয়ান্টাম মেথড। মানুষের অভাবকে প্রাচুর্যে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, রোগকে সুস্থতায় এবং অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তর করাই এর লক্ষ্য। কোয়ান্টামের সংস্পর্শে এসে লাখে মানুষের জীবনে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে এ পরিবর্তনের সুফল ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে জাতীয় জীবনেও।

আমি পারি আমি করব

দৃষ্ট বিশ্বাস আর প্রেরণাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে মহান জাতি। আর দেশের প্রতিটি মানুষের আত্মবিশ্বাসের সমষ্টিই হলো জাতিগত বিশ্বাস। কোয়ান্টাম ২৬ বছর ধরে সবার মাঝে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির কাজটিই করে যাচ্ছে। মহান জাতি হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্যে মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে এই বাণীগুলো-‘আমি এক অনন্য মানুষ, আমরা এক মহান জাতি’, ‘আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী। আমি পারি আমি করব। আমার জীবন আমি গড়ব।’

সালাম বিনিময় ও শুদ্ধাচার চর্চা

২০১৪ সাল থেকে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা ঘরে-বাইরে ছোট-বড়, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে শুরু করেছেন সালামের চর্চা। একে অপরের সাথে দেখা হলেই সালাম বিনিময়ের এ শুভ চর্চার ফলে বেড়েছে পরিবারে শান্তি ও পারস্পরিক হৃদয়তা। সেইসাথে কোয়ান্টাম সবসময়ই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে শিষ্টাচার বা শুদ্ধাচার অনুসরণে। চর্চার সুবিধার্থে রয়েছে ১১টি শুদ্ধাচার কণিকা ও তিনটি সুবচন কণিকা। সমাজে এভাবেই গড়ে উঠছে সুবচন, সমর্মিতা, বিনয় ও ভালো আচরণের সংস্কৃতি।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে-এই মন্ত্রে বলীয়ান হয়ে কোয়ান্টাম প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারণ করেছে ইতিবাচকতার শক্তি। চিন্তা, কথা ও কাজে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা যেমন নিজেরা ইতিবাচক হতে সচেষ্ট হয়েছেন, তেমনি চারপাশের মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন আশাবাদ ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে।

ঋণ, কিস্তি ও অপচয় বর্জন

যে ব্যক্তি বা জাতি ঋণের জন্যে হাত পাতে, তার পক্ষে কোনোদিন বড় কাজ করা সম্ভব হয় না। কারণ বড় হওয়ার প্রথম শর্তই হলো আত্মসম্মানবোধ ও স্বাবলম্বন। এই চিন্তা থেকেই কোয়ান্টাম আত্ম উন্নয়ন ও সৃষ্টির সেবামূলক প্রতিটি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে। সেইসাথে মানুষকে সচেতন করে আসছে ঋণ, কিস্তি, ক্রেডিট কার্ড এবং অপচয়ের ফাঁদ সম্পর্কে। এ লক্ষ্যে কোয়ান্টাম প্রচার করে-‘ঋণমুক্ত সচ্ছল জীবন আমার মৌলিক অধিকার’, ‘ঋণ ও কিস্তির অভিশাপ থেকে পরিবারকে বাঁচান’ বাণী সম্বলিত স্টিকার।

সুখী পরিবার

আলোকিত ও সমৃদ্ধ প্রজন্ম গড়তে সুখী পরিবারের কোনো বিকল্প নেই। পরিবারে মা-বাবাসহ সকল সদস্যের পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কই সন্তানদের সুন্দর শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্যেই আধুনিকতার নামে ভ্রান্ত ও অপসংস্কৃতির হাত থেকে পরিবারগুলোকে বাঁচাতে কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম। পারিবারিক মেডিটেশনের অডিও এবং আলোকিত পরিবার কার্যক্রমসহ রয়েছে নিয়মিত নানা আয়োজন।

সন্তানকে জীবনের লক্ষ্য দিন

পণ্যের প্রাচুর্য আর শুধু ভালো রেজাল্ট করার দৃষ্টচক্রে বেড়ে উঠছে বর্তমান প্রজন্ম। যুগ যুগ ধরে জীবনের লক্ষ্য বলতে সমাজে যে ধারণা গড়ে উঠেছে, তা কেবলই জীবিকানির্ভর বা পেশাকেন্দ্রিক। অথচ দায়িত্ব-সচেতন একটি প্রজন্ম গড়তে তাদের দিতে হবে পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষ্য ও ধর্মের শাস্ত্র শিক্ষা, থাকতে হবে পরিবার-পরিজনের সাথে হৃদয়তা। কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে মা-বাবা-অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে এ বিষয়গুলোই তুলে ধরা হয়।



ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতা

বিনামূল্যে সহজ যোগাযোগের চোরাবালিতে ধরাশায়ী আজ সারা বিশ্ব। ইন্টারনেট, ফেসবুক, স্মার্টফোনসহ বাহারি সব প্রযুক্তিপণ্যের আসক্তিতে বিপর্যস্ত তরুণ সমাজ। গবেষক ও সমাজ-বিশ্লেষকরা বর্তমানে সোচ্চার হয়েছেন এসবের বিপক্ষে। অথচ ২০০৯ সাল থেকেই ইন্টারনেট ও ফেসবুকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করে আসছে কোয়ান্টাম। ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রম। সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এ সংক্রান্ত স্টিকার, বুলেটিন, ফোল্ডার ও ভিডিও ডকুমেন্টারি।

কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস ও ফাস্টফুড বর্জন

যে-কোনো ধরনের আসক্তির বিপক্ষে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কোয়ান্টাম। কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস উন্মুক্ত করে মাদকের অন্ধকার পথ। তাই কোয়ান্টাম সদস্যরা ফাস্টফুডসহ ক্ষতিকর পানীয় নিজেরা বর্জন করেছেন। সেইসাথে চারপাশের মানুষকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করে তুলেছেন।

দেশপ্রেমিক প্রজন্ম গড়ার প্রয়াস

নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম-বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে এই অনুরণন পুরো জাতির মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে এই বাণী সম্বলিত স্টিকার পৌঁছে দিচ্ছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা। কারণ প্রত্যেকের অবস্থান থেকে সত্যতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই সম্ভব সামগ্রিক উন্নয়ন। আর এভাবে দেশগড়ায় ভূমিকা রাখাই প্রকৃত দেশপ্রেম।

২০১৯ ॥ সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক

প্রতিবছরের মতো আগামী বছরের জন্যেও রয়েছে কোয়ান্টাম পরিবারের একটি প্রতিপাদ্য বা প্রত্যাশা এবং তা হলো-‘২০১৯ ॥ কোয়ান্টাম বর্ষ ২৭-এ সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।’ কোয়ান্টাম ২৬ বছর ধরে ছড়িয়ে দিচ্ছে ধ্যান বা মেডিটেশনের বাণী এবং ধ্যানের প্রথম প্রাপ্তিই হলো শান্তি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং পুরো জাতির জীবনে আসুক অফুরন্ত শান্তি ও কল্যাণ-এ লক্ষ্যেই সিকি শতাব্দী ধরে কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম।



ফাউন্ডেশন প্রকাশিত স্টিকারগুলো সংগ্রহ করুন ও পৌঁছে দিন পরিচিত পরিমণ্ডলে

কোয়ান্টাম বুলেটিন : সৃষ্টির সেবা সংখ্যা : ডিসেম্বর ২০১৮ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/১১/১৮ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত
Phone : 9341441, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethord.org.bd